ভারত-প্রতিভা

সচিত্র—প্রথম খণ্ড

যুগপ্রবর্ত্তক মনীষিগণের জীবনী ও প্রতিভা-বিশ্লেষণী



শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও
প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-মুদ্রণ-যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

১৩২০

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ভূমিকা

যুগে যুগে ধরাধামে প্রতিভার লীলা দেখিতে পাই! শ্রীকৃষ্ণ-বুদ্ধাদি অবতার হইতে শঙ্কর, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক, কবীর, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম—ইহাঁরা পৃথিবীর পাঁপপঙ্কে নীতিধর্ম্মের মৃণালে অমল শতদলের মত ফুটিয়া উঠিলেন কেন?

কালধর্ম্মে তাঁহারা ফুটিয়াছিলে—নজগতের ও জীবের হিতের জন্য। ব্যষ্টিতে স্বদেশবাসীর উপকার করিয়া, সমষ্টিতে বিশ্বহিতে জীবনাহুতি দিয়া তাঁহারা সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন।

তাঁহারা নাই, স্মৃতি আছে, স্বরূপ নাই, ছবি আছে, জীব নাই, ভাবনার ধারাটুকু ধরায় রহিয়া গিয়াছে।

জীবনচরিতে এই স্মৃতি ও ভাবনা দেদীপ্যমান থাকে। সেই স্মৃতি দিয়া আদর্শ গড়িয়া মানব তাহার মননে প্রবৃত্ত হয়। এই জন্য জীবন-চরিত মানবের পক্ষে মহাপথ্য।

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-কাহিনী, জীবন-চরিত যদি ধরিয়া না রাখিত, তাহা হইলে ভক্ত পাঠক! তোমার মন মধুমত্ত ভৃঙ্গের ন্যায় সেই চরণ-কমল-মকরন্দে আত্মহারা হইতে পারিত কি? প্লুটার্কের জীবনচরিত না থাকিলে যুনানীর চারিত্র্য-বৈভব জগদ্বাসীর কর্ণকুহরে পশিত কি? বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত না থাকিলে বীরসিংহের বীর্য্যদৃপ্ত সিংহের পরিচয় উত্তরপুরুষ পাইত কি? জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর ক্ষাত্রশক্তির অবতার ফরাসীজাতির গৌরব নাপোলিওর জীবনচরিত না থাকিলে জগতে বীরের উদ্ভব হইত কি? জীবনচরিত পড়িয়া আমরা মহৎ জীবনের কাহিনী অবগত হই,

পাপ ও পুণ্যের সংঘর্ষ দেখিয়া শক্তি সঞ্চয় করি। স্বার্থ ও পরার্থের যুদ্ধে বিশ্বহিতের বিজয় দেখিয়া ক্ষুদ্রত্বকে পদদলিত করিতে ও মহত্ত্বকে শিরোধার্য্য করিতে শিখি। মহৎ জীবনে বরেণ্য পুণ্যভাবসমূহের মূর্ত্ত অবতার দেখিতে পাই। সেই আদর্শে প্রাণ অনুপ্রাণিত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের শৌর্য্য দেখিয়া সংসারী ক্ষুদ্র গৃহাঙ্গনের রণে বিজয়লাভের পথ দেখিবে। আবার নিষ্কাম মহাপ্রাণের জীবনযুদ্ধে পরার্থের বিজয় দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদলাভ করিবেন। ইহাই জীবনচরিতপাঠের ফল। এই জন্য মানব সকল শ্রেণীর মহাপ্রাণ, প্রতিভাশালী, কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, এমন কি, দস্যুতস্করের জীবনচরিতেও শিক্ষার অবকাশ লাভ করিতে পারে। জীবনচরিতের শিক্ষা—

"রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যম্ ন রাবণাদিবৎ"

এই জন্য জীবনচরিত সভ্যতার আদিযুগ হইতে নানা মূর্ত্তিতে মানব-সমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

উপহার

প্রিয়তম

করকমলেষু—

ভারত-গৌরব মনীষিগণের

--- চরিত্র-মাধুর্য্যে—প্রতিভা-প্রাচুর্য্যে—

মহিমা-সৌকর্য্যে—স্মৃতি-দীপ্তি-সৌন্দর্য্যে—

জীবন—

------ সৌরভান্বিত—গৌরবান্বিত—

অনুপ্রাণিত—উদ্দীপিত করিবার জন্য—

পুণ্য-আদর্শের অমর নিদর্শন-স্বরূপ

ভারত-প্রতিভা

-- অনুরাগে সুরভিত—প্রীতি-স্নেহে পুলকিত করিয়া --

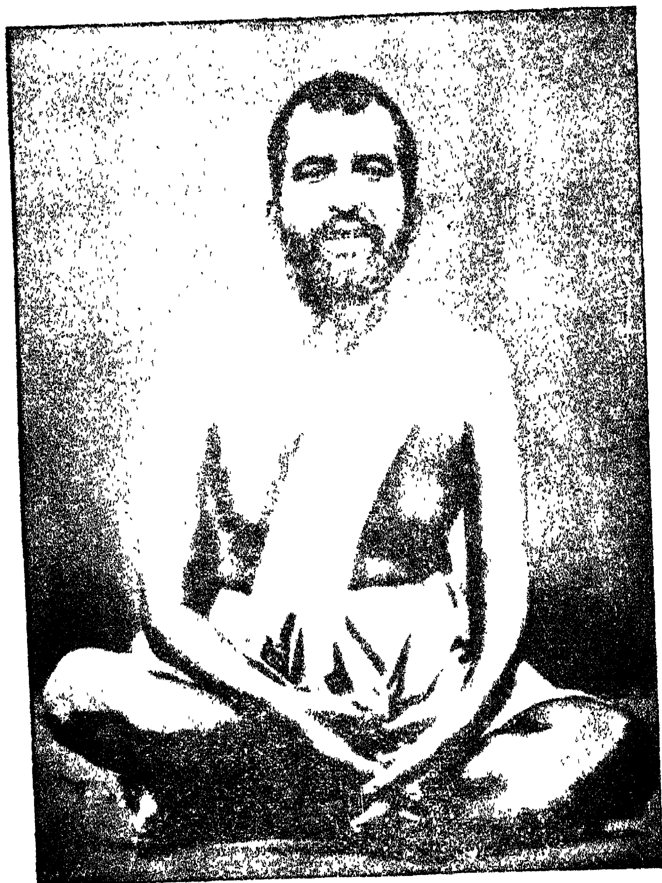
উপহার দিলাম!

স্মৃতি-তারিখ—

তোমার—

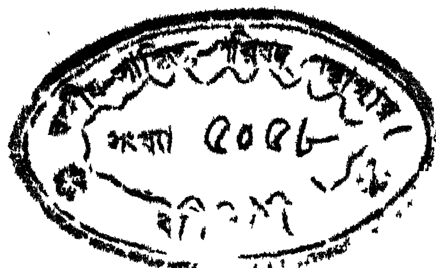
সূচীপত্র


সংখ্যা ৫০৫৮



ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

ভারত-প্রতিভা



ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।

১২৪১ সালের ১০ই ফাল্গুন বুধবার, শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে, হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে শ্রীশ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ মানব-দেহ পরিগ্রহ করেন। ঠাকুরের পিতা খুদীরাম চট্টোপাধ্যায় নিষ্ঠাবান্, পরমার্থ-পরায়ণ, রামোপাসক, তেজস্বী সদ্ব্রাহ্মণ ছিলেন—পদব্রজেই বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। জননী চন্দ্রমণি দেবী সরলতা ও দয়ার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন।

ঠাকুর শৈশবে 'গদাই' বা 'গদাধর' নামে অভিহিত হইতেন। তিনি শৈশবে পাঠশালায় সামান্য লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন। কৈশোরে বাড়ীতে থাকিতেন, নিত্য রঘুবীর-বিগ্রহের সেবা করিতেন—স্বয়ং পুষ্পচয়ন করিয়া পূজা করিতেন।

ঠাকুর সদানন্দ। সর্ব্বদাই আনন্দসাগরে ভাসমান। স্বয়ং সুকণ্ঠ—শ্রুতিধর। সঙ্গীতে স্বয়ংসিদ্ধ। কিশোর ঠাকুর প্রতিবাসী লাহাদের অতিথিশালায় সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবায় কালযাপন করিতেন; অবহিত-চিত্তে যাত্রাগান ও কথকের মুখে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ শুনিতেন। এইরূপে তিনি প্রাক্তন-জন্ম-বিদ্যার অধিকারী হইলেন। লাহাবাবুদের বাড়ীতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমবেত নানা দিগ্দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী সপ্ত-বৎসর-বয়স্ক ঠাকুরের মেধা ও বুদ্ধি-প্রাখর্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

একাদশ বর্ষ বয়সে স্বগ্রামের সন্নিহিত জনশূন্য প্রান্তরে নীল আকাশে নীরদবরণী মায়ের অদ্ভুত জ্যোতি দর্শন করিয়া ঠাকুর বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম ভাবসমাধি।

শৈশবেই ঠাকুরের পিতৃবিয়োগ হয়। অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না—ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন, টোল করিয়া অধ্যাপনা করিতেন। ১৭।১৮ বৎসর বয়সে ঠাকুর অগ্রজের সহিত কলিকাতায় আসিয়া কিছু দিন নাথের বাগানে, কিছু দিন ঝামাপুকুরে বাস করেন। ঠাকুরের অগ্রজ তাঁহার বিদ্যা-চর্চ্চায় অমনোযোগিতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"যে বিদ্যায় চালকলা লাভ হয়, তাহা শিখিয়া কি হইবে?" টোলের এক প্রান্তে বসিয়া তিনি নিশিদিন হরিগুণগান ও শ্যামাসঙ্গীতে আত্মহারা হইয়া থাকিতেন। এই সময় জানবাজারের রাণী রাসমণি ঠাকুরের অগ্রজের বিধানমত দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে গুরুকে দিয়া কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুরের অগ্রজ কালীবাড়ীর পূজারী হইলেন। ঠাকুর মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে

যাইতেন। কিছু দিন পরে রামকুমার অসুস্থ হইলে, রাণী রাসমণির জামাতা মথুর বাবু ঠাকুরের তন্ময়তা দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন—তাঁহাকে পূজারী হইবার জন্য অনুরোধ করেন। ঠাকুর নিরক্ষর, মন্ত্র-শাস্ত্র-সঙ্গত পূজার বিধিবিধান জানিতেন না বলিয়া প্রথমে স্বীকৃত হন নাই, পরে মথুর বাবুর অনুনয়-বিনয়ে কালীবাড়ীর পূজারী হইলেন। কয়েক দিন পূজা করিয়াই ঠাকুরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সর্ব্বদা অন্যমনস্ক,—কেবল প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া থাকেন।

এই সময় ঠাকুরের আত্মীয়েরা তাঁহার এই ভাবান্তর দূর করিবার জন্য শ্রীমতী সারদামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন।

কিছু দিন পরে তাঁহার অবস্থান্তর উপস্থিত হইল। কালীপূজা করিতে করিতে ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করিতেন। 'শ্রীম—' লিখিয়াছেন, "আরতি করেন, আরতি আর শেষ হয় না; পূজা করিতে বসেন, পূজা শেষ হয় না; হয় ত আপনার মাথায় ফুল দিতে থাকেন! পূজা আর করিতে পারিলেন না—উন্মাদের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। রাণী রাসমণির জামাতা মথুর তাঁহাকে মহাপুরুষবোধে সেবা করিতে লাগিলেন ও অন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা মা কালীর পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ঠাকুর আর পূজাও করিলেন না—সংসারও করিলেন না। * * নিশিদিন মা মা করেন। * * কামিনীকাঞ্চনাসক্ত বিষয়ীদের দেখিয়া লুকাইতেন। * সর্ব্বদাই মা মা!"

এই সময় ঠাকুর সর্ব্বদাই ভাবাবেশে তন্ময়—বাহ্যজ্ঞানশূন্য—অচেতনে, অনাহারে, অনিদ্রায় দিবারাত্র কাটিত। কখনও বা গঙ্গাতীরে

বালুকায় মুখ ঘষিয়া কাঁদিতেন, বলিতেন—"মা, আমার 'অহং' নাশ কর মা—আমি অষ্টসিদ্ধি চাই না—লোকমান্য হইতে চাই না—দেখা দে মা!" মায়ের দর্শনলাভের জন্য ছয় মাস ঠাকুর ব্যাকুলতায় আত্মহারা হইয়াছিলেন। এই সময় শিশুর ন্যায় তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতে হইত—অজ্ঞাতসারে মলমূত্র নিঃসৃত হইত। মায়ের দর্শনলাভের পর আবার সাধন আরম্ভ করিলেন।

তিনি সাধনা দ্বারা অভিমান, অহঙ্কার, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলিকে দমন করিয়া পরে মনঃসংযমের জন্য কামিনীকাঞ্চনের বলবতী মায়া বিচ্ছিন্ন করিলেন। টাকায় ও মাটীতে—চন্দনে ও বিষ্ঠায় সমজ্ঞান হইল—স্বর্ণাদি আর স্পর্শ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিতেন, কামিনীর রূপে লোকে মুগ্ধ হইলেও তাহা মাংস ও চামড়া-ঢাকা হাড়ের খাঁচা মাত্র। কামিনীর মোহিনী শক্তি—সন্তানবাৎসল্যে মুগ্ধ হইলে ঈশ্বর-চিন্তা হয় না—ঈশ্বরলাভের প্রতিবন্ধকতা ঘটে। ঈশ্বরের মোহিনী শক্তিকে মায়া বলে—মায়ার প্রভাবে জগৎ সৃষ্ট। মায়াকে মা বলিয়া তিনি মায়াকে প্রত্যক্ষ করেন—মায়া হইতে মেয়ে—প্রত্যেক মেয়ে শক্তির অংশ—এ জন্য স্ত্রীলোকমাত্রেরই উপর তাঁহার মাতৃভাব জন্মিয়া গেল। তিনি কারণ বিচার করিয়া প্রত্যেক কার্য্য করিতেন।

মনঃসংযমের পর তিনি গোকলব্রত হইতে বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র-প্রচলিত কর্ম্মকাণ্ডের প্রক্রিয়াগুলি একে একে সাধন করিয়াছিলেন। পরে উচ্চতর সাধনের জন্য গভীর নিশায় পঞ্চবটীতে ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন।

কালীবাড়ীর সদাব্রতে সর্ব্বদা সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। একবার তোতাপুরী কালীবাড়ীতে আসিয়া এগার মাস রহিলেন; ঠাকুরকে বেদান্ত শুনাইলেন; দীক্ষিত করিলেন। তোতা দেখিলেন, যে নির্ব্বিকল্প সমাধি করিতে যোগিগণের কত কালকালান্ত কাটিয়া যায়, তিনদিন-মাত্র কুম্ভকাদি যোগানুষ্ঠানের পরেই ঠাকুরের সেই নির্ব্বিকল্প সমাধি হইল। যোগসাধনাবস্থায় ঠাকুর এমন গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া-ছিলেন যে, ছয় মাস তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না। এক জন সাধু দণ্ডের দ্বারা প্রহার করিয়া তাঁহার মুখে দুধ ঢালিয়া দিয়া শরীর-রক্ষা করিতেন।

হলধারী নামে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে বেদান্ত উপদেশ দেন, এবং সাকার উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি মায়ার কার্য্য বলিয়া উপহাস করেন। ঠাকুর সংশয়াপন্ন হইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সন্দেহভঞ্জন করেন। এত আত্মনিবেদন ছিল যে, প্রত্যেক কার্য্যেই তিনি মায়ের উপদেশ লইতেন। নির্ভরপ্রভাবে পঞ্চবটীর ভাঙ্গা বেড়া বাঁধিবার জন্য বাঁশ-বাখারী গঙ্গার বানে ভাসিয়া আসিয়াছিল। এই সময় ঠাকুর বলিতেন,—"মা, তোর কথা কেবল শুন্‌বো, আমি শাস্ত্রও জানি না, পণ্ডিতও জানি না। তুই বুঝাবি, তবে বিশ্বাস কর্‌বো।" তখন ঠাকুরের মনে ভাসিতেছে,—যিনি অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ, পরব্রহ্ম, তিনিই মা।

কালীবাড়ীতে সমাগত সাধুরা এই সময় তাঁহাকে 'পরমহংস' আখ্যা দেন। হৃদয় নামে এক আত্মীয় তখন মা কালীর পূজা ও ঠাকুরের সেবা করিতেন। সকলেই ঠাকুরকে 'উন্মাদ' সাব্যস্ত করিল—রাণী রাসমণি চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন—কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজী

তৈলাদি দিলেন—কেহ কেহ স্ত্রীসম্ভোগের ব্যবস্থা দিলেন—রাত্রে গৃহে যুবতী দেখিয়া ঠাকুর পলায়ন করিলেন।

একদিন প্রাতে গঙ্গাতীর হইতে ঠাকুর এক যুবতী সন্ন্যাসিনীকে ডাকাইয়া, মা বলিয়া, নানা তত্ত্বকথার আলাপ করিলেন। সন্ন্যাসিনী 'ব্রাহ্মণী'; সংস্কৃত সাহিত্যে—বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রে, তন্ত্রাদি-নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপে ও নানা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপ্রণালীতে বিশেষ ব্যুৎপন্না। তিনিই প্রথম ঠাকুরের ঈশ্বরের নামে জড়বৎ ভাবকে মহাভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন—সকলে বিস্মিত হয়। এই সময় উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বিচারের প্রার্থনা করেন। মথুর বাবু তৎকালীন মহাপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণকে লইয়া আসেন। পরমহংসদেব বৈষ্ণবচরণকে দেখিবামাত্র ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহার স্কন্ধোপরি আরোহণ করিলেন! বৈষ্ণবচরণ অপূর্ব্ব ভাবাবেশদর্শনে 'শ্রীচৈতন্য'জ্ঞানে নূতনচ্ছন্দে স্তবাদি করিতে লাগিলেন। পশ্চিমা-পণ্ডিত পরাজয় স্বীকার করিলেন। বৈষ্ণবচরণ 'ব্রাহ্মণী'-বর্ণিত ঠাকুরের মহাভাবের সমর্থন করেন—শাস্ত্রগ্রন্থাদি আনাইয়া লক্ষণাদি মিলাইয়া দেন।

ইহার পর পরমহংসদেব ব্রাহ্মণীর উপদেশমত, তন্ত্র-কথিত বহুবিধ সাধনে সিদ্ধ হইয়া কর্ত্তাভজা, নবরসিক, বাউল প্রভৃতি নানাপ্রকার সাধন করেন। এই সময় তাঁহার পূর্ণযৌবনের অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যে চিত্ত চমকিত হইত—মহাপ্রভুর ন্যায় তাঁহার কথায় কথায় ভাবপুলকে চৈতন্য-লোপ হইত। এমন কি, গুলের আগুন মাংসপেশী ভেদ করিলেও তাঁহার সংজ্ঞা হয় নাই। তন্ত্রোক্ত সাধনের পর তিনি বৈষ্ণবগ্রন্থাদি শ্রবণ

করিয়াছিলেন। রাণী রাসমণি, মথুর বাবু প্রভৃতি তাঁহাকে মা কালীর মানসপুত্র 'রামপ্রসাদ'—শিবত্বপ্রাপ্ত মহাযোগী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং সেই ভাবেই ভক্তি ও সেবা করিতেন। স্ত্রীলোক ভক্তেরা তাঁহাকে শিশু জ্ঞানে নিকটে আসিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না; তাঁহারা নানাবিধ মিষ্টান্নাদি লইয়া আসিয়া সাধুদর্শন ও ভক্তসেবা করিতেন।

শিশুবৎ রামকৃষ্ণের জিতেন্দ্রিয়তা-পরীক্ষার জন্য মথুর বাবু মেছোবাজারের লছমী বাইয়ের গৃহে তাঁহাকে লইয়া যান;—সে সময় বাইজীর ঘরে ১৫।১৬টি রূপবতী যুবতী উলঙ্গ অবস্থায় ছিল। বালকবৎ পরমহংসদেব উত্তরীয় গায়ে দিয়া উলঙ্গ অবস্থায় থাকিতেন। যুবতীদের দেখিয়া তিনি 'মা আনন্দময়ী','মা ব্রহ্মময়ী' বলিয়া প্রণাম করিলেন—অমনি ভাবসমাধি হইল। বারাঙ্গনারা গললগ্নীকৃতবাসে অপরাধিনী জ্ঞানে শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ইহার পরও তাঁহাকে বহুবার পরীক্ষা করা হইয়াছে।

অতঃপর তিনি হনুমানের ভাবসাধনে শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করিয়াছিলেন। জনৈক রামাৎ সন্ন্যাসীর নিকট রামমন্ত্রে দীক্ষা ও রামলালার অতি সুন্দর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামলালার মূর্ত্তির সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিত। পরে তিনি নানা সাম্প্রদায়িক সাধুর নিকট দীক্ষা লইয়া সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের সাধনায় শ্রীদাম-সুবলাদির সখ্য, নন্দ-যশোদার বাৎসল্যের বিবিধ সাধন করেন। পরে অষ্ট নায়িকার বেশে সুসজ্জিত হইয়া মহাকালীর সেবা করেন। অষ্ট সখীর সেবিকারূপে মথুর বাবুর প্রদত্ত স্ত্রীবেশে সুসজ্জিত হইয়া তিনি শ্রীমতীর দর্শনাশায় ব্যাকুল হইয়া শ্রীমতীর দর্শন পাইয়াছিলেন। সখীভাবসাধনের সময় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে রমণীদুর্ল্লভ

লাবণ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। অশ্রু, কম্প, স্বরভঙ্গ, পুলক, স্বেদ, উন্মত্ততা, মৃতবদবস্থিতি প্রভৃতি লক্ষণাদি শরীরে প্রকট হইত। সখী-মহাভাবে তিনি বিরহ-সুখ-সম্ভোগ করিতেন। সখীভাব-সাধনের জন্য তিনি কিছু দিন মথুর বাবুর অন্তঃপুরে পুরনারীদের সহিত স্ত্রীবেশে শিশুর ন্যায় অবিচলিত-চিত্তে অবস্থান করিয়াছিলেন। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের জন্য ঠাকুর বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি ভাবসাধনের পর মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষা লইয়া তিন দিন মহম্মদীয় সাধন—আল্লা-মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। যীশু-খ্রীষ্টের চিত্রপট আনাইয়া তিন দিন যীশুর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। যে ব্যাকুলতা ঈশ্বরপ্রাপ্তির হেতু, সেই ব্যাকুলতায়, সেই বিহ্বলতায় তাঁহার ঈশ্বর-দর্শন ঘটিয়াছিল।

ইহার পর তিনি শ্বশুরালয়ে গিয়া নানা উপচারে স্ত্রীকে তন্ত্রমতে ষোড়শীপূজা করিয়া তাঁহার পদে জপমালা বিসর্জ্জন দিয়া আসেন। দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া মথুর বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত তীর্থভ্রমণে গমন করেন। তিনি তীর্থে দেবদর্শনে ভাবাবেশে তন্ময় হইতেন। কাশীতে তৈলঙ্গস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি সুখী হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনে গিয়া গুপ্তভাবে ভেকধারণ করিয়াছিলেন। গঙ্গামাতা নামে এক বৃদ্ধা তাঁহাকে দেখিয়া 'দুলালী' জ্ঞানে ব্যাকুল হইয়া সেবা করিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া পরমহংসদেব আদিব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা দেখিতে গিয়াছিলেন। কলুটোলার চৈতন্যসভায় মহাভাবে ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাতে বৈষ্ণব-মণ্ডলীতে বিশেষ গোলযোগ হয়। বৈষ্ণবচরণ মথুর বাবুকে

বলিয়াছিলেন, "এ সামান্য উন্মাদ নহে ;—প্রেমোন্মাদ !" কাল্নার পরমভাগবত ভাগবতদাস বাবাজী ইহাতে কুপিত হইয়া তিরস্কার করেন। কয়েক দিন পরে পরমহংসদেব কাল্নায় গিয়া বাবাজীর সন্দেহ নিরাস করেন। মহাভাবদর্শনে বাবাজী কৃতার্থ হন।

ঠাকুর স্বদেশে পদার্পণ করিলে গ্রামটি উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইত। শ্যামবাজারে তাঁহাকে লইয়া সপ্তাহকাল নিরবচ্ছিন্ন সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। ঠাকুর প্রতি বৎসর পানিহাটীর নিত্যানন্দ-মহোৎসবে গিয়া সমবেত জনগণকে সঙ্কীর্ত্তনানন্দে পুলকিত করিতেন। পুলক-বিভ্রমময়, ভাবাবেশবিহ্বল সে সঙ্কীর্ত্তন, সে উদ্দণ্ড নৃত্যের মাধুরী একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের নৃত্যের সহিতই তুলনীয়। সঙ্কীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিলে ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। কলিকাতায় আসিলে বাগবাজারের বলরামবাবুর বাড়ীই তাঁহার প্রধান আরামের স্থল ছিল। ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। শম্ভুনাথ মল্লিক, যদুলাল মল্লিকের উপর তাঁহার সমধিক কৃপা ছিল। ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে সাধুরা কলিকাতায় আসিলে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া পরমহংসদেবকে দর্শন করিতেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ নামে এক পণ্ডিত ঠাকুরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ দশ হাজার টাকা ও মথুর বাবু পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ লইবার জন্য তাঁহাকে জেদ করিয়াছিলেন ; অনুরোধ শুনিয়া প্রলোভনের ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরের সমাধি হয়।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রেরিত দুই তিন জন ব্রাহ্ম পরম-হংসদেব সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য, এবং তাঁহাকে কেশব বাবুর শরণ

লইয়া মুক্তিলাভের উপদেশ দিবার জন্য, দুই তিন দিন দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সশিষ্য কেশববাবু ঠাকুরের নিকট যান। কেশববাবুর সহিত ঠাকুর ব্রহ্মশক্তির বিচারে প্রবৃত্ত হন। বহুবিধ তর্কের পর কেশববাবু ঠাকুরের উপদেশের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট ও পরাজিত হইয়া 'ভগবান্, ভাগবত ও ভক্ত তিন এক' স্বীকার করেন। অবসরমত কেশববাবু ঠাকুরের নিকট যাইতেন। তিনি ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক নিগূঢ়ভাবে তাঁহাকে অবাক্ করিতেন।

ক্রমে পরমহংসদেবের একটি রীতিমত সম্প্রদায় হইয়া উঠিল। বিভিন্নমতাবলম্বী বিবিধ লোকের সমন্বয়ে এই সম্প্রদায়। জগতের সকল ধর্ম্মের সাধন করিয়া তিনি 'জগতের সকল ধর্ম্মই সত্য,—সকলেরই লক্ষ্য এক' এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট প্রত্যহ দলে দলে পণ্ডিত, জ্ঞানী, ধর্ম্মপিপাসু লোকের সমাগম হইতে লাগিল। যিনি একদিন গিয়াছেন, তিনি আর ভুলিতে পারেন নাই। পরমহংসদেবের গুরুগিরি ছিল না। তবে যাঁহারা তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতেন; তাঁহাদের 'বকলম-নামা' লইয়া সিদ্ধি প্রদান করিতেন। প্রণাম করিবার পূর্ব্বেই তিনি নমস্কার করিয়া ফেলিতেন।

প্রত্যহ শতাধিক ভক্তসমাগমে আনন্দের তরঙ্গ ছুটিতে লাগিল। প্রতি শনিবার এক এক জন ভক্তের বাড়ীতে আসিয়া ঠাকুর সঙ্কীর্ত্তনানন্দে পল্লী পুলকিত করিতেন। তাঁহার অত্যন্ত অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তিনি অহেতুকী-কৃপাসিন্ধু, শত শত পাষণ্ডকেও পরিবর্ত্তিত—সংশোধিত করিয়া

অপার মহিমা দেখাইয়া গিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরে মাতাঠাকুরাণী (পরমহংসদেবের স্ত্রী) তাঁহার সেবা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে 'আনন্দময়ী মা' বলিতেন। জন্মোৎসবের দিন পরমহংস-দেব বলিয়াছিলেন—'এখানে যাহারা ঈশ্বরদর্শন ও জ্ঞানভক্তিলাভের আশায় আসিবে, তাহারা পূর্ণ-মনোরথ হইবে।' তিনি অধিকারিভেদে সাধনের—জ্ঞান ও ভক্তির বিভিন্ন পথ নির্দ্দেশ করিতেন। কাহাকেও সন্ন্যাস দিতেন; কাহাকেও গৃহস্থ-সন্ন্যাসী করিতেন; কাহাকেও গৃহী থাকিতে বলিতেন। সন্ন্যাসী ভক্তদের কথা গৃহীদের বলিতেন না—গৃহীদের কথা সন্ন্যাসীদের বলিতেন না।

সহসা একদিন ঠাকুরের গলায় ব্যথা হইল, খাদ্য গলাধঃকরণে ব্যথা অনুভব করিলেন, বেদনা গণ্ডমালায় পরিণত হইল—সময়ে সময়ে শোণিতস্রাব হইতে লাগিল। বহুদর্শী ইংরাজ চিকিৎসক দেখাইবার জন্য ভক্তেরা তাঁহাকে কলিকাতায়—শ্যামপুকুরে লইয়া আসিলেন। মহেন্দ্র-লাল সরকারের চিকিৎসায় অল্প উপশম হইল, কিন্তু আবার বাড়িয়া উঠিল। ডাক্তার সরকারের পরামর্শে ভক্তেরা পরমহংসদেবকে বরাহ-নগরের বাগানে লইয়া গেলেন। চিকিৎসা ও রোগযন্ত্রণায় অভিভূত না হইয়া পরমহংসদেব ভক্তসমাগমে, ঈশ্বরোপাসনায়, নৃত্যগীতাদির আনন্দে মগ্ন থাকিতেন। সন্ন্যাসী ভক্তেরা প্রাণপণে সেবা করিতেন। কালী-পূজার দিন রাত্রে ভক্তেরা পরমহংসদেবের পূজা করেন, এবং তাঁহাকে মহাশক্তি জ্ঞানে ভোগাদি দেন। ১লা জানুয়ারী ঠাকুর কল্পতরু হইয়া ভক্ত-গণকে কৃপা করেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি সমস্ত শক্তি দান করিয়া নিজে নিঃস্ব হইয়াছিলেন। ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ রাত্রি ১টা

৬ মিনিটের সময় সমাধিস্থ অবস্থায় তিনি লীলা সংবরণ করেন। ভক্তেরা সমাগত হইয়া, পুষ্পচন্দনে মহাসমাধিস্থ মহাপুরুষের সুসজ্জিত দেহ চিতানলে ভস্ম করেন; এবং অস্থি রক্ষা করেন। শ্মশানে বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পায়ে কালভুজঙ্গ দংশন করে; কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় কেবল চিতাভস্ম মাখাইয়া তাঁহার জ্ঞানসঞ্চার হয়।

"কামারপুকুরের সেই 'গদাধর'—সচ্চিদানন্দের উজ্জ্বল বিন্দু আজ-ভারতে পরমার্থের গোমুখীপ্রপাত শ্রীশ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ। সেই জ্ঞান-গঙ্গার পবিত্র ধারায় আজ ভারতভূমি পবিত্র। সুদূর মদ্রে, সিংহলে, উত্তর-পশ্চিমে, রাজপুতানায়, কুমায়ুনে, নেপালে, বোম্বাই খণ্ডে, পঞ্চনদে,—ভারতভূমির বাহিরে জাপানে, আমেরিকায়, ইংলণ্ডে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা পূজিত হইতেছে।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

এই কলিযুগে কলি-কল্মষ-নাশন ভগবান্ রামকৃষ্ণও সেই উদার গূঢ়-তত্ত্বের প্রচার করিয়াছিলেন। এই লীলাবিজৃম্ভিত জীব-দেহে সর্ব্ব-ধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া সেই সর্ব্বধর্ম্মার্থসার পরমতত্ত্ব জগতের কল্যাণের জন্য মুক্ত-হস্তে বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি বিচ্ছিন্ন, মতভেদ-বিভিন্ন, বৈষম্যপূর্ণ ভারতে মতবিরোধের নিরাস করিয়া ধর্ম্মসমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। মুমূর্ষু জাতির পক্ষে তাহা মৃতসঞ্জীবনী; ভোগবিলাসমগ্ন, লালসার ক্রীতদাস, পরমার্থহীন জগদ্বাসীর পক্ষে তাহা অমৃত!

তিনি ভক্তির ভগবান্,—কিন্তু স্বয়ং ভক্ত-চূড়ামণি। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার হৃদয়-কন্দর হইতে যে ভক্তির মন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা ভারতবাসীর মরুহৃদয় সরস ও সুস্নিগ্ধ করিয়াছে ; কালে সেই পূত প্রবাহিণী জগৎ প্লাবিত করিবে।

তিনি করুণা-নিধান,—পুষ্পচয়নেও তরুলতার বেদনা অনুভব করিতেন ; তাই শেষে ইষ্টদেবতার পূজার জন্যও ফুল তুলিতে পারিতেন না।

"তয়া সর্ব্বমিদম্ ততম্"—তিনিই সর্ব্বভূতে বিরাজমান। হরিৎ তৃণস্তম্ব, সুকুমার পুষ্পসম্ভার হইতে 'জবাকুসুম-সঙ্কাশ' মহাদ্যুতি বিবস্বান্ পর্য্যন্ত সমগ্র চরাচর সেই মহাশক্তির বিকাশ ;—ইহা তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় ছিল। তাই তিনি 'জীবে দয়া'র নর্ম্মদা-প্রপাত। তাই মার পূজায় তাঁহার যেমন রতি, 'দরিদ্রনারায়ণে'র সেবায় তাঁহার তেমনই অনুরাগ।

তিনি স্বয়ং শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ;—কিন্তু সংসারীর বন্ধু।

ভগবান্ গীতায় জ্ঞানীর জন্য মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব জনসমাজের স্তরে স্তরে নির্ব্বাণ দান করিয়াছিলেন। এই কলিযুগে ভগবান্ রামকৃষ্ণ আর্য্যাবর্ত্তের আর্যজ্ঞান—বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মবিদ্যার সার—সর্ব্বধর্ম্মের সার সত্য মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ-মুখপদ্মবিগলিত সেই উপদেশ-অমৃত-ফলে পাপী, তাপী, ভোগী ও যোগীর সমান অধিকার।

শ্রীশ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ ঐহিক ও পারমার্থিক শান্তির সেতু। দয়াল ঠাকুর পতিত জাতির উদ্ধারকর্ত্তা। তিনি ভারতের তপোবনে যে বীজ বপন করিয়াছেন, তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়াছে। কালে

সেই কল্যাণ-কল্পতরু বিশাল বনস্পতির রূপ ধারণ করিবে,—মুকুলিত, পুষ্পিত ও ফলশালী হইয়া জগজ্জনের উপজীব্য হইবে ;—সেই বিরাট বনস্পতির পবিত্রচ্ছায়ায় সমবেত হইয়া জগদ্বাসী বিশাল মানবতা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে।

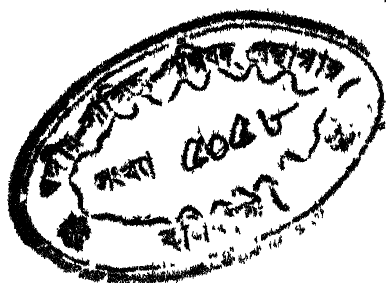
ঠাকুর ! তুমি ব্যষ্টি-রূপে ভারত পবিত্র করিয়াছিলে, আবার সমষ্টির সমুদ্রে লীন হইয়াছ। কিন্তু তোমার পুণ্যপ্রভাব, তোমার পূত আশীর্ব্বাদ জড়-দেহ-চারী আত্মার ন্যায় এই জড় ভারতদেহে চৈতন্যের— অনুভূতির সঞ্চার করিতেছে। হে পতিতপাবন ! হে ভক্তবৎসল ! তুমি সংসার-গুটিকাবদ্ধ মানব-কীটের পরিত্রাতা ; হে অহেতুকী ভক্তির নিদান ! হে করুণাসিন্ধো ! হে রামকৃষ্ণ ! বৈকুণ্ঠ হইতে আশীর্ব্বাদ কর, সেই অনুভূতি, সেই চৈতন্য ভারতবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে স্ফুরিত হউক।

"নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং
ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং
তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ ॥"

* বসুমতীতে প্রকাশিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের ভক্তি-উচ্ছ্বাস।



রাজা রামমোহন রায়।



রাজা রামমোহন রায়।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে, হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে, রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। রামমোহনের পূর্ব্বপুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন—রায় উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা রমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নবাব সরকারের ইজারাদার ছিলেন। মাতা তারিণী দেবী ভক্তিপরায়ণা রমণী ছিলেন।

রামমোহন বাল্যে গ্রাম্য-পাঠশালায় বাঙ্গালা শিখিয়া—নবম বর্ষে মৌলবীর নিকট আরবী ও পারসী শিখিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় পারসী ভাষাতেই আদালতের কার্য্যাদি হইত। তিনি তিন বৎসর পাটনায় অবস্থান করিয়া আরবী ও পারসী সাহিত্যে পারদর্শী হন। আরবী ভাষায় তিনি গ্রীক দার্শনিকগণের গ্রন্থরাজী ও কোরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তিনি কাশীধামে গিয়া পাঁচ বৎসর সংস্কৃত সাহিত্যের—ব্যাকরণ কাব্যাদি হইতে বেদ-উপনিষদাদির কোনও কোনও অংশ পাঠ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়সে তিনি পাঠ সমাপ্ত করিয়া পিতৃভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বাল্যে রামমোহন পরম হিন্দু ছিলেন—প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতের কিয়দংশ অধ্যয়ন করিতেন। অভিনিবেশসহকারে বিবিধ শাস্ত্রানুশীলন ও গবেষণা করিয়া তাঁহার পৌত্তলিকতার প্রতি অনাস্থা জন্মিল। বৈদিক ধর্ম্মের সহিত আনুষ্ঠানিক পৌত্তলিক হিন্দু-ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই, এই বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। মুসলমান-ধর্ম্মের একেশ্বরবাদ আলোচনায় তাঁহার ধর্ম্মমত আরও পরিবর্ত্তিত হইল। ক্রমে বেদান্ত-আলোচনায় বেদান্ত-মর্ম্ম অবগত হইয়া তিনি বুঝিলেন যে, বেদান্তে ঈশ্বরের যে স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে, তাহাই হিন্দুধর্ম্মের সার। সেই অভ্রান্ত মত—প্রাচীন নির্ম্মল হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে পৌরাণিক দেবদেবীর কল্পনায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বেদান্তনির্ণীত একেশ্বরবাদ প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ প্রবল হইল। তিনি প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রমাণ-প্রয়োগ পূর্ব্বক "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। রামমোহনের পিতা পৌত্তলিক ধর্ম্মে ভক্তিমান ছিলেন। তাঁহার সহিত মতান্তর হইল, তিনি কুপিত হইয়া, স্নেহ-মমতা বিসর্জ্জন দিয়া, রামমোহনকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পিতৃপরিত্যক্ত হইয়াও তিনি বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া চারি বৎসরকাল ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এই সময় তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিরক্ত হইয়া, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য দুরারোহ হিমালয় অতিক্রম করিয়া, তিব্বতে গমন করেন। তিব্বত সে সময় কুসংস্কারে ও উপধর্ম্মে সমাকুল। তিনি কুসংস্কারের প্রতিবাদ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম-মতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় বিশেষভাবে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হন। এমন কি,

তিব্বতীয়রা তাঁহার প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দয়াবতী তিব্বত-রমণীগণের যত্নে তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়; তাঁহাদের নিকট তিনি এরূপ স্নেহ-যত্ন পাইয়াছিলেন যে, কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয়ে নারীজাতির প্রতি গভীর সম্মান চিরদিনের জন্য সমঙ্কিত ছিল।

চার বৎসর পরে—বিংশতি বর্ষ বয়সে রামমোহন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার পিতা সাদরে তাঁহাকে বাড়ীতে স্থান দেন, এবং কিয়দ্দিনের মধ্যে বিবাহ দেন। দৃঢ় অধ্যবসায়বলে অত্যল্প দিনের মধ্যে তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, গ্রীক, লাটিন, ফরাসী, হিব্রু, আরবী, উর্দ্দু, হিন্দী প্রভৃতি সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের পিতৃ-বিয়োগ হইলে, পৈতৃক সম্পত্তি তাঁহারা তিন সহোদরে বিভাগ করিয়া লন। সম্পত্তির আয়ে ব্যয়-সঙ্কুলান না হওয়ায় রামমোহন রংপুরের কালেক্টারী আফিসে অল্প বেতনের একটি চাকরী গ্রহণ করেন। রামমোহনের কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া কালেক্টার সাহেব তাঁহাকে ভারত-শাসক ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জজ-আদালতের সেরেস্তাদার পদে উন্নীত করেন। দশ বৎসর তিনি রংপুর, রামগড় ও ভাগলপুরে সেরেস্তাদারের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যথেষ্ট অর্থ, সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যু হইলে, অন্য উত্তরাধিকারী না থাকায়, রামমোহন সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন; চাকরী পরিত্যাগ করিয়া কিছু দিন মুরশিদাবাদে অবস্থান করেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজধানী কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, একটি বৃহৎ বাড়ী ও উদ্যান ক্রয় করিয়া, অনন্যচিত্ত হইয়া চির-অভিলষিত ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি একটি ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠা

করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মমতালম্বিগণের বিরুদ্ধে তর্ক-যুদ্ধ আরম্ভ করেন; একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া, নানা সাহিত্য হইতে সংগৃহীত বিভিন্ন ধর্ম্মমত-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী বিবিধ পুস্তিকারূপে প্রকাশ করিয়া, পৌত্তলিকতার প্রতিকূলে একেশ্বরবাদ-স্থাপনের জন্য তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। কিসে নারীজাতির মঙ্গল হয়, কিসে তাঁহারা সুশিক্ষিতা হইয়া সংসারের অলঙ্কারস্বরূপিণী হন, সে বিষয়েও রামমোহন নানা আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সময় পাদ্রীদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর মতবিরোধ উপস্থিত হয়—তাঁহাদের যুক্তি-তর্ক নিরাস করিবার জন্য হিব্রু-ভাষা শিখিয়া, মূল বাইবেলের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া তিনি তাঁহাদের সহিত বিচার চালাইয়াছিলেন। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণও তাঁহাকে নানা-প্রকার সঙ্গত ও অসঙ্গত উপায়ে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মতখণ্ডন করিতে রামমোহন যত্নের ত্রুটী করেন নাই। তিনি বিশেষ যত্নে আরবী ভাষায় লিখিত মূল কোরাণ পাঠ করিয়াছিলেন; মৌলবীগণ তাঁহার কূটতর্কে পরাজিত হইয়াছিলেন। রামমোহন বাঙ্গালা গদ্যে তাঁহার মতামত প্রচার করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালা গদ্য-রচনার প্রবর্ত্তক। তখনকার বাঙ্গালা সাহিত্য কোন প্রকার গুরুতর রচনার বা সৎ-সাহিত্যের উপযোগী ছিল না—পার্শীমিশ্রিত এক প্রকার জটিল ভাষা পত্রাদি ও দলীলপত্রে ব্যবহৃত হইত। রামমোহন একখানি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যে বাঙ্গালা সাহিত্যে শিশুবোধক-প্রণয়নও অসম্ভব ছিল, সেই ভাষার সাহায্যে তিনি বেদান্তের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি গদ্য-সাহিত্যে যে বেদান্ত-গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন, সেরূপ

উৎকৃষ্ট, সারগর্ভ, প্রখর প্রতিভার পরিচায়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ সে সময় রচিত হয় নাই। এই গ্রন্থ-সূচনায় তিনি গদ্য-সাহিত্যের গঠন ও অর্থনির্ণয়-প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থ সকল পাঠে বুঝা যায় যে, তিনি তাঁহার নিন্দাকারী ও প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতগণের বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনায় কিছুমাত্র বিচলিত হইতেন না।

রামমোহনের সময়ে সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। পতি-বিয়োগ-বিধুরা সাধ্বীগণ জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি প্রদান করিতেন। কিন্তু সকল রমণীই যে স্বেচ্ছায় অনলে আত্মবিসর্জ্জন করিতেন, এমন কথা বলা যায় না। সহমরণে কুণ্ঠিতা ভীতা রমণীর সমাজে ঘৃণা, গ্লানি ও নিন্দার সীমা থাকিত না। জ্বলন্ত চিতানল সহ্য করিতে না পারিয়া অভাগিনী কুসুমকোমলা রমণী আর্ত্ত-নাদে গগন বিদীর্ণ করিয়া চিতাগ্নি হইতে বহির্গত হইবার প্রয়াস পাইতেছে, আর আত্মীয়গণ বাদ্য-নিনাদে ও জয়োল্লাসে তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছে—বংশ-দণ্ড দ্বারা রমণীকে বলপূর্ব্বক চাপিয়া ধরিতেছে! এই বীভৎস নিষ্ঠুর মর্ম্মন্তুদ কাণ্ডে রামমোহনের হৃদয় কাতর হইল। তিনি এই কুপ্রথা রহিত করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া ১৮১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে "নিবর্ত্তক" ও "প্রবর্ত্তক" নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন। এই গ্রন্থপাঠে তৎকালীন গভর্ণর লর্ড বেণ্টিঙ্ক এই কুপ্রথা-নিবারণের জন্য আইন বিধিবদ্ধ করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে আইনবলে ভারতবর্ষ হইতে সহমরণ-প্রথা উঠিয়া যায়। নূতন ধর্ম্মমত-স্থাপনের প্রয়াস পাইয়া রামমোহন হিন্দুসমাজে লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত হইয়া-ছিলেন; সহমরণ-প্রথা নিবারিত হওয়াতে সকলেই তাঁহাকে নাস্তিক, ভণ্ড ও বিধর্ম্মী বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। কিন্তু এই নিন্দাবাদে

রামমোহন বিচলিত হইলেন না, বরং তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

রামমোহনের সময় এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন ছিল না। চাকরী-প্রত্যাশীরা আদালতের ভাবা পার্শীর যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিতেন। গভরমেণ্ট সংস্কৃত ও পার্শী শিক্ষা বিস্তারের জন্য এক লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা দান করেন। এই টাকায় কাশীতে একটি সংস্কৃত-বিদ্যালয় ও কলিকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতায় একটি সংস্কৃত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ আরব্ধ হয়। রামমোহন সংস্কৃত-বিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তে ইংরাজী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তি-তর্ক প্রদর্শন করিয়া, গভর্ণর লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট আবেদন করিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজ ও সংস্কৃত-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ডেভিড হেয়ার ও সার এডোয়ার্ড হাইড হৃষ্ট এ বিষয়ে রামমোহনের সহায়তা করিয়াছিলেন। ডাক্তার উইলসন কলেজের ভার প্রাপ্ত হন; রামমোহন কলেজ-কমিটীর সদস্য মনোনীত হন। ইংরাজী-শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়া রামমোহন হিন্দুসমাজের আরও বিদ্বেষভাজন হন। তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মদ্বেষী মনে করিয়া ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন প্রেসের মিশনরীরা তাঁহার পুস্তকাদি ছাপিতেন না বলিয়া তিনি 'ইউনিটেরিয়ান প্রেস' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন।

রামমোহন রঙ্গপুর হইতে আসিয়াই ব্রহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে একটি উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই ব্রহ্মসমাজের সূচনা। তিনি দেখিলেন, শূদ্রগণ তখন ব্রাহ্মণের দাস-স্বরূপে পরিণত, এবং শাস্ত্র অধিকারে বঞ্চিত—অজ্ঞান-মোহাচ্ছন্ন। তাহাদের উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত। তিনি 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' বিজয়-ভেরী নিনাদিত করিয়া ঘোষণা করিলেন—'নিগৃহীত বন্ধুগণ,

অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া কেন অমূল্য জীবন বৃথা নষ্ট করিতেছ? সৌভ্রাতৃবন্ধনে বদ্ধ হইয়া পরব্রহ্মের পূজা করিয়া কৃতার্থ হও। এ ধর্ম্মে জাতি-ভেদ নাই, এ ধর্ম্ম স্বচ্ছ ও প্রশস্ত; ধনী দরিদ্র, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ, আবাল- বৃদ্ধ-বনিতা এ ধর্ম্মে সমান অধিকারী।' এই অভয়বাণীতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া অনেকে রামমোহনের ব্রহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লইতে লাগিল—দেশময় তুমুল আন্দো-লনের ঝটিকা বহিতে থাকিল। পণ্ডিতাগ্রণী শঙ্কর শাস্ত্রী, সুব্রহ্মণ শাস্ত্রী, ভট্টাচার্য্য, গোস্বামী, মার্শম্যান, টাইটলর প্রভৃতি মিশনরীদেব সহিত তুমুল তর্কযুদ্ধ চলিতে লাগিল। রামমোহন ব্রহ্মজ্ঞান বুঝাইবার জন্য যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনুষ্ঠান, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ, ব্রহ্মোপাসনা, বেদান্তসূত্র, বেদান্তসার, গায়ত্রীর অর্থ, পঞ্চোপনিষৎ, ব্রহ্মসঙ্গীত, প্রার্থনাপত্র, আত্মানাত্মবিবেক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্‌ভিন্ন রামমোহন 'সুব্রহ্মণ শাস্ত্রীর সহিত বিচার,' 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিচার,' 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার,' 'গোস্বামীর সহিত বিচার,' 'চারি প্রশ্নের উত্তর', 'বজ্রসূচি', 'পাদরী-শিষ্য-সংবাদ' 'সংবাদ-কৌমুদী,' 'ব্রাহ্মণ সেবধি,' ক্ষুদ্রপত্রী, 'পথ্য প্রদান,' গৌড়ীয় ব্যাকরণ', 'কুলার্ণব তন্ত্র' প্রভৃতি পুস্তিকা প্রচার করেন; এবং পার্শী ও আরবী ভাষায় 'তোহফতুল মোহদীন' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মিশনরী অ্যাডাম রামমোহনের পরামর্শমত 'ইউনিটেরিয়ান সোসাইটী' নামে সভা প্রতিষ্ঠিত করেন; সশিষ্য রামমোহন ঐ সভায় প্রত্যহ ঈশ্বরোপাসনা করিতে যাইতেন; তৎপরে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মথুরানাথ মল্লিক, রায় কালীনাথ মুন্সী, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্যে ১৭৫০ শকে তিনি ব্রহ্মসভা সংস্থাপিত করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে চিৎপুর রোডে বন্ধুবান্ধবগণের চাঁদায় আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহ নির্ম্মিত

হয়। ১১ই মাঘ সমাজের কার্য্য আরম্ভ হয়। এই সময় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নেতৃত্বে মতিলাল শীল, দেওয়ান রামকমল সেন প্রভৃতির সমবায়ে হিন্দুদিগকে স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ রাখিবার জন্য একটি 'ধর্ম্মসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়।

রামমোহনের তিন বিবাহ। প্রথমা বালিকা পত্নীর বিয়োগের পর তিনি বর্দ্ধমানের পলাশী গ্রামে দ্বিতীয়বার ও ভবানীপুরে তৃতীয়বার বিবাহিত হন। তাঁহার দুই পুত্র;—রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে দিল্লীর সম্রাট্ রামমোহনকে রাজা উপাধি দিয়া রাজসমীপে সম্রাটের বৃত্তিবৃদ্ধি প্রভৃতি কতকগুলি বৈষয়িক ব্যাপারের আবেদন করিবার জন্য তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। য়ুরোপের সৌন্দর্য্য-সন্দর্শন, দেশবাসিগণের ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, আচার ব্যবহারের সহিত সুপরিচিত হইবার জন্য রামমোহন বহুদিন হইতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন। তাহার উপর প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহ-নিবারণের বিরুদ্ধে হিন্দুগণের আপীল-বিচার এবং ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত শাসনের নূতন সনন্দ-গ্রহণ উপলক্ষে পার্লিয়ামেণ্টের বিচারে ভারতের শুভাশুভ-নির্ণয় প্রভৃতি রাজনীতিক ব্যাপারে উপস্থিত থাকিবার জন্য তাঁহার বিশেষ বাসনা ছিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রেল 'আল বিয়ান' জাহাজে রামমোহন ব্রিষ্টলে উপনীত হন। ইনিই হিন্দুদিগের বিলাত-গমনের প্রথম পথ-প্রদর্শক। বিলাতের 'ইউনিটেরিয়ান' সম্প্রদায় তাঁহাকে প্রকাশ্য সভায় বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেন। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ইংরেজ পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত বিচার ও ধর্ম্মালোচনা করিয়া তাঁহার গভীর জ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও অতুলনীয় বিচারশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ আইরিস কবি মূরের

সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। বিলাতের উচ্চশ্রেণীর ধনকুবের ও সম্ভ্রান্ত-সম্প্রদায় তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ উইলিয়মও সাক্ষাৎকালে তাঁহাকে সমাদর করিয়াছিলেন। অভিষেক-সভায় তিনি বিদেশীয় দূতগণের সহিত আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি হাউস অফ কমন্স কমিটীতে উচ্চপদে ভারতবাসীদিগকে নিযুক্ত করিবার অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতের কৃষি-উন্নতি, দেওয়ানী ও রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রবন্ধ-পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিলেন।

ফ্রান্সের সম্রাট্ লুই রামমোহনকে দুইবার প্যারিসে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া সমাদর করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া,২৭শে সেপ্টেম্বর ঊনষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ব্রিষ্টল নগরে জ্বরবিকার রোগে রামমোহন দেহত্যাগ করেন। জনশূন্য প্রান্তরে তাঁহার দেহ সমাহিত ছিল। দশ বৎসর পরে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্রিষ্টলের আরনস্‌ভেলে সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া রামমোহনের সমাধিস্থ শব উহাতে সমাহিত করেন।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবনে' গ্রন্থে লিখিয়াছেন— "পরমজ্ঞানী রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মকে বেদ-উপনিষদ-মূলক প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া সংস্থাপিত করেন, এবং তদ্দ্বারা খৃষ্টধর্ম্মের তরঙ্গ অবরোধ করিয়া দেশ রক্ষা করেন। পৌত্তলিকতা পর্য্যন্ত তিনি নিম্ন অধিকারীর জন্য প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করেন। ইতিমধ্যেই দেশের কয়েকটি উজ্জ্বল রত্ন খৃষ্টান হইয়া গিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং কেশবচন্দ্রও সেই আকর্ষণে পড়িয়াছিলেন। ক্ষণজন্মা রামমোহন রায়ের অভ্যুত্থান না হইলে আজ

দেশ অর্দ্ধেক খৃষ্টান হইয়া যাইত। জ্ঞানে, মানসিক প্রতিভায় এবং চিন্তাশীলতায় রামমোহনের সমকক্ষ কেহই ছিলেন না।”

বর্ত্তমান যুগে রাজা রামমোহনের ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বিরল। রাজা রামমোহন ভারতের বহুবিধ উন্নতির সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, উচ্চশিক্ষা-বিধান, গঙ্গাসাগরে পুত্র-বিসর্জ্জনের প্রতিকূল আন্দোলন, সতীদাহ-নিবারণ প্রভৃতি যে সকল সদনুষ্ঠানের সূচনা করিয়া রাজা রামমোহন মঙ্গল-বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আমরা এখন তাহার সুফল ভোগ করিতেছি।

রাজা রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, বহু ভাষায় অভিজ্ঞ, নানা গ্রন্থের প্রণেতা, উপনিষদের ইংরাজী ও বাঙ্গালা অনুবাদক, প্রথম বাঙ্গালা সাহিত্য-লেখক, বহুশাস্ত্র-বিশারদ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য—তর্ক-যুদ্ধে বিজয়ী বীর, কঠোর পরিশ্রমী, দৃঢ় অধ্যবসায়শীল, সত্যপথাশ্রয়ী, মহানুভব, পরদুঃখ-কাতর ও প্রতিভার বরপুত্র ছিলেন। তিনি যে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মুমুক্ষু ব্যক্তি ছিলেন, ঈশ্বরলাভের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা ছিল, তাঁহার রচিত প্রাণময়ী গীতাবলীই তাহার নিদর্শন। তিনি শৈশব হইতে ধর্ম্মানুশীলনে ব্যস্ত থাকিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত পরমব্রহ্মের ধ্যানে সমাহিত ছিলেন। মহাত্মা রামমোহন ভারত-রত্নাকরের একটি সমুজ্জ্বল রত্ন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৩রা জ্যৈষ্ঠ, অমাবস্থার দিন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতার স্বপ্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ও পরোপকারী ছিলেন; দানশীলতা ও অমিতব্যয়িতাব জন্য ঋণজালে বিজড়িত হইয়াছিলেন। জননী দিগম্বরী দেবী আদর্শ-দয়াবতী রমণী ছিলেন। তাঁহার পিতামহী ভক্তিমতী ও নিষ্ঠাবতী হিন্দুরমণী ছিলেন; সর্ব্বদা পূজাদিতে নিবিষ্ট থাকিতেন। শৈশবে দেবেন্দ্রনাথ পিতামহীর বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। বাল্যে দেবেন্দ্রনাথ অতুল ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে নানা বিলাসসম্ভারে পরিবৃত হইয়া পালিত হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের পিতা বাড়ীতে শিক্ষক রাখিয়া তাঁহার বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত, পার্শী, সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিক্ষার স্বব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ রাজা রামমোহনের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। রামমোহনেব মহনীয় চরিত্রের সংস্পর্শে পুত্রকে জ্ঞানবান্, প্রতিভাবান্ করিবার জন্য কিছুদিন পরে তিনি দেবেন্দ্রনাথকে রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। পরে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তাঁহাকে স্বশিক্ষক ডিরোজিওর শিক্ষকতায় উন্নত হিন্দু স্কুলে প্রেরণ করেন।

শৈশবে দেবেন্দ্রনাথ পিতামহীর ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ভক্তিমাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়া দেবদেবীর ভক্ত হইয়াছিলেন—উপনয়নের পরে ভক্তিনম্রচিত্তে গৃহবিগ্রহ শালগ্রামশিলার পূজা দেখিতেন। প্রত্যহ সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া হিন্দু কলেজে যাইতেন—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর প্রার্থনা করিতেন। সহসা একদিন অনন্ত উন্মুক্ত আকাশ দেখিয়া তাঁহার ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিল। তিনি লিখিয়াছেন—"শুভক্ষণে যখন এই অনন্ত আকাশের উপর আমার নয়নযুগল নিক্ষিপ্ত হইল, তখনই আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল।"

রাজা রামমোহন দেবেন্দ্রনাথকে বড় ভালবাসিতেন—স্বহস্তে ফল খাওয়াইতেন, বাগানের দোলনায় দেবেন্দ্রনাথকে চাপাইয়া দোলাইতেন; বিলাতযাত্রার সময় সাদরে করমর্দ্দন করিয়া বিদায় লইয়াছিলেন। তাহাতে দেবেন্দ্রনাথের শরীরে উৎসাহের বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়াছিল। রাজা রাম-মোহনের বিলাতযাত্রায় ব্রহ্মসভার প্রতিভা-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইতে-ছিল। পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অসাধারণ একাগ্রতায় দ্বাদশ বৎসর সভাটি নামমাত্র রক্ষা পাইয়াছিল। সভায় শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার প্রতিপন্ন করিবার জন্য বক্তৃতা হইত, বেদপাঠকালে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মসভার এই অবস্থান্তর-সময়ে যেন কোন দৈব বিধানবশে যুবক দেবেন্দ্রনাথ ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ কাহারও নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করেন নাই। সহসা অবস্থাচক্রে তাঁহার মনে অন্তর্নিহিত ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। ষোড়শবর্ষ বয়সে

যশোহরের রায় চৌধুরী পরিবারের শ্রীমতী সারদা দেবীর সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। দুই বৎসর তাঁহার মুক্তি-সাগরগামিনী জীবন-নদী সুখ-আসক্তির শৈলে প্রতিহত হইয়াছিল। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পিতামহীর অন্তিমশয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, নশ্বর মানবদেহের পরিণাম দেখিয়া, শ্মশানে আনন্দময় অনন্তদেবের বিমল-উজ্জ্বল জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া তাঁহার মনে অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। পিতামহীর মৃত্যুতে বিষাদ ও বৈরাগ্যে তাঁহার অনিত্য সংসারসুখে বিতৃষ্ণা জন্মিল। তিনি কল্পতরু হইয়া নিজের ভোগবিলাসের বৈভবগুলি দান করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মনে শ্মশানের ছবি সর্ব্বদা প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বর-চিন্তায় বিভোর —তন্ময় করিল। তিনি বলিতেন—"জীবন নীরস, পৃথিবী শ্মশানতুল্য, কিছুতেই সুখ নাই—কিছুতেই শান্তি নাই।"

তিনি অধিকক্ষণ বাড়ীতে থাকিতে পারিতেন না; শিবপুর কোম্পানীর বাগানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া অনন্তসৌন্দর্য্যময়ের ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতেন। যৌবনের সুখাসক্তির প্রবল বাসনা বৈরাগ্যের অনলে ভস্ম করিয়া ব্রহ্মকৃপালাভের আশায় তন্ময় হইয়া থাকিতেন।

এই সময় তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রবল অনুরাগী হইয়া সভাপণ্ডিতের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও মহাভারত পাঠ করেন; পরে পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও ইংরাজী দর্শন শাস্ত্র পাঠে ও নির্জ্জন-প্রদেশে ধ্যানে প্রত্যহ তাঁহার নূতন নূতন সত্য উপলব্ধি হইতে লাগিল। তাঁহার ধারণা হইল, এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত-সৌন্দর্য্যময়ের সৃষ্ট; সেই অনন্তদেব কোন দেবদেবীর কাল্পনিক মূর্ত্তি নহেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রতিমাপূজার পৌত্তলিকতায় আর যোগদান করিবেন না। তদবধি তিনি

পূজার দালানে সন্ধ্যা-আরতির সময় পিতার সহিত যাইতেন বটে, কিন্তু প্রণাম করিতেন না। সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র পৌত্তলিকতার শাস্ত্র বলিয়া দেবেন্দ্র-নাথের ভ্রম ছিল, কিন্তু ঈশ উপনিষদের একখানি ছিন্নপত্রের শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার উপনিষদের প্রতি ভক্তি জন্মিল। তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ব্রহ্মানন্দলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন; এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় "জগতস্থ সমস্ত বস্তুই পরমেশ্বর কর্তৃক পরিব্যাপ্ত; পাপচিন্তা, বিষয়বাসনা ও ধনলিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর"—এই সার সত্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহার জীবন-সমস্যার সমাধান হইল—বিলাস-মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞান-তমোঘোর কাটিয়া জ্ঞানের দিব্যজ্যোতিঃ উদ্‌ভাসিত হইল। উপ-নিষদের অনুরাগী হইয়া পণ্ডিতের সাহায্যে তিনি ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি এগারখানি প্রধান উপনিষদ পাঠ করেন, এবং বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে শিক্ষা করেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে দেবেন্দ্রনাথ দশ জন সভ্য লইয়া "তত্ত্ব-বোধিনী" সভা স্থাপন ও "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" প্রচার আরম্ভ করেন। বঙ্গসাহিত্যের সমুজ্জ্বল রত্ন অক্ষয়কুমার দত্তের সুযোগ্য সম্পাদনে ও প্রাতঃ-স্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি সভ্যগণের নির্ব্বাচিত জ্ঞানগর্ভ, শিক্ষাপ্রদ, লোকহিতকর প্রবন্ধরাজিতে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" গৌরবান্বিত হইত। এই পত্রিকায় দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের বিচার, বেদবেদান্তের সত্যনির্ণয়, ব্রহ্ম-উপাসনাদি প্রচারিত হইতে লাগিল।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মসমাজে দীক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া ১৯ জন সভ্যের সহিত দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ৫০০ যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্ম-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ

করেন, এবং উপাসনার জন্য একটি প্রার্থনা রচনা করেন। এই সময় ব্রাহ্মভক্তেরা তাঁহাকে 'মহর্ষি' আখ্যায় অভিহিত করেন। আদি, সাধারণ ও নববিধান সমাজে উপনিষদের যে সকল মন্ত্র ও শ্লোক উচ্চারিত হয়, অক্ষয়কুমার দত্তের সহায়তায় মহর্ষি সেগুলির সঙ্কলন করিয়াছিলেন। অষ্টাবিংশ বর্ষ বয়সে--পূর্ণযৌবনের পূর্ণ উদ্যমে মহর্ষি এই ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রহ্মজ্ঞানলাভ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার পিতা ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিতেন—"একে তার বিষয়বুদ্ধি অল্প, ব্রহ্ম ব্রহ্ম ক'রে আর কিছুতেই মন দেয় না।" ব্রাহ্মধর্ম্মসাধনের জন্য দেবেন্দ্রনাথ কঠোরতা করিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন—"আমি সম্যক্‌রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য প্রতিদিনই অভুক্ত অবস্থায় অতন্দ্রিত ও সংযত হইয়া গায়ত্রীর দ্বারা তাহার উপাসনা করিতে লাগিলাম।"

ডফ সাহেব প্রভৃতি খৃষ্টান পাদ্রীগণের প্রবল চেষ্টায় ও উৎসাহে সেই সময় খৃষ্টধর্ম্মের প্রসার বিস্তৃত হইতেছিল। "পাদ্রীরা অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগের পর্য্যন্ত খৃষ্টান করিয়া গৃহে গৃহে অশান্তির আগুন জ্বালিতেছেন, ইহার প্রতিবিধান হওয়া উচিত" বিবেচনা করিয়া দেবেন্দ্রনাথ সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণের বাড়ী বাড়ী গিয়া পুত্রগণকে পাদ্রীদিগের স্কুলে না পাঠাইয়া নিজেদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের সুচিন্তিত প্রবন্ধ পড়িয়া হিন্দুসমাজের নেতৃগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। 'ধর্ম্মসভা' ও ব্রহ্মসভার মতভেদবৈষম্য বিদূরিত হইল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রায় এক হাজার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমবায়ে এক মহাসভার অধিবেশন হইল। সভায় একরাত্রে ৪০ হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইল, এবং স্থির হইল, পাদ্রীদের বিদ্যালয়ের মত বিনা বেতনে ছাত্রেরা

শিক্ষা পাইবে। রাজা রাধাকান্ত দেব সভাপতি; দেবেন্দ্রনাথ ও হরি-মোহন সেন সম্পাদক ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন। হিন্দুচূড়ামণি রাজা রাধাকান্ত দেব এই সময় দেবেন্দ্রনাথকে "জাতীয়-ধর্ম্ম-পরিরক্ষক" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধে ও ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তারে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার-কার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হইয়া পাদ্রীরা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তীব্র সমালোচনা ও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে পুস্তিকা প্রচার ও বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের সময় দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাড়ীতে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হইত; তিনি তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের শ্রাবণ মাসে বিলাতে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়—ভাদ্রমাসে দেবেন্দ্রনাথ পিতৃবিয়োগ-সংবাদ পাইয়া নিয়মমত অশৌচ গ্রহণ ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে শাস্ত্র-বিধানমত শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন, এবং অনুরোধ করি-লেন। দেবেন্দ্রনাথ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। হঠাৎ রাত্রে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পাইয়া তিনি হিন্দুরীতি অনুসারে শ্রাদ্ধ না করিয়া নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রে স্বতন্ত্র-ভাবে কেবল দান উৎসর্গ করিলেন। জ্ঞাতি-কুটুম্বেরা ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া নিমন্ত্রণে আসিলেন না। মহর্ষি বলিয়াছেন—"জ্ঞাতিকুটুম্বেরা আমায় ত্যাগ করিলেন; কিন্তু ঈশ্বর আমায় আরও গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মের জয়ে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। এ ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না।"

প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া প্রিন্স দ্বারকানাথ উইল করিয়া সমস্ত সম্পত্তি দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ তিন পুত্রকে সমভাগে প্রদান করেন। "কার ঠাকুর কোম্পানী" নামে প্রসিদ্ধ কার-বারের অর্দ্ধ অংশ দ্বারকানাথের ও অপরার্দ্ধ কয়েক জন ইংরাজ অংশী-দারের ছিল। দ্বারকানাথ এই কারবারের অর্দ্ধাংশ দেবেন্দ্রনাথকে প্রদান করেন। সাধু দেবেন্দ্রনাথ আপনার অর্দ্ধাংশ ভ্রাতৃদ্বয়কে সমভাগে প্রদান করিয়া সম্পত্তি ও ব্যবসায়ের পরিদর্শনের ভার গিরীন্দ্রনাথের উপর দিয়া কাশীধামে গমন করেন। কাশীধাম হইতে ফিরিয়া দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন—তাঁহাদের হাউস—"কার ঠাকুর কোম্পানী"র অবস্থা শোচ-নীয়; নিয়মিতভাবে হুণ্ডি পরিশোধ হইতেছে না; এক দিন ত্রিশ হাজার টাকার হুণ্ডির টাকা দিতে না পারিয়া কোম্পানীর সম্ভ্রম গেল; আফিস দেউ-লিয়া হইল। দেবেন্দ্রনাথ হিসাব করাইয়া দেখিলেন, হাউসের দেনা ১ কোটী টাকা, পাওনা ৭০ লক্ষ টাকা। সাধু দেবেন্দ্রনাথ বিব্রত হইলেন; পিতৃঋণ পরিশোধ করিবার জন্য নিঃসম্বল—পথের ভিখারী হইতেও প্রস্তুত হইলেন। সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারকানাথ একখানি 'ট্রষ্টডীড' সম্পাদন করিয়া কতকগুলি সম্পত্তি স্বতন্ত্র করিয়াছিলেন; পুত্রগণ তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিবেন, কিন্তু পাওনাদারেরা উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের পরামর্শমত হাউসের কর্ম্মকর্ত্তা গর্ডন সাহেব পাওনাদারগণকে আহ্বান করিয়া হিসাব দেখাইয়া বলিলেন, হাউসের মালিকেরা সমস্ত সম্পত্তি দিয়াও ঋণ শোধ করিতে প্রস্তুত—কেবল ট্রষ্ট-সম্পত্তিতে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। এই প্রস্তাবে পাওনাদারেরা অসন্তুষ্ট হইল দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন,

পিতৃঋণ-শোধের জন্য আইনের অপেক্ষা না করিয়া আমার সমস্ত সম্পত্তিই আমি দিতে প্রস্তুত। অযাচিতভাবে আশাতীত সম্পত্তি পাইয়া পাওনাদারেরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল; কেহ কেহ এই জলন্ত ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পাওনাদারেরা সন্তুষ্ট হইয়া সম্পত্তির আয় হইতে তাঁহাদের নিজব্যয়ের জন্য বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। বিষয়াসক্তিহীন দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—"আমি যা চাই, তাহাই হইল। বিষয়সম্পত্তি সকলই হাত হইতে চলিয়া গেল। যেমন আমার মনে বিষয়ের অভিলাষ নাই, তেমনি বিষয়ও নাই, বেশ মিলে গেল। * * হে ঈশ্বর, আমি তোমা ছাড়া আর কিছুই চাই না * * চাকরের ভিড় কমাইয়া দিলাম, গাড়ী-ঘোড়া নীলামে দিলাম। খাওয়া-পরা পরিমিত করিলাম, ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলাম। একেবারে নিষ্কাম হইলাম। হে ঈশ্বর, অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তোমাকে না পাইয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল—এখন তোমাকে পাইয়া আমি সব পাইয়াছি।" পৈতৃক সম্পত্তি উত্তমর্ণদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া ভোগলালসা হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বস্বে নির্লিপ্ত মহর্ষি অবিচলিতচিত্তে প্রত্যহ রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে ধর্ম্মালোচনায় তন্ময় হইয়া থাকিতেন। এই সময় তিনি 'যোগসাধননিরত মহর্ষি' নামে অভিহিত ও সাধারণে সমাদৃত ও ভক্তিভাজন হইলেন।

তিন চার মাস পরে দেনা-পরিশোধের সুব্যবস্থা হইতেছে না দেখিয়া মধ্যম ভ্রাতার প্রস্তাবে দেবেন্দ্রনাথ পাওনাদারগণের নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। বাড়ীতে আফিস উঠাইয়া আনিয়া কঠোর শ্রম ও একান্ত অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় তিনি এত

মিতাচারী হইয়াছিলেন যে, যাঁহার পিতার প্রত্যেক ডিনারে তিন শত টাকা ব্যয় হইত, তাঁহার পুত্র কেবল চারি আনা মূল্যের খাদ্য আহার করিতেন!

প্রিন্স দ্বারকানাথ কলিকাতার "ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটী" নামক এক দাতব্য-সমিতিতে এক লক্ষ টাকা দান করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যখন মহাজনগণের ঋণদায়ে বিব্রত, সেই সময় ঐ সমিতির কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতৃ-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে বলিলেন। দেবেন্দ্রনাথ উহা তাঁহার পিতৃ-ঋণ বিবেচনায় সময় লইয়া সুদসহ সেই লক্ষ টাকা পরিশোধ করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের বাঙ্গালা রচনা উৎকৃষ্ট ছিল। তাঁহার চেষ্টায়, আনুকূল্যে, উৎসাহে, অনুপ্রেরণায় বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ঋগ্বেদ ও উপনিষদের বাঙ্গালা অনুবাদ "আত্মতত্ত্ববিদ্যা", "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস", "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান", "জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি," "প্রবচন-সংগ্রহ", "স্তুতিমালা", "পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত", "আত্মজীবন-চরিত্র" প্রভৃতি অনেকগুলি সুচিন্তাপূর্ণ উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। স্বদেশী সাহিত্য ও স্বদেশী ভাবে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল—তাঁহার জামাতার লিখিত ইংরাজী পত্র তিনি না পড়িয়া ফেরত দিয়াছিলেন। তিনি গবর্মেণ্টের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না—গবর্মেণ্টের উপাধি-প্রদান-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও দুই বৎসর পরে আর তিন জন পণ্ডিতকে বেদবেদান্তশিক্ষার জন্য কাশীধামে পাঠাইয়াছিলেন। বেদ-উপনিষদাদির প্রকৃত অর্থ জানিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি ইহাঁদের সাহায্য লইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের

নিকট বেদপাঠ করিয়া বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ও বেদান্তাদিতে সুপণ্ডিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ জীবনের সায়াহ্ণ পর্য্যন্ত জ্ঞানচর্চ্চায় নিমগ্ন ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের পাঁচটি কন্যা ও সাতটি পুত্র হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের পরিবার যেন লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সম্মিলনের লীলাভূমি। তাঁহার এক কন্যা সাহিত্য-সাম্রাজ্ঞী, কবিরাণী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রতিভাশালী, সুপণ্ডিত দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ, সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসী সিভিলিয়ান ও জজ সত্যেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদির অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কবি-সম্রাট্‌, প্রতিভার বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ, এই চারি পুত্রই ধর্ম্মে কর্ম্মে পিতৃপথের অনুসরণ করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন—জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে, যশে ও প্রতি-ভায় সকলেই দেশমান্য। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং সন্তানগণের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতেন ; সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতেন উপাসনা-মন্দিরে যাইতেন।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনে সংসারী ও ত্যাগীর অপূর্ব্ব সমাবেশ। তিনি অধিকাংশ সময়ই বাহিরে থাকিতেন ;—পর্ব্বত, অরণ্য, নদীকুল ও নির্জ্জন প্রান্তরই তাঁহার মনোনীত রম্যস্থান ছিল। বাহিরে থাকিয়াও তিনি সর্ব্বদা উপযুক্ত পরামর্শ দিয়া বিষয় রক্ষা করিতেন, সংসার ও প্রকাণ্ড জমীদারীর প্রত্যেকেই তাঁহার প্রভাব ও শাসন অনুভব করিত। সংসারী বিষয়ী লোক যে ধর্ম্মসাধনে নিমগ্ন থাকিতে পারে, দেবেন্দ্রনাথ তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঋণ শোধ করিয়া মহর্ষি লোকহিতে ব্রতী হইয়া ছিলেন। তিনি বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকা দান করিতেন। তিনি বলিতেন, তাঁহার সম্পদ্‌রাশি ভোগের জন্য নহে—লোকহিতের জন্য ; এ ধনে দরিদ্রের অধিকার আছে। ১৭৮৪ শকে দেবেন্দ্রনাথ রায়পুরের জমীদারের নিকট হইতে বোলপুরের

ভুবনডাঙ্গার বিস্তৃত মাঠ ক্রয় করিয়া নির্জ্জনে সাধন-ভজনের জন্য "শান্তি-নিকেতন" নামে সুরম্য আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। মহর্ষি এই আশ্রমের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ মাসিক দেড় শত টাকা আয়ের সম্পত্তি দিয়া সমাগত সাধকগণের সাধনার ও আতিথ্যের সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

শেষ জীবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি সিমলা, মুসুরী ও দার্জ্জিলিং শৈলে, এবং শান্তিনিকেতনে অবস্থান করিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। এইরূপ সাধনায় তিনি অমূল্য সত্য লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া উপদেশ, আলোচনা ও বক্তৃতাদি করিয়া, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, ও সিংহলে গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। এই সময় রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে সহায়করূপে পাইয়া তাঁহার উৎসাহ সমধিক বর্দ্ধিত হইল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১লা বৈশাখ মহর্ষি প্রিয় শিষ্য কেশবচন্দ্রকে "ব্রহ্মানন্দ" উপাধি প্রদান করেন। কেশবচন্দ্রের সহযোগিতায় কয় বৎসর ব্রহ্মসমাজের প্রচার-কার্য্য পূর্ণ উদ্যমে উৎকৃষ্টভাবে চলিতে লাগিল। উপবীত ত্যাগ না করিলে কেহ উপাচার্য্যের পদ পাইবেন না, কেশবচন্দ্র এই মত প্রবর্ত্তিত করিলে, মহর্ষির সহিত কেশবচন্দ্রের মতবিরোধ ঘটে; গুরু-শিষ্যে ধর্ম্মজীবনের বন্ধন ছিন্ন হয়। কেশবচন্দ্র আদি-ব্রাহ্মসমাজ হইতে অপসৃত হন। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে ভিন্ন, এ কথা রাজা রামমোহন ও মহর্ষি কখনও প্রচার করেন নাই। সামাজিক প্রথার ভিন্নতা কখনও ধর্ম্মনীতির মূল-সূত্রকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না, ইহাই তাঁহাদের মত ছিল। কিন্তু কেশবচন্দ্র সে মত পরিহার করিলেন। মহর্ষি পুত্রাধিক প্রিয় শিষ্য কেশব-চন্দ্রের বিচ্ছেদে মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন; কিন্তু স্নেহের অনুরোধে মতচ্যুত

—কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। মহর্ষি ভদ্রতা ও সৌজন্যের আদর্শ ছিলেন। একবার তাঁহার সংস্রবে আসিলে, তাঁহাকে কেহ বিস্মৃত হইতে পারিত না। সংসার মায়ার লীলাভূমি, ঈশ্বরই অনন্ত সত্য, এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি সাংসারিক দুঃখ-কষ্টে—প্রিয়জন-বিয়োগ-শোকে বিচলিত হইতেন না।

শৈশব হইতে ঈশ্বরচিন্তায় তন্ময় থাকিয়া সপ্তাশীতি-বর্ষ-বয়সে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই মাঘ দেবেন্দ্রনাথ নরজগৎ ত্যাগ করিয়া পরম ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মত ত্যাগী, ভোগাসক্তিহীন, সত্যনিষ্ঠ, নিঃস্বার্থ পরোপকারী, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রহ্মোপাসক বর্ত্তমান যুগে বিরল। কোনও মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন,—'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেন পৌরাণিক যুগের জনক—সংসারী সন্ন্যাসী।' সম্পদরাশির মধ্যে থাকিয়াও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত সাধনামগ্ন। তাঁহাকে সুবিস্তৃত জমিদারীর মালিক—কমলার প্রসাদপুষ্ট ধনবান্ বলিয়া লোকে জানিত না; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াই ভক্তিনম্রহৃদয়ে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিত। তাঁহার ভক্তিপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ উপদেশামৃতে ত্রিতাপ-দগ্ধ মানব শান্তি লাভ করিত;—'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ' জ্ঞান করিয়া হিন্দুধর্ম্মের চিরশান্তি-পরিমল স্নিগ্ধচ্ছায়াই গৌরবের লীলাভূমি মনে করিত। মহর্ষির জীবনের সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও, তিনি যৌবনে যে অদ্ভুত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন—অতুল ঐশ্বর্য্য, সুখসম্পদ্ স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়া সত্যের ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া পিতার উত্তমর্ণগণকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন, তাহারই গৌরবগাথা দেবেন্দ্রনাথের পুণ্য-স্মৃতিকে অমরত্ব প্রদান করিবে—সে পুণ্য-চরিত্র-মাধুরীতে মানব-হৃদয় চিরদিনই আকৃষ্ট হইবে,—সেই সমুজ্জ্বল প্রভার দিকে চাহিয়া স্বার্থান্ধ সংকীর্ণচিত্ত মানব আপনার ক্ষুদ্রতায় ক্ষুব্ধ—লজ্জিত হইবে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, ১৯শে নবেম্বর, কলিকাতা কলুটোলার সম্মানিত সেন-বংশে কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ রামকমল সেন কলিকাতার বাঙ্গাল-ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন। পিতা প্যারীমোহন সেন সদাশয় দয়াবান্ ব্যক্তি ছিলেন, টাকশালে উচ্চপদে কর্ম্ম করিতেন। মাতা সারদাসুন্দরী ধর্ম্মশীলা নিষ্ঠাবতী রমণী ছিলেন। কেশবচন্দ্র ধর্ম্মভাব লইয়াই জন্মিয়াছিলেন। শৈশবে তিনি হরিভক্ত ছিলেন;—পট্টবস্ত্র পরিয়া, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দিয়া, মৃদঙ্গের সঙ্গে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। বাল্যে কুসংসর্গ হইতে সাধ্যমত দূরে থাকিতেন। শিশু কেশবচন্দ্রের বাল্য-ক্রীড়ায় একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি বন্ধুগণকে লইয়া 'রাম-যাত্রা' করিতেন, ব্যাঙের দল বাহির করিতেন, ডাকঘরের ডাকবিলির খেলা খেলিতেন, সাহেব সাজিয়া ম্যাজিক দেখাইতেন, বিজয়ার দিন নগর-সঙ্কীর্ত্তনের দল বাহির করিতেন।

কৈশোরে কেশবচন্দ্র বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন; প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন; কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণযাত্রা শুনিতে বড় ভালবাসিতেন; সারা রাত্রি কৃষ্ণযাত্রা শুনিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেন না।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে, সাত বৎসর বয়সে, কেশবচন্দ্র হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তিপ্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ও শিক্ষকগণের স্নেহভাজন হন। বার্ষিক পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া তিনি বড় বড় গ্রন্থ পারিতোষিক পাইতেন—ইংরেজ শিক্ষক ষ্টারজিয়ন্ তাঁহাকে "বৃহৎপুস্তকবাহী ক্ষুদ্র বালক" বলিয়া কৌতুক করিতেন। একাদশ বর্ষ বয়সে কেশবচন্দ্রের পিতৃ-বিয়োগ হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে, তিনি রাজেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজে প্রবেশ করেন। মেট্রোপলিটানে তখন শিক্ষাদানের ভাল ব্যবস্থা ছিল না; কিন্তু কেশবচন্দ্র ডবল প্রমোশন পাইতেন। মেট্রোপলিটান উঠিয়া গেলে, তিনি আবার হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়া বিফল-মনোরথ হন। পরে গণিত-শাস্ত্রের উপর বিরক্ত হইয়া কিছুদিন পাঠের পর কলেজ ত্যাগ করিয়া বাড়ীতে দুই বৎসর অসীম অধ্যবসায় ও বিশেষ মনোযোগ সহকারে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। পরিণত বয়সেও বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত কেশবচন্দ্রের ভালবাসা ও সৌহৃদ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে গিয়া কেশবচন্দ্রের মাধুর্য্যময় বক্তৃতাশ্রবণে তৃপ্ত হইতেন। "নবজীবন" পত্রিকায় প্রকাশিত "ধর্ম্মতত্ত্ব" গ্রন্থে তিনি কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে উচ্চমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে, বালীর চন্দ্রকুমার মজুমদারের কন্যা, সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা গোলাপসুন্দরীর সহিত কেশবচন্দ্রের বিবাহ হয়। বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই কেশবচন্দ্রের অন্তরে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল;—তিনি নিরামিষ খাইতেন,

সামান্য বেশে থাকিতেন, সুখভোগ তাঁহার ভাল লাগিত না। বিবাহের পর স্ত্রীর সৌন্দর্য্যে কেশবচন্দ্র আকৃষ্ট হইলেন না, স্ত্রীকে যথোচিত ভালবাসিতে পারিলেন না। তিনি 'জীবন-বেদে' লিখিয়াছেন,—"চতুর্দ্দশ বৎসরেই মৎস্য-ভক্ষণ পরিত্যাগ করিলাম। * * এক গুরু জানিতাম, তাঁহাকেই মানিতাম, তাঁহাকে বিবেক বলিতাম। * * যত প্রকার সুখভোগ যৌবনে হয়, তৎসমুদয় বিষবৎ ত্যাগ করিলাম। * * যাহাতে কষ্ট হয়, গাম্ভীর্য্যবৃদ্ধি হয়, কুচিন্তার দিকে মন না যায়, এমন সকল বিষয়েই নিযুক্ত হইতাম।** বিবেক ও বৈরাগ্য দুই ভাই মিলিয়া জীবনকে শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরে দেখি, সংসার কাছে আসিতে পারিল না। আত্মীয়পীড়ন ও ভার্য্যা-পীড়ন দ্বারা ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইল।" তাঁহার হৃদয় হইতে 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর'—এই ভাব সর্ব্বদাই উত্থিত হইতে লাগিল। * "প্রার্থনা করিলাম। * * এমন সময় ছিল, যখন আমার প্রার্থনা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।" কেশবচন্দ্র ভক্তি-নম্র-হৃদয়ে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মের দিব্য প্রভা, স্নিগ্ধ শান্তি উদ্ভাসিত হইল।

কেশবচন্দ্র বৈষ্ণব-পরিবারে জন্মিয়া বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন; কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের গ্রন্থরাজি পাঠ করিয়া ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বে তাঁহার সন্দেহ জন্মিল—তিনি দেবদেবীগণের প্রতি ভক্তি হারাইলেন। নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া হৃদয়ের নিভৃত মর্ম্মে তাঁহার বাণী শুনিলেন। পাদ্রী বারণ সাহেবের নিকট বাইবেল পড়িয়া ও পাদ্রী লঙ সাহেবের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া কেশবচন্দ্র খৃষ্টধর্ম্মে আকৃষ্ট হইলেন। এই সময় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ব্রাহ্মধর্ম্মের বক্তৃতাসমষ্টি পাঠ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাসের সহিত

একমত হইয়া, নিরাকার ও একেশ্বরবাদী কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী ও আস্থাবান্ হইলেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় হইতে ফিরিয়া বন্ধুপুত্র কেশবচন্দ্রকে পাইয়া পুলকিত হইলেন—ব্রাহ্মসমাজে মণিকাঞ্চনযোগ হইল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী* লিখিয়াছেন—"এক দিকে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ, অপর দিকে মহর্ষির আধ্যাত্মিক জীবনের নব উদ্দীপনা, এই উভয়ে ব্রাহ্মসমাজে এক নবশক্তির সঞ্চার করিল। * * ব্রাহ্মসমাজ নব নব কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে লাগিল। কেশবচন্দ্র ঐ সকলের উদ্ভাবনকর্ত্তা ও দেবেন্দ্রনাথ পৃষ্ঠপোষক। ইং ১৮৫৯ সালে 'ব্রাহ্ম বিদ্যালয়' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র কলেজের ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সম্মানিত ছাত্র ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইলেন।"

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর কেশবচন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্র-নাথের সহিত অসীম সমুদ্রের অনন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য সিংহল-যাত্রা করিলেন। এই সময় সমুদ্রযাত্রা করিলে জাতি যাইত। কেশবচন্দ্রের গৃহে ক্রন্দন-রোল উত্থিত হইল। সিংহল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কেশবচন্দ্র বেঙ্গলব্যাঙ্কে ২৫৲ টাকা বেতনের কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। কার্য্যদক্ষতা ও সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার বেতনবৃদ্ধি হইল। কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের নিকট আত্মনিবে-দন করিলেন। ঈশ্বরলাভের জন্য তখন তিনি ব্যাকুল—দেশের নানা দুর্গতি দূর করিবার জন্য ব্যস্ত। এই সময়ের অবস্থার কথা কেশবচন্দ্র 'জীবন-বেদে'

লিখিয়াছেন ;—"আমি পাপী, আমি পাপী, মন, এইরূপই বলিত। ** এই স্বার্থপরতা হইল, তার পর এই অভিমান হইল, তার পর এই পরদ্রব্যে আসক্তি হইল, তার পর মিথ্যা বলিবার ইচ্ছা হইল, তার পর টাকার প্রতি মত্ততা আসিল। * * যেমনি পাপবোধ, অমনি কষ্ট, জ্বালা। ** কিসে পাপ যায়, প্রথমে এই একই চেষ্টা ছিল ; কিসে মনে কুপ্রবৃত্তি না হয়, এই ভাবই ছিল। কিসে পরসেবা করিয়া সার্থক-জন্ম হইব, * * কিসে স্বার্থপরতা যায়, দয়ায় ডুবিয়া থাকিতে পারি।"

ইংরাজী-শিক্ষিত এক শ্রেণীর যুবক-সম্প্রদায় তখন অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল—মদ খাইয়া মাতাল হইতে তাঁহারা সঙ্কুচিত—লজ্জিত হইতেন না, ধর্ম্মের সংস্রব রাখিতেন না। কেশবচন্দ্র যুবকগণের নাস্তিকতা ও চরিত্রহীনতার জন্য ব্যথিত হইলেন—তাঁহাদের সংশোধনের জন্য—ধর্ম্মে আস্থা জন্মাইবার জন্য "বঙ্গীয় যুবক, ইহা তোমারই জন্য," **"Young Bengal, that is for you"** নাম দিয়া বারোখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার প্রচার করিলেন ; বক্তৃতা ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বহু যুবক সুরাপান ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইল। তাঁহার বাগ্মিতায় সর্ব্বসাধারণে মুগ্ধ হইতে লাগিল।

এই সময় খৃষ্টান পাদ্রীগণের প্রভাব প্রবল ছিল। শিক্ষিত-সমাজ তাঁহাদের প্ররোচনায় হিন্দুধর্ম্মে ভক্তি হারাইয়া, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছিলেন। সুপণ্ডিত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাগ্মিবর কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলেখক লালবিহারী দে প্রভৃতি শিক্ষিতগণ প্রথম-যৌবনে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর পাদরীগণের প্রধান প্রচারক্ষেত্র ছিল। কেশবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে গিয়া পাদ্রীগণের সহিত তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পাদ্রীগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেন ; কেশবচন্দ্র খৃষ্টধর্ম্মের দোষ

দেখাইতেন। শত সহস্র ব্যক্তি কেশবচন্দ্রের জ্ঞানগর্ভ, যুক্তিপূর্ণ, ওজস্বিনী বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইতেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। কৃষ্ণনগরের পর কলিকাতাতেও পাদরীগণের সহিত প্রবল বাগ্‌যুদ্ধ চলিতে লাগিল। পরিহাসরসিক সুলেখক লালবিহারী দে কেশবচন্দ্রকে বিদ্রূপপূর্ণ প্রবন্ধে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন,—"ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলনে কলিকাতা সহর বিধ্বস্ত। এই আন্দোলনের নেতা এক দিকে কিশোর কেশবচন্দ্র, অন্য দিকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লালবিহারী। দুই জনের মধ্যে বক্তৃতায় কবির লড়াই আরম্ভ হইল। বাগ্মিতায় কেশবচন্দ্র এবং বিদ্রূপে লালবিহারী অদ্বিতীয়।" অবশেষে কেশবচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা ও হৃদয়াকর্ষিণী বাগ্মিতায়ই বিজয়ী হইল। লোকমত তাঁহারই প্রামাণ্য-যুক্তিতে প্রাধান্য স্বীকার করিল ; ব্রাহ্মসমাজ শক্তিমান হইল ; পাদ্রীগণ দমিয়া গেলেন। ডাক্তার ডফ্-প্রমুখ পাদ্রীগণ প্রকাশ্য সংবাদপত্রে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। শিক্ষিত যুবকবৃন্দ দলে দলে উপাসনালয়ে সমবেত হইয়া কেশবচন্দ্রের অগ্নিস্রাবিনী বক্তৃতায় ও জ্ঞানভক্তিপূর্ণ যুক্তিযুক্ত উপদেশামৃতে উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত হইতে লাগিল। অনেক যুবক তাঁহার বক্তৃতা-শ্রবণে ও পুস্তিকাপাঠে পাদ্রীগণের প্রলোভনজাল ছিন্ন করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণে বিরত হইল এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে ধর্ম্মালোচনার জন্য "সঙ্গত-সভা" প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্টাডিঙ্গির বাগানে এই সভার বোধনে বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। এই সভায় বহু যুবক কেশবচন্দ্রের নিকট সমবেত হইয়া জীবন-সমস্যা ও ধর্ম্মের জটিল রহস্যের সমাধান করিত।

১৮৬৩ সালে কেশবচন্দ্রের চেষ্টায় অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে "ব্রাহ্মবন্ধুসভা" নামে আর একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের অর্থ-সাহায্যে, কেশবচন্দ্রের সম্পাদকতায়, "ইণ্ডিয়ান মিরার" নামে ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহা পরে দৈনিকে পরিণত হইয়াছিল। ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতির প্রবন্ধে এই পত্রিকা সমৃদ্ধ হইত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক করেন। পরে কেশবের বক্তৃতা ও উপদেশের ওজস্বিনী শক্তিতে বহু লোককে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া মহর্ষি তাঁহাকে আচার্য্য-পদ ও 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি প্রদান করেন। আচার্য্যপদ-গ্রহণের দিন কেশবচন্দ্র সস্ত্রীক সমাজে গমন করেন। এই জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেশবচন্দ্রকে গৃহ ও পরিবার হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। তিনি কিছু দিন সস্ত্রীক মহর্ষির গৃহে পুত্রের ন্যায় অবস্থান করেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী কেশবচন্দ্র মান্দ্রাজে উপনীত হইয়া বজ্রনির্ঘোষে জ্ঞানপ্রবাহিণী বক্তৃতার স্রোতে দেশীয় ও ইংরাজগণকে মুগ্ধ করিলেন। ৫ই মার্চ্চ বোম্বাইয়ে পঁহুছিয়া, বক্তৃতা-প্রভাবে সাধারণের শ্রদ্ধা, সংবাদপত্রের উচ্চ-প্রশংসা ও গভর্ণর বাহাদুরের বন্ধুত্ব লাভ করিলেন। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে দুইটি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইল। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারকগণ ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া, সার্ব্বজনীন সৌভ্রাতৃবন্ধনে ভারতের বিভিন্ন জাতিকে আবদ্ধ করিয়া, একধর্ম্মী করিতে লাগিলেন।

উপবীত-ত্যাগী না হইলে কেহ উপাচার্য্যের পদে ব্রতী হইতে পারিবেন না, কেশবচন্দ্র এই মত প্রচার করিলে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত

তাঁহার মতবিরোধ ঘটে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, যদুনাথ প্রভৃতি উৎসাহী ব্রাহ্মযুবকগণকে লইয়া, আদি-ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া, "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নামে নূতন সভা প্রতিষ্ঠিত করেন।

কেশবচন্দ্র ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে উপাসনা-মন্দির-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন। নবসমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়া, স্বাধীনচেতা কেশবচন্দ্র নব উদ্যমে দলবল লইয়া, শতগুণ উৎসাহে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহাদের মতভেদ হইল বটে, কিন্তু মহাপ্রাণ মহর্ষির স্নেহের হ্রাস হইল না; তিনি সমভাবেই নূতন সমাজে উপদেশাদি দিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে "যীশুখৃষ্ট, ইউরোপ ও এসিয়া" নামক 'অসাধারণ বাগ্মিতা ও আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাবের উদারতা-পূর্ণ' প্রসিদ্ধ বক্তৃতা করিয়া যশোদীপ্ত ও সম্মানিত হইলেন। এই অপূর্ব্ব বক্তৃতাপাঠে মুগ্ধ হইয়া শিমলা শৈলাবাস হইতে বড়লাট সার জন লরেন্স পত্র লিখিয়া কেশবচন্দ্রের সহিত আলাপ করিলেন। এই আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইল। আদি ব্রাহ্মসমাজে 'ব্রাহ্মসমাজ সমর্থন', শিয়ালদহ রেল-ষ্টেসনে 'ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতা ও উন্নতিসংগ্রাম', মেডিকেল কলেজ থিয়েটারে 'মহাপুরুষ-বিষয়,' গোপাললাল শীলের ভবনে 'নবজীবনপ্রদ বিশ্বাস', টাউনহলে 'খৃষ্ট' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া তিনি বড়লাট ও সম্ভ্রান্ত ইংরাজ-সম্প্রদায় হইতে সর্ব্বসাধারণ পর্য্যন্ত সকলের সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে সভা আহ্বান পূর্ব্বক, অর্থ সংগ্রহ করিয়া, সাহায্য পাঠাইয়াছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপচন্দ্র, সাধু অঘোরনাথ, গৌরগোবিন্দ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ প্রচারকবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া কেশবচন্দ্র ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর,

বরিশাল, বেহার, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, লাহোর প্রভৃতি ভারতের নানা প্রদেশে প্রবল উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। পঞ্জাবের ছোট লাট ও লাহোরের ব্রিটিশ রাজদূত কেশবচন্দ্রকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার হৃদয়োন্মাদিনী বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ—আকৃষ্ট হইল ; সংবাদপত্রের উচ্চ প্রশংসায় সকল প্রদেশেই তাঁহার যশোরশ্মি বিকীর্ণ হইল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে শিক্ষিত ব্রাহ্মগণকে লইয়া নগর-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া, কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিস্থাপন করিলেন ;—উপাসনাদি করিয়া ২১ জন শিক্ষিত যুবককে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন ঃ—"১৮৬৭ সাল হইতে যুবকদলের প্রচারোৎসাহ আগুনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। অনেকে কল্যকার চিন্তা ত্যাগ করিয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেন ; এবং অর্দ্ধাশনে ও অনশনে দিন কাটাইতে এবং পাদুকাবিহীন-পদে কলিকাতা নগরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। * * ইঁহারা মহাত্মা চৈতন্যের ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং খোল-করতালসহ সঙ্কীর্ত্তন-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন।"

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় নগর-কীর্ত্তন করিয়া, ঋষিবেশে সুসজ্জিত কেশব-চন্দ্র ইংরাজী ও বাঙ্গালা বক্তৃতায় সকল সম্প্রদায়ের লোককে বিস্মিত—মোহিত করিয়া, পূর্ব্ব-বাঙ্গালা-ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। সিভি-লিয়ান মিঃ কে, জি গুপ্ত প্রভৃতি চল্লিশ জন শিক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষিত হইলেন।

টাউনহলে 'ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ' শীর্ষক বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র বিলাতযাত্রার জন্য সাধারণের নিকট অর্থ-সাহায্যপ্রার্থী হইলে পাঁচ শত টাকা মাত্র সংগৃহীত হইয়াছিল। পরে ইউটেরিয়ান সম্প্রদায়ের ব্যয়ে, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারী কেশবচন্দ্র লর্ড লরেন্স প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত একেশ্বরবাদী

সম্প্রদায়ের সাদর আহ্বানে বিলাতে যাত্রা করেন। ইউটেরিয়ান সম্প্রদায় তাঁহার বিলাতের ব্যয় বহন করিয়া, তাঁহার পরিবারবর্গকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। দেশমান্য রমেশচন্দ্র দত্ত, সার কে, জি, গুপ্ত প্রভৃতি তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন। মহানুভব গ্ল্যাড্‌ষ্টোন, মোক্ষমুলর, জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত সুপণ্ডিত ও ধনকুবেরগণের সহিত সুপরিচিত সম্মানিত হইয়া, কেশবচন্দ্র বক্তৃতার ভক্তি-মন্দাকিনীর প্রবল উচ্ছ্বাসে ইংরাজ নরনারীগণকে সম্মোহিত করিয়া, শ্রদ্ধা-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি লাভ করেন। ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ, লর্ড বাহাদুরগণ, সুপণ্ডিত দার্শনিক মনীষিগণ তাঁহাকে একটি সভা করিয়া বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেন। ইংলণ্ডের মহিলা-সমিতির সভাপতি হইয়া কেশবচন্দ্র ভারতীয় আর্য্য-মহিলার গুণগাথা, মহিলাগণের শিক্ষাসংস্কারের কথার-আলোচনায় তাঁহাদিগকে পুলকিত করিয়া ভারতের প্রতি তাঁহাদের গভীর শ্রদ্ধা উদ্দীপিত করেন। কেশবচন্দ্র ছয় মাস বিলাতে অবস্থান করিয়া সত্তরটি প্রকাশ্য সভায় প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ শিক্ষিত ব্যক্তির সম্মুখে বক্তৃতা করিয়া সাফল্যলাভ করেন। ধর্ম্ম-বক্তৃতা ভিন্ন ভারতের মঙ্গলের জন্য তিনি নির্ভীকচিত্তে রাজনীতিক বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। এই সকল বক্তৃতার মধ্যে মার্টিনোর ভজনালয়ে "ঈশ্বরের প্রাণের প্রাণ," কনওয়ের গির্জ্জায় "অপব্যয়ী পুত্র," হ্যাকণী চার্চ্চে "প্রার্থনা," ইস্‌লিংটনে "ঈশ্বরের প্রেম," একজেষ্টার হলে "সাধারণ শিক্ষা," মদ্যপান ও যুদ্ধ নিবারণী সভা, দাতব্য সভা, শ্রমজীবি-সম্প্রদায়, অন্ধবধির আশ্রমের অনেকগুলি বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য। সুরাপান-নিবারণী-সভায় তিনি বৃটিশরাজের মদ্য-ব্যবসার প্রতি তীব্র আক্রমণ করেন—ইংলণ্ডের দরিদ্র-সম্প্রদায়ের ভীষণ দুঃখের কথা আলোচনা করেন। স্পার্জ্জনস্ টেবার্ণকেলে "ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের

কর্ত্তব্য” বিষয়ে বক্তৃতায় ভারতে নীচশ্রেণীর ইংরাজগণের অত্যাচারের কথা বিবৃত করেন। “খৃষ্ট ও খৃষ্ট-ধর্ম্ম” বক্তৃতায় খৃষ্টধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য সুপ্রকাশ করেন। রামমোহন ও সেক্সপীয়রের সমাধি-ভবন-দর্শনকালে তিনি চল্লিশ জন পাদ্রীর স্বাক্ষরিত খৃষ্টান হইবার জন্য অনুরোধপত্র পান। উত্তরে তিনি বলেন, “আমি খৃষ্টান হইব না, কিন্তু যীশুর প্রেম-ভক্তি-আত্মত্যাগ আমার প্রার্থনীয়।” ডেলী নিউস, গ্রাফিক, ইন্‌কোয়ার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে কেশবচন্দ্রের চিত্র, বক্তৃতামালা ও উচ্চ প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩ই অগষ্ট ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিমন্ত্রণে কেশবচন্দ্র অসবোর্ণের রাজ-প্রাসাদে গিয়া মহারাণী, রাজকুমার লিওপোল্ড্‌ ও রাজকুমারীর লুইসার দর্শন ও নমস্কারলাভে সম্মানিত হন। মহারাণী, রাজকুমার ও রাজকুমারী তাঁহার ছবি ও স্বাক্ষর সাদরে গ্রহণ করেন। স্বহস্তে নাম লিখিয়া মহারাণী স্বামীর ও তাঁহার দুইখানি সচিত্র বাঁধাই জীবনচরিত ও প্রতিকৃতি উপহার প্রদান করেন।

অক্টোবর মাসে কেশবচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার সংস্কারে ব্যাপৃত হইলেন। এক দিকে সাধনার দ্বারা ধর্ম্মের নব নব সত্যের আবিষ্কার, অন্য দিকে নানা সদনুষ্ঠানের আয়োজনে প্রাণপণ করিলেন। দেশের সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি ‘ভারতসংস্কার’ সভা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এই সভার বিভিন্ন বিভাগ হইতে এক পয়সা মূল্যের “সুলভ সমাচার” নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ, দরিদ্রদিগের জন্য নৈশবিদ্যালয়-স্থাপন, “সুরাপান-নিবারণী সভা,” মহিলাগণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়, অসহায় ছাত্রগণের সাহায্যের জন্য দাতব্য ভাণ্ডার স্থাপিত হইল। ভারতসংস্কারসভার শ্রমশিল্পশিক্ষা-বিভাগে সূত্রধরের কার্য্য, সূচিকর্ম্ম, ঘড়ি

মেরামত, এন্‌গ্রেভিং, চিত্রমুদ্রণ প্রভৃতি অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিবার যথোচিত বিহিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সুরাপাননিবারণী সভা হইতে বিনামূল্যে 'মদ না গরল' পুস্তিকা বিতরিত হইত। মহিলাগণকে ধর্ম্মে ও গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিত করিবার জন্য কেশবচন্দ্র আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বহুবিধ প্রতিকূল আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ কাটাইয়া, প্রধানতঃ কেশবচন্দ্রের উদ্যমে ও আন্তরিক চেষ্টায় বিবাহবিষয়ক তিন আইন সিভিল বিবাহ বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে ব্রাহ্ম-সমাজে অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা বিবাহ পদ্ধতি বদ্ধ ও বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ হয়। কেশবচন্দ্র এই সময় যশের সমুচ্চ শিখরে আরূঢ় হইলেন। প্রতি বৎসর জানুয়ারীতে তিনি ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে টাউনহলে ইংরাজীতে ও বিডন গার্ডেনে বাঙ্গালাতে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণে শত শত ইংরাজ ও বাঙ্গালী মোহিনীমন্ত্রে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইতেন। রাজপ্রতিনিধি বড় লাট লর্ড লরেন্স কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিতে ভালবাসিতেন। বড় লাট লর্ড নর্থব্রুক টাউনহলের বক্তৃতা শুনিয়া প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। লর্ড লিটনের অনুরোধে তিনি টাউন হলে "ধর্ম্মে বিজ্ঞান ও উন্মত্ততা" নামে প্রসিদ্ধ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইংরাজীর ন্যায় বাঙ্গালাতেও কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতা অসাধারণ ছিল। কেশবচন্দ্র বালকদিগের শিক্ষার্থ এলবার্ট কলেজ স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ এলবার্ট হল প্রধানতঃ তাঁহারই যত্নে প্রতিষ্ঠিত।

এই সময় কেশবচন্দ্র বেলঘরিয়ার উদ্যানে 'ভারতাশ্রম' প্রতিষ্ঠিত করিয়া কতকগুলি পরিবারের সম্মিলনে আদর্শ-পরিবার সংগঠিত করিয়া উপাসনা, গ্রন্থপাঠ ও সৎপ্রসঙ্গাদিতে কালাতিপাত করিতেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই উদ্যানে আগমন করিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গে শুষ্ক কেশবচন্দ্রের হৃদয় ভক্তির পূতধারায় স্নিগ্ধ—তৃপ্ত করিলেন ; দিগ্বিজয়ী বক্তা কেশবচন্দ্র নীরবে রামকৃষ্ণ-মুখ-নির্গলিত উপদেশামৃতে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিলেন—ঈশ্বরের মায়িক ভাবের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যায় জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলন-মাধুর্য্য উপলব্ধি করিলেন। ইহার পর কেশবচন্দ্র বহুবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়া পরমহংসদেবের উপদেশ-সুধাপানে উপকৃত হইয়াছিলেন। একবার কেশবচন্দ্র সাতখানি নৌকায় খোল-করতাল ধ্বনিতে জাহ্নবী-বক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সদলবলে শিঙ্গা বাজাইয়া দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট আসিয়া, তাঁহাকে লইয়া সঙ্কীর্ত্তনানন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবের উপদেশে কেশবচন্দ্রের প্রাণে সুনির্ম্মল ভক্তিপ্রবাহিণী বহিতে লাগিল ; তিনি গভীর যোগসাধনে তন্ময় হইলেন ; আধ্যাত্মিক জীবনে নূতন সত্য লাভ:করিলেন। অতঃপর কেশবচন্দ্র বক্তৃতায়—সাধু অঘোরনাথ, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতিকে ভক্তি ও কর্ম্ম-সাধনের উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই সময়ের অবস্থার কথা তিনি 'জীবনবেদে' লিখিয়াছেন ঃ—"জীবনে প্রথমে ভক্তি ছিল না, প্রেমের ভাবও অধিক ছিল না, অল্প অনুরাগ ছিল। ছিল বিশ্বাস, ছিল বিবেক, ছিল বৈরাগ্য। * * ঈশ্বরপ্রসাদে অবশেষে আমার হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইল। ক্রমে ভক্তি প্রমত্ততায় পরিণত হইল। ভক্তি যখন বাড়িতে লাগিল, তখন বুঝিলাম, ভক্তিকে স্থায়ী করিবার জন্য যোগ আবশ্যক। * * ভক্তি ও যোগ উভয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল ; সাধনে প্রয়াস জন্মিল।" অতঃপর কেশবচন্দ্রে যেন এক ঐশী শক্তির সঞ্চার হইল—তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী উপদেশ শুনিবার জন্য শিক্ষিত যুবকদল ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র কলুটোলার বাড়ীর অংশ বিক্রয় করিয়া লোয়ার সারকুলার রোডে 'কমল-কুটীর' নির্ম্মাণ করিলেন ; প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতি প্রচারকগণ তথায় বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন, স্থানটির নাম "মঙ্গলপাড়া" হইল।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বহু বাদানুবাদের পর কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর সহিত কুচবিহারের মহারাজের বিবাহ হয়। কেশব-চন্দ্র পাত্রপাত্রীর বিবাহের বয়স নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন—কিন্তু এই বিবাহের পাত্রপাত্রী অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। বিশেষতঃ পাত্র ব্রাহ্ম ছিলেন না। কেশবচন্দ্র নিজে কন্যার বিবাহে নির্দ্ধারিত বিধি নিজেই ভঙ্গ করেন, এবং ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছেন, এই মত প্রকাশ করিয়া আত্মপক্ষসমর্থন করেন। এই বিবাহে বাল্য-বিবাহের অনুমোদন ও পৌত্তলিকতাচরণ প্রভৃতির জন্য তাঁহার সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার মত-বিরোধ হয়। ব্রাহ্মগণ ক্ষুণ্ণ হইয়া কেশবচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া দুটী স্বতন্ত্র দলে বিচ্ছিন্ন হন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস প্রভৃতি উৎসাহী ব্রাহ্মগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া 'সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজে'র প্রতিষ্ঠা করিয়া সোৎসাহে ধর্ম্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। উৎসাহের 'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত' কেশবচন্দ্র পরমভক্তসমাজে থাকিয়া প্রতাপচন্দ্র, সাধু অঘোরনাথ প্রভৃতি প্রচারকগণকে লইয়া ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ প্রবল উদ্যমে "নববিধান" নামক 'সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়' ধর্ম্মমতের প্রচার করেন। এই ধর্ম্মমত কতকটা বৈষ্ণবধর্ম্মমতের অনুগত। কেশব ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে "নববিধান সমাজ" নামে অভিহিত করেন। কেশবচন্দ্রের অনুরোধে প্রতাপচন্দ্র খৃষ্টীয় শাস্ত্র, গৌরগোবিন্দ হিন্দুশাস্ত্র, সাধু অঘোরনাথ বৌদ্ধশাস্ত্র, গিরিশচন্দ্র মুসলমানশাস্ত্র হইতে সত্য সঙ্কলন

করিয়া প্রচার করেন। ত্রৈলোক্যনাথ বহু ব্রাহ্ম-সঙ্গীতের রচনা ও প্রচার করেন। কেশবচন্দ্র হিন্দুশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মমতের সহিত সামঞ্জস্য করিবার প্রয়াস পান। কেশবচন্দ্র নববিধান-প্রচারের পর সর্ব্বধর্ম্মের, সর্ব্বশাস্ত্রের ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধুদিগের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। নববিধান-সমাজের প্রচারক-সভার নাম 'প্রেরিত দরবার' রাখেন, এবং প্রচারকগণের নামের পূর্ব্বে 'ভাই' শব্দ ব্যবহার করেন। নববিধানের বার্ষিক উৎসবের সময় বেদ, বাইবেল, কোরাণ, ললিতবিস্তার একত্র করিয়া তাহার উপর নববিধানের নিশান উড়াইয়া ধর্ম্মসমন্বয় ঘোষিত হইত। এই সময় তিনি "নব-বৃন্দাবন" নাটক রচনা করাইয়া সঙ্গী প্রচারকগণকে লইয়া অভিনয় করেন। পরে মস্তকমুণ্ডন করিয়া সোনার বালা ও নূপুর পরিয়া ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া মহাসঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ করেন।

প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেশবচন্দ্র আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্য টাউনহলে "আমি কি প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ নহি ?" নামে এক সুদীর্ঘ ইংরাজী বক্তৃতা দেন। তাঁহার অসামান্য বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া প্রতিপক্ষদল কোন প্রকাশ্য সভায় তাঁহাকে অভিযুক্ত করেন নাই।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র দুরারোগ্য বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হন। ইহার পর মাদ্রাজ, পঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা ও বাঙ্গালার নানাস্থানে প্রচারক-গণকে প্রচারার্থ পাঠাইয়া, পুত্রের উপর সংসারের ভার দিয়া, মস্তকমুণ্ডন ও গৈরিক ধারণ করিয়া ভিক্ষার ঝুলি গ্রহণ করেন ; "বিধান-ভারত" গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে "নববিধান" নামক ইংরাজী সংবাদপত্র, 'পরিচারিকা' ও 'বালক-বন্ধু' নামে মাসিকপত্র 'থিয়িষ্টিক কোয়াটারলি

রিভিউ’ সাময়িকপত্র প্রকাশ এবং ব্রহ্মবিদ্যালয় ও মহিলাগণের শিক্ষার জন্য ‘ভিক্টোরিয়া কলেজ’ স্থাপন করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মাঘোৎসবের সময় টাউন হলে তিনি যেন ঐশী শক্তিবলে উদ্দীপিত হইয়া “য়ুরোপের নিকট এশিয়ার নিবেদন” নামক প্রসিদ্ধ জ্ঞানভক্তিপূর্ণ বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃবন্ধনের পরিকল্পনাময় বক্তৃতা প্রদান করেন। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তাঁহার এক একটী বাক্যে সমবেত জনতরঙ্গ উদ্দীপিত—অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। টাউনহলে ইহাই তাঁহার শেষ বক্তৃতা। বক্তৃতা-বিশারদ কেশবচন্দ্রের অমৃতময়ী বক্তৃতার ঝঙ্কারে আর টাউনহল প্রকম্পিত হয় নাই, শ্রোতৃবৃন্দ আর পরিতৃপ্ত হইবার অবকাশ পান নাই। তাহার পর ভীষণ রোগের প্রকোপে তিনি হীনবল হইতে লাগিলেন,—চিকিৎসকগণের উপদেশে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা তিনি সূত্রধরের কার্য্য করিতেন। স্বাস্থ্যলাভের আশায় তিনি সিমলা-শৈলে গিয়াও নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তদবস্থায় তথায় বসিয়া তিনি “নব-সংহিতা” গ্রন্থখানির রচনা করেন, এবং আমেরিকার কোনও ভক্তের অনুরোধে “যোগ” প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান। অবশেষে উৎকট রোগের প্রকোপে কেশবচন্দ্র সিমলা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি কৃতবিদ্য সুচিকিৎসকগণের চিকিৎসাতে কোনও সুফল ফলিল না। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, লর্ড বিশপ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রায়ই কেশব-চন্দ্রকে দেখিতে আসিতেন। রোগযন্ত্রণায় অধীর হইয়াও কেশবচন্দ্র ভক্তগণকে নববিধানের মন্দিরনির্ম্মাণ সম্বন্ধে পরামর্শ দিতেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী, উৎকট বহুমূত্র রোগে, ৪৫ বৎসর বয়সে স্বনাম-ধন্য কৃতী মহাপুরুষ কেশবচন্দ্র লীলাসংবরণ করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করেন।

কর্ম্মবীর কেশবচন্দ্র অসাধারণ বাগ্মী, সুপুরুষ, বিনয়ী, মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার সহিত একবার আলাপে অন্যমতাবলম্বী ব্যক্তিও তদীয় আকর্ষণী-শক্তিতে আকৃষ্ট ও পুনঃ পুনঃ আলাপের জন্য ব্যাকুল হইতেন। নাটক অভিনয়ে কেশবচন্দ্রের অসামান্য নৈপুণ্য ছিল; বাল্যে "হ্যামলেট" নাটক—গোপাললাল শীলের বাড়ীতে বিধবা-বিবাহ নাটক, শেষজীবনে 'নব-বৃন্দাবন' নাটকে ঋষিবেশে সজ্জিত হইয়া পাহাড়ী বাবার ভূমিকায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রই ব্রাহ্ম-সমাজে সঙ্কীর্ত্তন-প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন; সে সঙ্কীর্ত্তনানন্দে ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া হিন্দু ভক্তগণও ভক্তিরসে ভাবোচ্ছ্বাসে আপ্লুত হইয়া অশ্রুপাত করিত; সহস্রকণ্ঠোত্থিত হরিধ্বনিতে পল্লী মুখরিত হইত। ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বাগ্মিতায় কেশবচন্দ্র সমশক্তিমান্ ছিলেন। কেশবচন্দ্র ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বহুগ্রন্থ ও পুস্তিকা রচনা করিয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর ভিতর জীবন-বেদ, নবসংহিতা, দৈনিক প্রার্থনা, আচার্য্যের উপদেশ, প্রার্থনা, ব্রহ্মগীতোপনিষৎ, মাঘোৎসব, উপদেশ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সকল গ্রন্থ-পাঠে সত্যানুরাগী ধর্ম্মপিপাসু মানব উপকৃত হইবেন।

শক্তিমান্ কেশবচন্দ্র শেষ-জীবনে ভক্তি ও মুক্তির ভিখারী হইয়া ধর্ম্ম-সমন্বয়ের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের নিভৃতমর্ম্মে ভক্তির উৎস উৎসারিত হইয়াছিল; জ্ঞান ও ভক্তির অমৃত-প্লাবনে সহস্র সহস্র নরনারীর শুষ্কহৃদয়ে ভক্তি-উচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইয়াছিল। একেশ্বরবাদ-প্রচার, সৌভ্রাতৃ-প্রেমবন্ধন, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব, মহিলাগণের সুশিক্ষা-বিধান, দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য প্রবল প্রয়াস, বাল্যবিবাহ ও

বহুবিবাহের নিবারণ, বাঙ্গালা ভাষায় ব্রাহ্ম-উপাসনাপ্রণালীর সঙ্কলন, ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্রোন্নতি, ধর্ম্মসমন্বয়ের উদ্যম—কেশবচন্দ্রকে ভারতবাসীর স্মৃতিতে যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর অমর করিয়া রাখিবে।

কেশবচন্দ্রের বিয়োগে শোকপ্রকাশ করিয়া "বঙ্গবাসী" লিখিয়াছিলেন ঃ—"নির্ম্মল নীল গগনে সহসা বজ্রাঘাত হইল। আজ সুমেরু-শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল ; আকাশ হইতে চন্দ্র খসিল—কেশবচন্দ্র আর ইহ-জগতে নাই। মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে নিমতলার শ্মশানে যাহা পুড়িয়াছে, কত কাল হইল, ভারতের কোন শ্মশানে তাহা পুড়ে নাই। * *

"কেশবমূর্ত্তি সম্মুখে নাই বটে, কিন্তু কেশবের অন্তরাত্মা চিরদিন মানব কুলের অন্তরে বিরাজ করিবে। সেই মনোমোহন মূর্ত্তি, সেই মধুর কথা, সেই তেজস্বিনী বাগ্মিতা, সেই মধুর মুখে হরিনামকীর্ত্তন কে ভুলিবে ? যিনি ব্রাহ্মসমাজের বীজ, জাতীয় জীবনের উৎস, যাহার বাগ্মিতায় ইউরোপ মুগ্ধ, ব্রাইট্, গ্লাডষ্টোন চমকিত, এমন মহাপুরুষের নাম কেন না চিরস্মরণীয় হইবে ? কেশব সুলভ সংবাদপত্রের উদ্ভাবক, কেশব সাধারণ শিক্ষার প্রবর্ত্তক, কেশব বহুবিবাহের শত্রু, উনবিংশ শতাব্দীর মহাযোগী, ইউরোপ-আমেরিকায় উপাসিত, এই ভারতের মুকুটমণি কেশবকে কে বিস্মৃত হইবে ? "আজ কমল-কুটীরের মধ্যাহ্নসূর্য্য অকালে অস্ত গেল, টাউনহল বক্তাশূন্য হইল, বীডন্ পার্ক আঁধার হইল ; ব্রাহ্ম-মন্দিরের বেদী আচার্য্যহীন হইল। এ শূন্য কে পূরণ করিবে ? লর্ড লরেন্স যাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন, লর্ড রিপণ যাঁহার কথা মান্য করিতেন, হোলকার সিন্ধিয়া যাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন, সেই মহাপুরুষের মহাপদ আজ কে পূরণ করিবে ?"

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

১২৪৮ সালে ১৯শে শ্রাবণ, ঝুলন-পূর্ণিমার দিন, অদ্বৈতাচার্য্যের বংশ-সম্ভূত মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নদীয়া দহকুল গ্রামে, মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বিজয়কৃষ্ণের পিতা আনন্দকিশোর গোস্বামী শাস্ত্রজ্ঞানী, ধর্ম্মনিষ্ঠ, গুরুব্যবসায়ী পরম ভগবদ্ভক্ত ছিলেন; শান্তিপুর হইতে দণ্ডী দিতে দিতে শ্রীক্ষেত্রধামে গিয়াছিলেন; বক্ষে ক্ষত হইয়াছিল, ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। ভাগবত পাঠ করিতে করিতে তিনি ভাবে তন্ময় হইয়া 'ভাবস্থ' হইতেন—গলায় সর্ব্বদা শালগ্রামশিলা ধারণ করিতেন। বিজয়কৃষ্ণের জননী স্বর্ণময়ী দেবী জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দয়া ও সেবা, ঈশ্বরভক্তি ও উদারতার জন্য আবালবৃদ্ধবনিতার ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মৃত জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুরোধক্রমে আনন্দকিশোর শিশু বিজয়কৃষ্ণকে তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃবধূকে দত্তক প্রদান করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে বিজয়কৃষ্ণের পিতৃবিয়োগ ও পালিকা মাতার লোকান্তর হয়। বিজয়কৃষ্ণের জননী শিষ্যবাড়ী ঘুরিয়া বৃত্তি সংগ্রহ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ, দরিদ্রসেবা ও সন্তানপালন করিতে লাগিলেন। বাল্যে বিজয়কৃষ্ণ নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ, চঞ্চল ও একগুঁয়ে ছিলেন—এই একগুঁয়েমীই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বাধীনচিন্তার উন্মেষক।

কিশোরে বিজয়কৃষ্ণ বড় পরদুঃখকাতর ছিলেন—জমিদার শিষ্যের দরিদ্র-পীড়ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন।

অল্পদিনে পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরে গোবিন্দ গোস্বামীর টোলে প্রবেশ করেন। পাঠশালায় ও টোলে তিনি সর্ব্বপ্রথম ছাত্র ছিলেন। স্বল্পদিনেই অসাধারণ মেধাশক্তির বলে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত করেন। উপনয়ন ও দীক্ষা-গ্রহণের পর তিনি হিন্দুধর্ম্ম অনুষ্ঠানে নিষ্ঠাবান্ হন, প্রত্যহ ভক্তিবিহ্বলচিত্তে সন্ধ্যা-অর্চ্চনা করিতেন—আবশ্যকমত শিষ্যবাড়ী গিয়া মন্ত্র দিতেন। টোলে অধ্যয়নের সময় তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। তাঁহার স্বভাবে যৌবন-চাপল্য প্রকটিত না হইয়া শিশুর সারল্য, পরোপকারস্পৃহা, সত্যানুরাগ বিকশিত হইয়াছিল। শান্তিপুরে মদ্যপান-দলন, অন্যায়-নিবারণ, চরিত্র-গঠন ও নৈতিক উন্নতির জন্য তিনি ও তাঁহার বাল্যবন্ধু সাধু অঘোরনাথ একটি যুবক-সমিতি সংগঠিত করেন।

১২৬৬ সালে, বিজয়কৃষ্ণ সহপাঠী অঘোরনাথের সহিত কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই সময়ে নানা আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গে কলিকাতা সংক্ষুব্ধ হইতেছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন ঃ—"বিধবা-বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোম-প্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বর গুপ্তের তিরোভাব, এবং মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা বঙ্গ-সমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল।" এই সকল আন্দোলনে স্বস্ত্রস্ত কলিকাতায় শিখা-সূত্র-তিলক-চন্দন-মালাধারী শান্তিপুরের

গোস্বামী শিশু-সম-সরল বিজয়কৃষ্ণ সংস্কৃত-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে তীব্র বিদ্রূপবাণে বিব্রত হইতেন! "বীরপূজা" প্রবন্ধে বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—"সংস্কৃত কলেজের ঘোর নাস্তিকতার সময় আমরা পাঁচ বন্ধু 'ভাগবত' বলিয়া উপহসিত হইতাম। সেই ঠাট্টা-বিদ্রূপের মধ্য দিয়া আমাদের ভগবদ্ভক্তি দিন দিন উপচিত হইতে লাগিল।" শিক্ষিত সমাজে এই সময় সুরাস্রোত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত ছিল। বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সংস্কার তাঁহাকে পানদোষ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তিনি আত্মবিবরণে লিখিয়াছেন ঃ—"আমি অদ্বৈতবংশের গোস্বামী, আমি সুরাপান করিলে আমার নির্ম্মল পিতৃকুল কলঙ্কিত হইবে; কেবল এই সংস্কার অনেক সময় আমাকে কুসংস্কার-নরক হইতে রক্ষা করিয়াছে।" কিন্তু সঙ্গিগণের বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মভাব তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠার ও অটল ধর্ম্মবিশ্বাসে অনাস্থা জন্মাইয়াছিল। তিনি সাঁতরা-গাছি হইতে হাঁটিয়া প্রত্যহ সংস্কৃত কলেজে আসিতেন। তখনও হাবড়ার পোল নির্ম্মিত হয় নাই—প্রবল ঝড়-বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া পার হইয়া কলেজে যাইতেন। এই সময় রামচন্দ্র ভাদুড়ীর ছয় বৎসরের কন্যা যোগমায়া দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সাধ্বী যোগমায়া দেবী সহধর্ম্মিণীরূপে আজীবন স্বামীর ধর্ম্মসাধনায় সহায়তা করিয়াছিলেন। গুণবতী পত্নীর চরিত্র মহনীয় বরণীয় করিবার জন্য বিজয়কৃষ্ণ সর্ব্বদা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন—সামান্য ত্রুটী দেখিলেও সংশোধনের প্রয়াস পাইতেন। বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায়ের নিকট তিনি স্ত্রীকে শিক্ষিতা করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে পাঠকালে হিন্দুশাস্ত্রের অধ্যয়নে তাঁহার প্রবল অনুরাগ জন্মে। তিনি বেদান্তচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া ঘোরতর বৈদান্তিক

অদ্বৈতবাদী হন—ইষ্টদেব পূজায় তাঁহার স্পৃহা কমিয়া যায়। এই সময় কৌলিক গুরুগিরি রক্ষা করিবার জন্য তিনি বগুড়ায় কোনও শিষ্যের বাড়ী যান; তথায় এক বৃদ্ধা শিষ্যার মুখে মুক্তিলাভের আশায় ভক্তিপূর্ণ কাতোরক্তি শ্রবণে তাঁহার আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মমত আরও বিচলিত হয়।

বগুড়া হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি দেখিলেন, কোনও বন্ধু তাঁহার বাক্স হইতে টাকা-পয়সা সমস্তই লইয়া পলাইয়াছে। তিনি বাসায় নগদ পয়সা দিয়া আহার করিতেন। আহার করিলেই পয়সা দিতে হইবে ভাবিয়া তিনি কয়দিন গোলদিঘীর জল খাইয়া কলেজের বারান্দায় শুইয়া থাকিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সম্ভ্রান্তগণের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়া তিনি প্রত্যাখ্যাত হন। কোনও ভদ্রলোকের দয়ায় একটি সিকি পাইয়া খাবারের দোকানে ঢুকিতেছেন, এমন সময় সেই সর্ব্বস্বাপহারক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ! বন্ধুটী সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া পড়িতেছিলেন; পরে দোষস্বীকার করিয়া বলিলেন, 'জুয়া খেলিয়া সব উড়াইয়াছি, আজ কয়দিন খাওয়া হয় নাই।' বিজয়কৃষ্ণ সাদরে তাঁহাকে জলযোগ করাইলেন। বন্ধুত্ব নষ্ট হইবার আশঙ্কায় কোনও বন্ধুগৃহে না গিয়া বিজয়কৃষ্ণ বহু চেষ্টায় কোনও ভদ্রলোকের গৃহে আশ্রয় পান। এই ভদ্রলোকের পানাসক্তি দোষ ছিল—তিনি বিজয়কৃষ্ণকে সুরাপান করাইবার জন্য বারংবার প্রয়াস পান; কিন্তু চির-অভ্যস্ত সংস্কার বিজয়কৃষ্ণকে রক্ষা করিয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজের নানাবিধ নিন্দা শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণের ভ্রান্তধারণা ছিল, কিন্তু নানা প্রতিকূল ঘটনায় ক্রমাগত বিরক্ত হইয়া এবং বগুড়ার ব্রাহ্মবন্ধুগণের অনুরোধে সহসা এক বুধবারে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইলেন। দীপাবলীতেজে সমুজ্জ্বল ব্রাহ্মসমাজের ভক্তি-উচ্ছ্বসিত

সুমধুর সঙ্গীত ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সৌম্যমূর্ত্তি ও "পাপীর দুর্দ্দশায় ঈশ্বরের বিশেষ করুণা" সম্বন্ধে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা তাঁহাকে আকৃষ্ট ও ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই সময় হিমালয় হইতে সাধন করিয়া সত্যলাভ করিয়া ফিরিয়াছেন, জ্বলন্তভাষায় বক্তৃতা করিয়া ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তি ও নবীন উৎসাহের সঞ্চার করিতেছিলেন। মহর্ষির উপদেশামৃতে, বিজয়কৃষ্ণের স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরাগ, যাহা বেদান্তের শুষ্ক তর্কে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহা সঞ্জীবিত ও উদ্দীপিত হইল। তিনি লিখিয়াছেন,—"এই বক্তৃতা-শ্রবণে আমার পূর্ব্বকার ভক্তিভাব স্মৃতিপথে উদিত হইল; চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিয়া অন্তরে দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা করিলাম যে, দয়াময় ঈশ্বর, প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে আমার বিশ্বাস হয় না, অন্য কোন ধর্ম্মেও আমার বিশ্বাস নাই, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আমার মত হতভাগ্য বোধ হয়, পৃথিবীতে আর কেহ নাই। যখন হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল, তখন ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিতাম, এখন তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি। এইমাত্র শুনিলাম, তুমি অনাথের নাথ। প্রভো, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম।" এইরূপ কাতর প্রার্থনায় তিনি শান্তিলাভ করিয়া মনে মনে দেবেন্দ্র-নাথকে গুরু স্বীকার করিলেন; বন্ধুগণের সহিত নিয়মিতভাবে সমাজের ব্রাহ্মউপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতিদিন গৃহেও নির্জ্জনে প্রার্থনা করিতেন। হৃদয়ে যখন যে সত্য উপলব্ধি হইত, আত্মজীবনে সেই সত্যসাধন করিতেন, এবং ঐ সকল সত্য সংগ্রহ করিয়া 'ধর্ম্মশিক্ষা' পুস্তিকা বিনামূল্যে প্রচার ও গ্রন্থস্বত্ব ব্রাহ্মসমাজকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি বগুড়া হইয়া, শান্তিপুরে গিয়া, 'জাতিভেদ মানিলে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া স্বীকার করা যায় না', ব্যাখ্যাকালে কোনও বালকের কথায় বিচলিত হইয়া উপবীত পরিত্যাগ করেন। পরে মাতার কাতর অনুরোধে পুনরায় উপবীত গ্রহণ করেন। অতঃপর শিষ্যগণের বৃত্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না ভাবিয়া তিনি পরসেবায় ব্রতী হইবার জন্য সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা বিভাগে প্রবিষ্ট হইলেন। এই সময় তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত সুপরিচিত হইয়া বন্ধু অঘোরনাথের সঙ্গে ১২৬৮ সালে তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা-গ্রহণ করিলেন। উপবীত-গ্রহণের জন্য তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন,—"প্রতিদিন প্রার্থনার সময় আমার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল * * উপবীত যেন কালভুজঙ্গের ন্যায় আমায় দংশন করিতে লাগিল। উপবীত রাখা অসত্য ব্যবহার, অসত্য ব্যবহার করিলে ঈশ্বরদর্শন হইবে না, এই ভয়ে আমার প্রাণ অস্থির হইত।" তিনি মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "উপবীত রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য, উপবীত না রাখিলে সমাজের অনিষ্ট হয়। এই দেখ, আমি উপবীত রাখিয়াছি। * * মৎস্য মাংস না খাইলে শরীররক্ষা হয় না।"

বিজয়কৃষ্ণ মেডিকেল কলেজের ছাত্র-সম্মিলনে 'হিতসঞ্চারিণী' সভার সভ্য ছিলেন। সভায় আলোচনায় সিদ্ধান্ত হইল, যাহা সত্য বুঝিব, তাহা পালন না করা কপটতা ও মহাপাপ। ১২৬৯ সালের এই আলোচনার দিনেই বিজয়কৃষ্ণ কপটতার চিহ্ন মনে করিয়া উপবীত ত্যাগ করিলেন; মাকেও পত্র লিখিয়া সে সংবাদ পাঠাইলেন। ছাত্রগণমধ্যে, ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ে সম্বন্ধে আন্দোলনের তুমুল তরঙ্গ উঠিল। তখন ব্রাহ্মগণও জাতিভেদ

স্বীকার করিতেন না বটে, কিন্তু জাতিভেদের চিহ্ন উপবীত-ধারণ সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিতও বিজয়কৃষ্ণের মতবিরোধ হইল। বিজয়কৃষ্ণ সত্যনিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হইয়া সত্য-সঙ্কল্পিত সাধনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জাতিভেদ সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণ এ সময় সংস্কারশূন্য হইয়াছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন ;— "এক জন ঝিকে ভাত নিয়া আসিতে দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম ; বলিলাম এ কি ? বামনের জাত মারলে ? তিনি বলিলেন, ও কি ? জাত্‌টাত্‌ আবার কি ? ও সব কিছু নয়।"

বিজয়কৃষ্ণের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল ; মেডিকেল কলেজের শিক্ষকোপদিষ্ট বিষয় তাঁহাকে পরিশ্রম করিয়া আয়ত্ত করিতে হইত না। অধ্যয়নের শেষ বর্ষে বিজয়কৃষ্ণের নেতৃত্বে ছাত্রগণের সহিত মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষের বিবাদ হয়। গোলদিঘীতে বক্তৃতা করিয়া অন্যায়দ্বেষী বিজয়কৃষ্ণ ছাত্রগণকে লইয়া একযোগে কলেজ পরিত্যাগ করেন। পরে দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার দ্বারা ছোট লাট লর্ড বীডনকে জানাইয়া ছাত্রগণের নির্দোষিতা সপ্রমাণ করেন। কর্তৃপক্ষ ছাত্রগণকে আবার কলেজে গ্রহণ করেন, এবং বিজয়কৃষ্ণের পরামর্শমত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কার-প্রস্তাবে মেডিকেল কলেজের উন্নতি-বিধান হয়—বাঙ্গলা বিভাগ ক্যাম্বেল স্কুলে পরিণত হয়।

বিজয়কৃষ্ণ এই সময় মেডিকেল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া পথে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনিই এই ভাবের প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক। তিনি অপরাহ্নে প্রেসিডেন্সী কলেজের

সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভক্তি-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রাণস্পর্শিভাবে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। 'ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান' পুস্তিকা-পাঠে সঙ্গত-সভা উপবীত-বিরোধী জানিয়া তিনি সভায় যোগদান করেন; বাগ্মিবর কেশবচন্দ্রের সহিত সুপরিচিত হইয়া সৌভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হন। সঙ্গত-সভায় আলোচনায়—ধ্যানে তন্ময় হইয়া এক এক দিন রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। সভার অনুষ্ঠিত সত্য-সমূহ তিনি আত্মজীবনে সাধন করিতে লাগিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"সঙ্গতেই অধিকাংশ ব্রাহ্ম-ভ্রাতার সহিত পরিচিত হই। ব্রাহ্ম-ভ্রাতাদের সহবাসে কি অসীম আনন্দভোগ করিতাম! * প্রত্যেক ব্রাহ্মভ্রাতাকেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া বোধ হইত। তাঁহাদের মুখ-নিঃসৃত সামান্য উপদেশও বহুমূল্য বোধ হইত।"

অতঃপর তিনি শান্তিপুরে গমন করেন। মাতার কাতর অনুরোধেও তিনি উপবীত গ্রহণ করিয়া সংস্কারের বশীভূত হইলেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেশিগণের উত্তেজনায় তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। বিজয়-কৃষ্ণ গ্রামে থাকিলে গ্রামের যুবকদের ব্রাহ্ম হইবার আশঙ্কা করিয়া গোস্বামিগণের পরামর্শে প্রতিবেশিগণ তাঁহাকে রাস্তায় গালি দিত, থুথু ও ইট বৃষ্টি করিত—পাগল বলিয়া উপহাস করিত। নিন্দা, তিরস্কার, লাঞ্ছনা, অঙ্গের ভূষণ করিয়া—সত্যই অবশেষে জয়যুক্ত হইবে এই অটল বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া, বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন। আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তিনি ভগ্নীপতি কিশোরীচন্দ্র মৈত্রেয়ের সহিত কলিকাতায় আসিলেন। ভগ্নী, ভগ্নীপতি, তাঁহার স্ত্রী প্রভৃতি সকলে মিলিয়া কলিকাতার বাসায় ভক্তি ও একাগ্রতার সহিত প্রত্যহ পারিবারিক উপাসনা করিতে লাগিলেন।

সপরিবারে কলিকাতায় বাস করিয়া বিজয়কৃষ্ণ প্রবল উদ্যমে প্রাণপণে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ও ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিলেন। "এক দিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বহুদর্শন, প্রগাঢ় ধ্যানপরায়ণতা, সংস্কৃতে—ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, গাম্ভীর্য্য, ধীরতা প্রভৃতি মহদ্‌গুণ; অপর দিকে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সাহস, পরাক্রম, নির্ভীকতা, সুমার্জ্জিত বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, বাগ্মিতা, কার্য্যতৎপরতা, জীবন্ত প্রার্থনা, এবং বিজয়কৃষ্ণের ও তাঁহার সহযোগিগণের ধর্ম্মানুরাগ, ব্যাকুলতা, সংস্কার-প্রিয়তা, জীবনপ্রদ উদ্যম, উৎসাহ প্রভৃতি একত্র সম্মিলিত হইয়া একটি প্রভূত শক্তি উৎপন্ন করিল।" ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন-স্রোতে অনুপ্রাণিত হইয়া "নানা দেশবিদেশের লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল; কিন্তু তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দেন, এরূপ লোকের নিতান্ত অভাব।" এই কথা শুনিয়া বিজয়কৃষ্ণ প্রচার-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের পরামর্শে প্রচারক হইবার জন্য রীতিমত পরীক্ষা দিয়া এবং সমস্ত তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা অধ্যয়ন করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নির্দ্দেশমত 'ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের একমাত্র উপায়' জ্ঞান করিয়া বিজয়কৃষ্ণ পরহিতার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারে আত্মোৎসর্গ করিলেন। তিনি কোন্নগর, নেবুতলা, রামকৃষ্ণপুর, শ্রীরামপুর, শান্তিপুর, বাগআঁচড়া, বর্দ্ধমান, চেত্‌লা, কুমারখালি, শিলাইদহ, প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া "অগ্নিময় উৎসাহ, পবিত্র-জীবন, হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা-শক্তিতে অনেক লোকের মন পরিবর্ত্তিত করিয়া" ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন, তাঁহার উদ্যোগে স্থানে

স্থানে বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিজয়কৃষ্ণকে উপাচার্য্যের পদে ব্রতী করেন, এবং উপাচার্য্যের বৃত্তি-নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা করিলে, বিজয়কৃষ্ণ অর্থের বিনিময়ে ধর্ম্মবিক্রয় প্রভৃতি কারণ দর্শাইয়া সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

১২৭১ সালের ২০শে আশ্বিন প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে কলিকাতায় মহাপ্রলয় ঘটে—বৃক্ষগৃহাদি নিপতিত হয়, জলময় রাজপথে নৌকা চলে, অগণন মৃতদেহ ভাসিয়া যায়, সেই ভীষণ দুর্য্যোগের দিনে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বিজয়কৃষ্ণ সাঁতার দিয়া উপাসনা-মন্দিরে গিয়া একাকী ব্রহ্ম উপাসনা করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি নবীন ব্রাহ্মগণের উপবীতত্যাগী না হইলে কেহ উপাচার্য্য হইতে পারিবেন না, এবং জাতিভেদ প্রথা তুলিয়া দিয়া অসবর্ণ-বিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলন প্রভৃতি প্রস্তাব করিলে নবীন ও প্রাচীন ব্রাহ্মগণের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ হয়। কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি আদি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত করেন, এবং ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হন। এই প্রচার-কার্য্যে বিজয়কৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিবৃত্তে প্রকাশ,—"জ্বলন্ত প্রাণ লইয়া, ভগবৎকৃপা সহায় করিয়া, বিজয়কৃষ্ণ প্রচার-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বর্ষাতরঙ্গে উচ্ছ্বসিত গিরি-তরঙ্গিণী যেমন প্রবলবেগে উভয় কূল ভাসাইয়া লইয়া যায়, মহোৎসাহে সমুচ্ছ্বসিতপ্রাণ বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মনামে সেইরূপ দেশ-দেশান্তর ভাসাইয়া লইয়া চলিলেন। * তাঁহার উৎসাহপূর্ণ, প্রেমোদ্দীপ্ত, একত্বময়, জীবন্ত প্রাণের মহাপ্রচার দর্শন করিয়া লোকে মুগ্ধ হইল; তাঁহার অনলবর্ষী, মর্ম্মস্পর্শী, অমৃতোপম মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া

সকলের প্রাণ জাগ্রত ও মন শীতল হইল।" পূর্ব্ববাঙ্গালার প্রচার-ভার গ্রহণ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, শিবসাগর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, চন্দ্রনাথ, ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শ্রীহট্ট, কাছাড়, আসাম, বগুড়া, রংপুর, কুচবেহার প্রভৃতি নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। প্রচারকার্য্যে বিজয়কৃষ্ণ প্রাণপণ উদ্যমে, বহুপরিশ্রমে স্থানে স্থানে বহুদুর পদব্রজে গিয়া আপনা ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া, অনশন অর্দ্ধাশনে, কখনও শাকসিদ্ধ বা কর্দ্দমাক্ত জলমাত্র পান করিয়া, মহা অর্থাভাব, অনাটন অগ্রাহ্য করিয়া ব্রহ্মনাম-কীর্ত্তনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার হৃদয়োন্মাদিনী মর্ম্মস্পর্শী বাগ্মিতায়—ভক্তি-উচ্ছ্বসিত উপদেশামৃতে—গাম্ভীর্য্যপূর্ণ-সৌম্যভাবে মুগ্ধ হইয়া বহু ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন; নানাস্থানে সঙ্গত-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়; বহু পরিবর্ত্তন ও সংস্কার-সাধন হয়। সত্য-প্রচারের জন্য তিনি লাঞ্ছনা, অপমান, উৎপীড়ন গ্রাহ্য করিতেন না; নানা বিপদের সম্মুখীন হইয়াও বিচলিত হইতেন না। চট্ট-গ্রামের জঙ্গলে বন্য-মহিষের আক্রমণ, খরস্রোতা পদ্মার ঘূর্ণাবর্ত্তে নিমজ্জন, ব্যাঘানের বাঘের দৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া শিবসাগর ও আসামের পথে কেবল কর্দ্দমাক্ত জলপানে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াও, পারিবারিক অনশন অর্দ্ধাশন, সস্ত্রীক ঔষধ ও পথ্যাভাবে রোগে কষ্ট পাইয়াও তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের প্রবল উৎসাহ বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। বরিশালে দুর্গামোহন দাস ও গোস্বামী মহাশয়ের চেষ্টায় কয়েকটি বেশ্যার ও বিধবার বিবাহ হয়, কুলীন-কুমারীর বৃদ্ধস্বামী বিবাহ বন্ধ হয়। ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে অর্থগ্রহণ সঙ্গত নয় বোধে ব্রাহ্মসমাজের মাসিক-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া পৈতৃক সাতশত ঘর শিষ্যের বৃত্তি-ত্যাগী বিজয়কৃষ্ণ ধর্ম্ম-প্রচার ও পরিবার-প্রতিপালনের জন্য মাত্র আট আনা দর্শনী লইয়া কিছুদিন ঢাকায়

চিকিৎসা-ব্যবসায় করিয়াছিলেন। চিকিৎসায় প্রতিষ্ঠালাভ হইতেছে দেখিয়া—প্রাণসম ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারে অন্তরায় হইতে দেখিয়া এবং দারিদ্রের কশাঘাত সহ্য করা প্রচারকের কর্ত্তব্য বিবেচনায়, তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। দরিদ্রগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা করা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। নিজে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে গাত্রবস্ত্র এবং অনাহারে থাকিয়া কষ্টলব্ধ আহার্য্য দান করিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ করিতেন। শান্তিপুরে অসুস্থ-শরীরে সঙ্কটাপন্ন রোগীর চিকিৎসার জন্য সন্তরণ করিয়া গঙ্গা পার হইয়া গিয়া চিকিৎসা করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের হৃদয়-উন্মাদিনী, উদ্দীপনাপূর্ণ, ভক্তিপ্রবাহিণী বক্তৃতামালার মধ্যে বরিশালের 'উপাসনা,' 'মনুষ্যজীবন,' 'ব্রাহ্মধর্ম্ম কি,' 'বিশ্বাস,' 'প্রীতি,' 'আত্মদৃষ্টি,' 'পরকাল,' 'ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য,' 'মনুষ্যের কর্ত্তব্য,' ঢাকায় 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ,' 'উপাসনা,' 'মুক্তি,' 'পতিব্রতা,' 'সংসার,' 'পৌত্তলিকতা,' 'পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ,' 'পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ,' রংপুরের 'উপাসনা ও উপাসনাতত্ত্ব,' কাঁকিনার 'জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সত্যতার সামঞ্জস্য,' ঢাকায় 'আমার জীবনের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত,' 'ব্রাহ্মসমাজে মতভেদ আন্দোলন,' 'পরকাল,' 'ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধানে প্রভেদ' প্রভৃতি বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্ববাঙ্গালায় ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের পরে কলিকাতায় ফিরিয়া বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি আন্দোলনে নবীন ও প্রবীণ ব্রাহ্মগণের মতবিরোধে সৌভ্রাতৃবন্ধন ছিন্ন হইবার আশঙ্কায় বিজয়কৃষ্ণ কিছুদিন শান্তিপুরে বাস করেন। এই সময় ভক্তিতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তিনি শান্তিপুরের ভক্তবৈষ্ণব হরিমোহন প্রামাণিকের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং নবদ্বীপের চৈতন্যদাস বাবাজীর নিকট প্রেমভক্তিলাভের জন্য দীন-হীন অকিঞ্চন হইবার উপদেশলাভে তৃপ্ত হন। ইহার পর তিনি 'ভক্তি ও প্রেম

বিনা ব্রহ্মসমাজের কল্যাণ নাই' সিদ্ধান্ত করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে সমস্ত দিন উপবাস করিয়া ধ্যান, ধারণা, আবাধনা ও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

বিজয়কৃষ্ণের .অগ্রজ ব্রজগোপাল গোস্বামীর কীর্ত্তনে প্রেমভক্তি উচ্ছ্বসিত হইতে দেখিয়া কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে সংকীর্ত্তন-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। কেশবচন্দ্র এই সময় শ্রীবামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশমত প্রেমভক্তিতত্ত্ব ও বৈরাগ্য লাভ কবিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হন, এবং 'ভাবত-আশ্রম' উদ্যানে ধার্ম্মিক পরিবারবর্গেব সম্মিলন করিয়া সাধু অঘোবনাথকে যোগ-সাধন ও বিজয়কৃষ্ণকে সংযমী হইয়া ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত কবেন। পরে বহু ক্লেশ-স্বীকাব করিয়া গোস্বামী মহাশয় কেশবচন্দ্রের সহিত লক্ষ্ণৌ, দেরাদুন, বেরিলি, সাজাহানপুর, সাহরাণপুর লাহোব, অমৃতসব, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ, জব্বলপুব প্রভৃতি স্থানে গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন।

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় প্রচাব করিয়া বিজয়কৃষ্ণ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গমন করেন। মুঙ্গেবে 'ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা', বৃন্দাবনে 'চৈতন্য ও পবিত্রতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা কবিয়া বৈষ্ণবগণকে তিনি মুগ্ধ করেন। পরে লক্ষ্ণৌ, মথুরা, আগ্রা, লাহোর প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা, উপাসনা ও আলোচনায় লোকের মন ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত করেন। মুঙ্গেরে অবস্থানকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যার শোকপ্রশমনের জন্য 'শোকোপহার' নামে কবিতা-পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রচার করেন। আগ্রায় তাজমহলের শোভাসন্দর্শনে তিনি পুলকিত হন। পরে কুষ্টিয়া ও কুমারখালী ঘুরিয়া ঢাকায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য মনোনীত হন। তৎপরে পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আচার্য্য কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহের বিরুদ্ধ আন্দোলনের সময় বিজয়কৃষ্ণ বাগ-আচড়ার নির্জ্জন আশ্রমে বিশেষ সাধনভজনে নিমগ্ন ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় আসিয়া কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধ আন্দোলনে যোগদান করিয়া বলিলেন, "কেশববাবু আমার মহর্ষি, কর্ত্তা বা পালনকর্ত্তা নহেন; কেশববাবুকে দেখিয়া আমি ব্রাহ্মসমাজে আসি নাই; সত্যের অবমাননা আমি কখনই সহ্য করিতে পারিব না।" নানা বিরুদ্ধ আন্দোলনের পর এই বিবাহ সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মসমাজ দুইটি স্বতন্ত্র দলে বিচ্ছিন্ন হয়। ১২৮৫ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা টাউনহলে সভার অধিবেশন করিয়া বিজয়কৃষ্ণের প্রস্তাবে, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়কৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও প্রচারক নিযুক্ত হইয়া সমাজ-পরিচালনে, তাহার উন্নতিবিধানে, উহার প্রচারব্রতে আত্ম-নিবেদন করিলেন ও তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতে উপদেশ সঙ্কলন করিয়া উহা বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে আবার পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় গিয়া গীতা, পুরাণ, উপনিষদ ও তন্ত্রাদি হইতে নানা বিষয় সঙ্কলিত করিয়া দেশবাসিগণকে মুগ্ধ করিলেন। ঢাকায় রবি-বাসরীয় বিদ্যালয় ও ব্রাহ্ম-সম্মিলনী সভা এবং ব্রাহ্ম-দরিদ্র-পরিবার ফণ্ড প্রতিষ্ঠা তিনিই করেন, এবং ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় গিয়া 'প্রহ্লাদের ভক্তিবিশ্বাস অবলম্বন' —'কুমিল্লায় গিয়া ধ্রুবের নীতি অবলম্বন' এবং মহেশপুর, নবদ্বীপ, সিরাজগঞ্জ, বহরমপুর, জলপাইগুড়ি, রামপুর, বাগ-আচড়া প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মোৎসবে গমন করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া যে সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা 'ব্রাহ্মপূজা' নামে পুস্তিকারূপে প্রচার করিয়া নানাস্থানে বিতরণ করেন। ১২৮৭ সালে বিজয়কৃষ্ণ আবার পশ্চিম-বঙ্গে আসিয়া কোন্নগর, হরিনাভি হইতে আরম্ভ করিয়া হাজারিবাগ, গয়া,

বাঁকীপুর, মজঃফরপুর, মতিহারী, যমুলিয়া, গাজিপুর, জামালপুর ও বোয়ালিয়া প্রভৃতি স্থানে গিয়া হিন্দুশাস্ত্র হইতে সারসংকলন পূর্ব্বক বক্তৃতা দ্বারা লোককে আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত করেন। গাজিপুরে ভক্তিজিজ্ঞাসু হইয়া তিনি যোগসাধনমগ্ন পাহাড়ী বাবার দর্শন ও উপদেশ লাভ করেন।

বিজয়কৃষ্ণ বলিতেন—"আমি হিন্দু-সমাজ চাই না, ব্রাহ্ম-সমাজ চাই না, খৃষ্টান-সমাজও চাই না। আমি কোন দলাদলি চাই না, কেবল চাই—সেই প্রাণের দেবতাকে।" অতঃপর তত্ত্বনির্ণয়ে উন্মত্ত হইয়া তিনি বহু ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু, যোগী, সন্ন্যাসী, সাধক, উদাসীন, বৈষ্ণব ও সাধকগণের সহিত সম্মিলিত হন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতানুসারে বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন—প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় যোগসাধন করেন। পরে অঘোরপন্থী, কাপালিক, রামাৎ, নামকপন্থী, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, কর্ত্তাভজা, দরবেশ, মুসলমান ফকীর, বৌদ্ধ-যোগি সম্প্রদায়ে মিশিয়া প্রাণের ব্যাকুলতা-প্রশমনের প্রয়াস পান। তৎপরে গয়ায় গিয়া, আকাশগঙ্গা পাহাড়ে অবস্থিত অশীতিপর বৃদ্ধ দিব্যকান্তি বাবাজীর নিকট অবস্থান করিয়া ও ব্রাহ্মযোগী পাহাড়ের সাধু, ভৈরব ও পরমহংস দর্শন করিয়া বিহ্বল হইয়া দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক গেরুয়া বসন পরিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরে গুরুর অভিপ্রায়ানুসারে স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অমৃতময়ী ভক্তি-সঞ্জীবনী উপদেশমালা শ্রবণ করেন; তাহাতে তাঁহার বিহ্বল-হৃদয় তৃপ্ত হয়, জীবন-সমস্যার সমাধান হয়। ঢাকায় ফিরিয়া 'প্রকৃত উপাসনা' 'ব্রাহ্মধর্ম্ম কি' ও 'জীবনের দায়িত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন;

'ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য, নিবেদন, সামাজিক শাসন' এই সকল বিষয়ে কয়খানি পুস্তিকাও প্রচার করেন। পরে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের কীর্ত্তনের দলে সম্মিলিত হইয়া ঢাকায় ভক্তিবন্যা প্রবাহিত করেন। পুনরায় পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার, উপদেশ, বক্তৃতাদি প্রদান এবং 'যোগসাধন' পুস্তিকা বিতরণ করেন। ১২৯২ সালে বামাবোধিনী পত্রিকায় তাঁহার আত্ম-জীবনের সত্যলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা, ধর্ম্মসাধনের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ 'আশাবতীর উপন্যাস' নামে প্রকাশিত হয় এবং 'আত্ম-বিবরণ' নামে নিজ জীবনের পরীক্ষিত সত্যরাজি তিনি প্রকাশ করেন। যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি যোগসাধন-ধর্ম্মের দীক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন—বলেন—"অজ্ঞান লোকদিগের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা ব্রহ্মের রূপকল্পনা করিয়াছেন। * * রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম এ সকলই এক,—যিনি পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। * * দেবদেবীর মন্দিরে প্রতিমার সম্মুখেই যদি আমার ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হয়, তবে আমি সেখানেই আত্মহারা হইয়া যাই। * * ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, ভক্ত সকল রূপেই ভগবান্‌কে ডাকিতে পারেন।" ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে পৌত্তলিক হিন্দু সাব্যস্ত করিলে মতভেদ হেতু তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও আচার্য্যের পদ ত্যাগ করেন। কিছুদিন ঢাকায় অবস্থান করিয়া একমাত্র পুত্র যোগজীবন ও কন্যা শান্তি-সুধা দেবীর ব্রাহ্মমতে বিবাহ দেন। পরে 'গণ্ডেরিয়া'র নির্জ্জন জঙ্গলে আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করিয়া সাধন-ভজন, যোগ ও ধ্যানে নিমগ্ন হন—মধ্যে মধ্যে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া যোগ-সাধনধর্ম্মে অনেককে দীক্ষা দেন ও নূতন মত সুপ্রচার করেন। ইহার পর তিনি ইষ্টদর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়।

কলিকাতায় ফিরিয়া প্রবল উদ্যমে সাধন-ভজন, সংকীর্ত্তন, ভাগবত-ব্যাখ্যা ও দীক্ষাদান করেন। কলিকাতার বাসায় অদ্বৈতবংশের গোস্বামীর জটাজুট-মণ্ডিত, গৈরিকধারী, রুদ্রাক্ষ-শোভিত সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য বহু লোক সমাগত হইয়া উপদেশলাভে তৃপ্ত হইত। ইহার পর পূর্ব্ব ও পশ্চিম-বঙ্গের নানাস্থানে পরিভ্রমণ ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ১২৯৭ সালে তিনি হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় ও ১৩০০ সালে প্রয়াগের কুম্ভমেলায় শিষ্যগণ সহ গমন করেন। কুম্ভমেলায় সমবেত অসংখ্য সাধু ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া তিনি পরম তৃপ্তিলাভ করেন। বড় ও ছোট কাটিয়া-বাবা, মহাত্মা দয়ালদাস, অর্জ্জুনদাস, পূর্ণানন্দ স্বামী, সা-সাহেব, ত্রৈলঙ্গ স্বামী প্রভৃতি সাধুগণ তাঁহাকে 'স াচ্চা সাধু মহাত্মা' বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত পরম সমাদরে ধর্ম্মালাপ করেন। এলাহাবাদে তিনি হিন্দুভাবে মন্ত্রাদি পাঠ করাইয়া হিন্দু-সমাজের পাত্রের সহিত কনিষ্ঠা কন্যা প্রেমসখীর বিবাহ দেন। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি নবদ্বীপের চৈতন্যোৎসবে গিয়া বক্তৃতা, কীর্ত্তন ও ধর্ম্মপ্রচার করেন। পরে অসুস্থ-শরীরে পঞ্চাশজন শিষ্যসহ ষ্টীমারযোগে পুরীধামে উপনীত হন। শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়াই কীর্ত্তনানন্দে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়েন। তিনি পুরীতে পনের মাস অবস্থান করিয়া 'ভগবৎনির্দ্দেশে' শিষ্যগণের অর্থসাহায্যে মহাদানচ্ছত্র খুলিয়াছিলেন; সেই সময় বহুবিধ আন্দোলন করিয়া তিনি তথায় বানরহত্যা নিবারণ করেন। পুরীতে তাঁহার মুক্তহস্ত দান, অহেতুকী ভক্তি, বিশ্বাস, কীর্ত্তন, বৈরাগ্য ও বিহ্বলতা দর্শনে সাধারণে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছিল। ১৩০৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে, আটান্ন বৎসর বয়সে, পুরীর পুণ্যক্ষেত্রে মহাপ্রেমিক ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের তিরোভাব হয়। পুরীর নরেন্দ্র সরোবর-তীরে শিষ্যগণ

তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিয়া জাটিয়া বাবার সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ ধর্ম্মপ্রাণ, বিনয়াবতার, নিরভিমানী, দারিদ্র-দুঃখে অবিচলিত, ঈশ্বরপ্রেমোন্মত্ত, সত্যলাভের জন্য ব্যাকুল, ধর্ম্মপ্রচারে অসীম অধ্যবসায়শীল, কষ্টসহিষ্ণু, খ্যাতি-স্পৃহাহীন, বিরাগ-বিদ্বেষ-স্বার্থ-জ্ঞানশূন্য, মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। পীড়িতের সেবায়, বিপন্নের ত্রাণে, করুণায় তাঁহার উদার হৃদয় বিগলিত হইত। সত্যপ্রচারদ্বারা অজ্ঞান-তমোনাশ করিবার জন্য—ন্যায়ের মর্যাদারক্ষার জন্য—সত্যলাভের জন্য কঠোরতর সাধনায় তিনি আত্মজীবন বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

স্বামী বিবেকানন্দ।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী, বাঙ্গালা ১২৬৯ সালের পৌষ-সংক্রান্তির পুণ্যপ্রভাতে, কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে কলিকাতার অন্তর্গত সিমুলিয়ার প্রসিদ্ধ দত্তবংশে নরেন্দ্রনাথ বা উত্তরকালে বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাভাজন এটর্ণি ছিলেন। দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মানবোচিত মহদগুণে বিশ্বনাথ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। অজস্র অর্থ উপার্জ্জন সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথের পিতা সঞ্চয়ী ছিলেন না। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব-প্রতিপালনে তাঁহার উপার্জ্জনের যাবতীয় অর্থ ব্যয়িত হইত। নরেন্দ্রনাথের জননী ভুবনেশ্বরী আদর্শ-হিন্দুনারী ছিলেন। ব্রত, উপবাস, পূজা অর্চ্চনাতেই তাঁহার অনন্যসাধারণী আসক্তি ছিল। রামায়ণ-মহাভারত তাঁহার নখদর্পণে ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ স্মৃতিশক্তিতে একদিন জগৎ চমৎকৃত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি বলিতেন যে, তাঁহার জননীর স্মৃতিশক্তি তাঁহার অপেক্ষাও প্রখরা ছিল।

নরেন্দ্রনাথ শৈশবে অত্যন্ত দুরন্ত ও চঞ্চল ছিলেন। বীরেশ্বর শিবের বরে এই পুত্রলাভ হয় বলিয়া ভুবনেশ্বরী তাঁহাকে "বিলে" বলিয়া ডাকিতেন। রাশি-নামও বীরেশ্বর ছিল। অন্নপ্রাশনের সময় "নরেন্দ্রনাথ" নামে

তিনি অভিহিত হন। দুর্দ্দান্ত শিশু নরেন্দ্রনাথের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুইটি পরিচারিকা নিযুক্ত ছিল। নরেন্দ্রনাথ যখনই যাহা জিদ্ করিতেন, তাহা হইতে তাঁহাকে কেহই নিবৃত্ত করিতে পারিত না। বাধা পাইলে তাঁহার উত্তেজনা আরও বাড়িয়া যাইত। একবার কাঁদিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাকে কেহই শান্ত করিতে পারিত না। কেহ ধরিতে গেলে, তিনি নর্দ্দমার মধ্যে গিয়া দাঁড়াইতেন। নরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা সহোদরা-যুগল দুর্দ্দান্ত বালকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেন। অন্য কোনও উপায়ে শান্ত করিতে না পারিয়া জননী ভুবনেশ্বরী যখন বালকের মস্তকে "শিব—শিব" বলিয়া বারিধারা বর্ষণ করিতেন, তখন শিশু অমনই শান্ত হইত। এই আবিষ্ক্রিয়ার পর হইতে অশান্ত বালককে এইরূপে সকলে শান্ত করিতেন।

নরেন্দ্রনাথের চারিটি সহোদরা ও আরও দুইটি সহোদর ছিলেন। তন্মধ্যে দুইটি ভগিনী বহুপূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। কনিষ্ঠ সহোদর-যুগলের নাম মহেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র।

বালক নরেন্দ্রনাথ পল্লীর বালখিল্য-সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিশু-সম্প্রদায় সকল বিষয়ে তাঁহারই অনুকরণ করিত। দ্বিতলের সোপানে নরেন্দ্রনাথ রাজা হইয়া বসিতেন। সহচরবৃন্দের কেহ পাত্র, কেহ মন্ত্রী, কেহ বা কোটাল সাজিয়া খেলা করিত। ক্রীড়ার সময় নরেন্দ্রনাথ এমন তন্ময় হইয়া পড়িতেন যে, সে সময় বাহ্যবিষয়ে তাঁহার জ্ঞানই থাকিত না। একদিন খেলার সময় সোপানশ্রেণী হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগে। সেই আঘাতের ক্ষতচিহ্ন তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে স্থায়ী রেখা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল।

শৈশব হইতেই নরেন্দ্রনাথ গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দে নূতনত্ব অনুভব করিতেন। রাজপথে অশ্বশকটধ্বনি শুনিবামাত্রই তিনি বাহিরে আসিয়া

সবিস্ময়ে উঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিতেন। গাড়ীর পরিচালক বা গাড়োয়ান তাঁহার নিকট উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া পরিগণিত হইত। একদিন পিতার প্রশ্নে বালক নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, তিনি "ঘোড়ার সহিস বা গাড়ীর কোচম্যান" হইবেন! বালক নরেন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল যে, এই বিশ্বে গাড়োয়ানের উচ্চপদলাভই মানব-জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। অধিকাংশ কালই তিনি অশ্বশালায় অতিবাহিত করিতেন। ঘোড়া তাঁহার অতীব প্রিয় ছিল।

মাতৃমুখে রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যানগুলি শুনিতে নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ভুবনেশ্বরী অনেক সময় পুত্রকে ক্রোড়ে বসাইয়া সীতারামের পবিত্র কাহিনী বর্ণনা করিতেন। রামের অবদান তাঁহার শিশুহৃদয়ে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রামসীতার মূর্ত্তি ক্রয় করিয়া আনিয়া শিশু নরেন্দ্রনাথ বাটীর একটি নির্জ্জনকক্ষে সেই মূর্ত্তির সম্মুখে অনেক সময় ধ্যানমগ্নের ন্যায় নিমীলিত-নেত্রে বসিয়া থাকিতেন। বাটীর কোচম্যানের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল। সে কোনও অজ্ঞাত কারণে বিবাহের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল। সুকুমারমতি বালকের নিকট সে দাম্পত্য-জীবনের অশান্তিময়ী কাহিনী এমনই নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছিল যে, তাহাতেই নরেন্দ্রনাথের শিশুহৃদয়ে বিবাহিত জীবনের প্রতি একটা গভীর বিতৃষ্ণা জন্মে। ইহার পর একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে বালক নরেন্দ্রনাথ দাম্পত্য-প্রেমের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ সীতারামের যুগলমূর্ত্তি শত-খণ্ডে চূর্ণ করিয়া রাজপথে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

শৈশব হইতেই সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি নরেন্দ্রনাথের গভীর আসক্তি জন্মে। এক টুকরা গৈরিক বস্ত্র কৌপীনের মত কোমরে আঁটিয়া তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মাতা প্রশ্ন করিলে উত্তরে বলিতেন, "আমি শিব

হয়েছি মা!" সন্ন্যাসী দেখিলেই বালক নরেন্দ্র গৃহের ভাল বস্ত্রাদি যাহা কিছু নিকটে পাইতেন, তাহাই অকুণ্ঠিত-চিত্তে তাহাকে দান করিতেন।

সীতারামের মূর্ত্তি ফেলিয়া দিবার পর নরেন্দ্রনাথ সেই স্থলে শিবমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক ধ্যানে বসিতেন। কখনও একাকী,—কখনও বা প্রতিবেশী বালকদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি ধ্যানে তন্ময় হইয়া যাইতেন। শিশুর হৃদয়ে তখন ধ্যানের বিষয় কি ছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু ধ্যানে বসিয়া প্রায়ই তিনি বাহ্য-চৈতন্য হারাইয়া ফেলিতেন। একদিন প্রতিবেশী বালকবৃন্দসহ নরেন্দ্রনাথ ধ্যানে নিমগ্ন, এমন সময় একটি বালক দেখিল যে, মেজের উপর একটা প্রকাণ্ড গোক্ষুর সর্প। বালকের দল চীৎকার করিতে করিতে বাহিরে পলায়ন করিল, কিন্তু ধ্যানমগ্ন নরেন্দ্রনাথ তখন বাহ্য-চৈতন্য-শূন্য। চীৎকার ও গোলোযোগে আকৃষ্ট হইয়া নরেন্দ্রের পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন ঘটনাস্থলে আসিলেন;—দেখিলেন, উদ্যতফণা প্রকাণ্ড সর্প নিমীলিত-নেত্র ধ্যানস্থ বালকের সম্মুখে দুলিতেছে। অল্পক্ষণ পরে সর্পটি আপনা হইতেই সে স্থান ত্যাগ করিল; কিন্তু এত বড় ব্যাপারেও সে সময় ধ্যানমগ্ন বালকের চৈতন্য হয় নাই। তার পর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সমস্ত কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন যে, তিনি এ সকল ব্যাপার কিছুই জানিতে পারেন নাই।

বাল্যকালাবধি নিদ্রার পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথ একটা দিব্য জ্যোতিঃপূর্ণ গোলক ভ্রূযুগলমধ্যে দর্শন করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, নিদ্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে সকল বালকই ঐরূপ জ্যোতিঃপিণ্ড দর্শন করিয়া থাকে। এজন্য ব্যাপারটির অসাধারণত্ব তাঁহার মনে কোনও প্রশ্নের উদ্রেক করে নাই। বহুদিন পরে যখন তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট ধ্যান-শিক্ষা করিতেন, সেই সময় সমবয়স্ক কোনও বন্ধুকে নিদ্রার পূর্ব্বে

তাঁহার জ্যোতিঃপিণ্ড দর্শনের কথা উল্লেখ করেন। শুনা যায়, পরমহংসদেব এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, উহা ধ্যান-সিদ্ধির লক্ষণ। উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার এক গুরু-ভ্রাতার ললাট স্পর্শ করিবামাত্র তিনি অখণ্ড জ্যোতিঃসমুদ্র দেখিতে পাইয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে ক্রীড়াচ্ছলে ধ্যান-ধারণা করিতে গিয়া অনেক সময় নরেন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব, লোকাতীত বিষয়ে দর্শনলাভ ঘটিত। একবার পাঠদ্দশায় অর্গলরুদ্ধ কক্ষে বসিয়া তিনি ধ্যান করিতেছিলেন। উহা শেষ হইবার পর তিনি দেখিতে পাইলেন, কক্ষের দক্ষিণ-প্রাচীর ভেদ করিয়া মুণ্ডিতশীর্ষ, প্রশান্ত, জ্যোতির্ম্ময় এক পুরুষ দণ্ডকমণ্ডলু-হস্তে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার আননে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ঈষৎ ভীত হইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। পরক্ষণে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু আর সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। ভবিষ্যতেও ঐ মূর্ত্তির পুনর্দ্দর্শনলাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। এই মূর্ত্তিতে নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন।

ষড়্‌বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বালক নরেন্দ্রনাথ শিক্ষার্থ পাঠশালায় প্রবিষ্ট হন। তাঁহার সহপাঠীদিগের অনেকেই ইতরশ্রেণীর বালক ছিল, তাহাদের সংসর্গে থাকিয়া পুত্র ইতরভাষা ব্যবহার করিতে শিখিতেছে দেখিয়া পিতা বিশ্বনাথ তাঁহার পাঠশালায় অধ্যয়ন বন্ধ করিয়া দিলেন। একজন গৃহ-শিক্ষক নিয়মিতভাবে আসিয়া নরেন্দ্রকে পড়াইয়া যাইতেন। শিক্ষক যখন পাঠ বলিয়া দিতেন, বালক নরেন্দ্রনাথ নিমীলিত-নেত্রে উহা শ্রবণ করিতেন। তাঁহার এমনই চেষ্টা ছিল যে, একবারমাত্র শুনিলেই পাঠ কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। নরেন্দ্রনাথ কাহারও কড়া কথা সহ্য করিতে পারিতেন না।

রক্তচক্ষু দেখাইয়া শিক্ষক কোনও দিন তাঁহার নিকট পাঠ আদায় করিতে পারেন নাই।

অতঃপর সপ্তমবর্ষ-বয়সে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রপলিটন বিদ্যালয়ে নরেন্দ্রনাথ প্রবেশলাভ করেন। কিন্তু ইংরাজী ভাষা শিখিতে প্রথমতঃ তাঁহার ঘোরতর আপত্তি ছিল। আত্মীয়স্বজন নানাপ্রকারে তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও বালক নরেন্দ্রনাথ কোনও মতেই ইংরাজী শিখিতে চাহিলেন না। কিন্তু কয়েকমাস পরে কি ভাবিয়া আপনা হইতেই তিনি প্রগাঢ় আগ্রহ সহকারে ইংরাজী ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। বিজাতীয় ভাষা বলিয়া যে ইংরাজীর উপর তাঁহার ঘোরতর বিরাগ ছিল, পরিণামে সেই ভাষার সাহায্যেই বিবেকানন্দ দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন।

স্বভাবসিদ্ধ নেতৃত্বের গুরণাজি লইয়াই কি নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? বিদ্যালয়ে যোগদান করিবার পরই তিনি বালকবৃন্দের নেতার স্থান অধিকার করিলেন। সকল প্রকার খেলা, ছুটাছুটি, ঘুষাঘুষী ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। নিজে ভয়ানক চঞ্চল ও দুর্দ্দান্ত হইলেও তিনি কখনও কাহাকেও কোন প্রকার কষ্ট দিতেন না। বরং বালকদিগের বিবাদ ও বিসংবাদ ঘটিলে তিনিই মধ্যস্থতা করিয়া সকলের বিবাদভঞ্জন করিয়া দিতেন। শৈশব হইতে শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইলেও তিনি সতীর্থ ও ক্রীড়া-সঙ্গীদিগকে সর্ব্বদা আনন্দিত রাখিবার চেষ্টাই করিতেন। যে একবার নরেন্দ্রনাথের সংস্রবে আসিত, জীবনে সে কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারিত না।

পল্লীতে একটি ব্যায়াম-ক্ষেত্র ছিল। সেখানে নরেন্দ্রনাথ রীতিমত ব্যায়াম-চর্চ্চা করিতেন। লাঠি-খেলাতেও তিনি সমবয়স্ক বালকদিগের মধ্যে

প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। একবার কোনও মেলায় লাঠি-খেলার প্রতিযোগিতা হইতেছিল। দর্শক নরেন্দ্রনাথ ক্রীড়াক্ষেত্রে লাঠি-হস্তে নামিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ ও বয়োজ্যেষ্ঠ বালককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তখন নরেন্দ্রনাথ দশমবর্ষীয় বালক মাত্র। দর্শকগণ এই কৌতুকজনক প্রতিযোগী পরীক্ষার ফলাফল দর্শনের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথের লাঠি চালাইবার কৌশল দেখিয়া দর্শক মাত্রেই বিস্ময়-বিমূঢ় হইল। চারিদিক্ হইতে লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহার একটিও বালকের অঙ্গস্পর্শ করিল না, লাঠির গাত্রে প্রতিহত হইয়া লোষ্ট্রখণ্ডসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তারপর প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত নরেন্দ্রনাথ লাঠির বল-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন, অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহার যষ্টির আঘাতে প্রতিযোগীর লাঠি দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল।

শারীরিক বলে শ্রেষ্ঠ হইলেও কোনও দিন কাহারও অঙ্গে আঘাত করেন নাই। বাল্যকাল হইতেই সকল বিষয়ে তাঁহার অনন্যসাধারণ সংযম প্রকাশ পাইয়াছিল, সহচরগণের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা ঘটিলেই তিনি উভয়ের মধ্যস্থ দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া দিতেন।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সৎসাহস, বন্ধুপ্রীতি, দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি সকল প্রকার মনুষ্যোচিত মহদ্গুণের বিকাশ বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথের মধ্যে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার বয়স যখন মাত্র ছয় বৎসর, সেই সময় সহচরগণ সমভিব্যাহারে তিনি একদিন চড়কের উৎসব-ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। মহাদেবের কতিপয় মৃণ্ময় পুত্তলিকা ক্রয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্র বালক দলভ্রষ্ট হইয়া

রাস্তায় গিয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় তাহার সাম্‌নে একটি দ্রুতগামী শকট আসিয়া পড়ায় ক্ষুদ্র বালকটি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। বালকের আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া চারিদিক্ হইতে পথচারিগণ কোলাহল করিয়া উঠিল ; কিন্তু কেহই তাহার উদ্ধারার্থ অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। পশ্চাতে চাহিবামাত্র বালক নরেন্দ্রনাথ সঙ্গী বালকটির বিপদ্ বুঝিতে পারিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি ত্বরিত-গতিতে সঙ্গীর নিকটস্থ হইয়া অশ্ব-পদতল হইতে তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া আনিলেন। ক্ষুদ্র নরেন্দ্র-নাথের এই অসমসাহসিকতার জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে অজস্র প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হইল। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলেই সেই বালকটি অশ্বপদতলে পিষ্ট হইয়া ইহলীলা শেষ করিত। নরেন্দ্রনাথের জননী এই কাহিনী শুনিয়া পুত্রকে বুকে ধরিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ-নেত্রে বলিয়াছিলেন, "সব সময় এই রকম মানুষের মত কাজ করো বাবা !"

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সৎসাহসের বহু পরিচয় নরেন্দ্রনাথের জীবনে আমরা দেখিতে পাই। সাত আট বৎসর বয়সে একদিন সহযোগিগণসহ তিনি মেটেবুরুজে নবাব ওয়াজীদ আলী সাহের পশুশালা দেখিতে গিয়া-ছিলেন। চাঁদপাল-ঘাট হইতে যাতায়াতের জন্য একখান টাপুরে ডিঙ্গী ভাড়া করা হইয়াছিল। ফিরিবার সময় একজন সঙ্গী অসুস্থ হইয়া নৌকায় তক্তার উপর বমন করিয়া ফেলে। মুসলমান মাঝি বালকদিগকে নৌকা পরিষ্কার করিয়া না দিলে তীরে নামিতে দিবে না বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। বালকেরা প্রস্তাব করিল যে, তাহারা পারিশ্রমিক দিতেছে, অন্য কাহারও দ্বারা যেন তাহারা উহা পরিষ্কার করাইয়া লয়। কিন্তু মাঝিরা তাহাতে অসম্মত হইয়া বালকদিগের দ্বারা বলপূর্ব্বক কাজ করাইয়া লইতে উদ্যত হইল। এতদুপলক্ষে উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম

উপস্থিত দেখিয়া বালক নরেন্দ্রনাথ পাশ কাটাইয়া নৌকা হইতে নামিয়া পড়িলেন। দলের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। নিতান্ত বালক বোধে মাঝিরা তাঁহাকে কিছু বলিল না। নরেন্দ্রনাথ দেখিতে পাইলেন, দুইজন ইংরাজ সৈনিক রাজপথের উপর দিয়া যাইতেছে। বালক দ্রুতপদে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনানন্তর তাহাদের হস্ত-ধারণ করিলেন। দুই চারিটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী কথায় ও ইঙ্গিতে সৈনিকযুগলকে তিনি ব্যাপারটি বুঝাইয়া দিয়া ঘটনাস্থলের দিকে তাঁহাদের আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেলেন। প্রিয়দর্শন ক্ষুদ্র বালকের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া সৈনিকযুগল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ব্যাপারটা কি, বুঝিতে পারিল। পল্টনের গোরার উদ্যত বেত্র-যষ্টি ও ভীষণ গর্জ্জনে ভীত হইয়া মাঝিরা চাণক্যনীতি অবলম্বন করিল। নরেন্দ্রনাথের সহচরগণ মুক্তি পাইল।

ভূতপূর্ব্ব ইংলণ্ডেশ্বর, ভারত-সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড যে বৎসর প্রিন্স অব ওয়েলস্‌রূপে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন নরেন্দ্রনাথ দশ এগার বৎসর-বয়স্ক বালক মাত্র। 'সিরাসিপ' নামক একখানি বৃহদাকার ইংরাজ রণতরী সেই সময় কলিকাতার বন্দরে আসিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ-পত্র সংগ্রহ করিয়া বহু ব্যক্তি উক্ত রণতরী দর্শন করিতে যায়। স্বভাবজাত কৌতূহলবশে নরেন্দ্রনাথও সহচরগণ সহ উক্ত রণতরী-দর্শনের জন্য একখানি আবেদনপত্র সহ চৌরঙ্গীস্থিত কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। বালক তথায় আসিয়া দেখিলেন যে, বিশেষ গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্যতীত দ্বারবান্ অন্য কাহাকেও কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। নরেন্দ্রনাথ আরব্ধ কার্য্য অসমাপ্ত রাখিতে বাল্যাবধিই অভ্যস্ত ছিলেন না। যেরূপেই হউক, কার্য্যোদ্ধার করা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব। তিনি দেখিলেন, দ্বাররক্ষক তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিবে না।

কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, আবেদনকারিগণ ত্রিতলের এক বারান্দায় যাইতেছে। তিনি বুঝিলেন, যে সাহেব আদেশপত্র লিখিতেছেন, তিনি ঐখানেই আছেন। তখন তিনি ঐ স্থানে যাইবার স্বতন্ত্র কোন পথ আছে কি না, তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পরিচারকদের যাইবার জন্য উক্ত বাটীর পশ্চাদ্ভাগে একটি লৌহ-সোপান বিদ্যমান। তিনি সেই সোপানের সাহায্যে লঘুপদে উপরে উঠিয়া গেলেন। কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইলে তাঁহার লাঞ্ছনা ঘটিত, তথাপি স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য তিনি সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়াই উপরে উঠিয়া গেলেন। তার পর আবেদনকারিগণের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যথাসময়ে আবেদনপত্রে সাহেবের অনুমোদন ও স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া সম্মুখের সোপানপথে তিনি কার্য্যালয় হইতে বাহিরে আসিলেন।

যে অনন্যসাধারণ সেবাবৃত্তি ও দয়া বিবেকানন্দকে উত্তরকালে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথের অন্তরে তাহার পর্য্যাপ্ত বিকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। জননী ভুবনেশ্বরী হইতেই নরেন্দ্রনাথ করুণ-কোমল হৃদয়টি লাভ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুক কোনও দিন ভিক্ষা চাহিয়া তাঁহার নিকট হইতে রিক্তহস্তে ফিরিয়া যায় নাই। সতীর্থ ও ক্রীড়াসঙ্গীদিগকেও তিনি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন। খেলার সময় কোনও সঙ্গী পীড়িত অথবা আহত হইলে, তৎক্ষণাৎ ক্রীড়া বন্ধ রাখিয়া তিনি তাহার পরিচর্য্যায় রত হইতেন। একবার তিনি বহুসংখ্যক বালকসহ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দেখিতে গমন করেন। দলের একটি বালক পথশ্রমে কাতর ও প্রকৃতই অসুস্থ হইয়া পড়ে। বালকটির পীড়া প্রকৃত নহে বলিয়া অন্যান্য সঙ্গীরা তাহাকে পরিহাস করিতেছিল। কিন্তু বালকটি ক্রমেই দলের পশ্চাতে পড়িয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ দলের পুরোভাগে ছিলেন।

সহসা তাঁহার মনে হইল, যদি প্রকৃতই পশ্চাতের বালকটির পীড়া হইয়া থাকে? বালক নরেন্দ্রনাথ তখনই সঙ্গীর সন্ধানে চলিলেন। কিয়দ্দূর পশ্চাদ্‌গমনের পর তিনি দেখিলেন, বালকটি সত্যই পথের ধারে বসিয়া পড়িয়াছে। প্রবল জ্বরে সে আক্রান্ত। কেল্লা দেখার কৌতূহল দমন করিয়া নরেন্দ্রনাথ একখানি গাড়ী করিয়া বালকটিকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। এমন ব্যাপার বহুবার ঘটিয়াছিল।

একদিন তিনি একটি বালক ও তাহার মাতাকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করেন। বালক ও তাহার মাতার উপর একখানি দ্রুতগামী গাড়ী আসিয়া পড়ে। নরেন্দ্রনাথ তখন সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি দ্রুতবেগে উহাদের কাছে গিয়া এক হস্তে বালককে এবং অপর হস্তে বালকের মাতাকে আকষণ করিয়া দূরে সরাইয়া লইয়া যান। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বহু নিদর্শনই বালক নরেন্দ্রনাথের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়।

বাল্যকাল হইতেই বিচারবুদ্ধি নরেন্দ্রনাথের জীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার বাটীর সন্নিকটে একটি চাঁপাফুলের গাছ ছিল। অবসর পাইলেই বালক নরেন্দ্র সেই গাছের ডাল ধরিয়া বাদুড়ের মত ঝুলিয়া থাকিতেন। একদিন অপর একটি সঙ্গীর সহিত তিনি ঐরূপ ক্রীড়ায় নিযুক্ত আছেন, এমন সময় পল্লীর এক বৃদ্ধ—নরেন্দ্র তাঁহাকে ঠাকুরদাদা বলিতেন—নরেন্দ্রনাথকে ঐ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ভীতিপ্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, উক্ত বৃক্ষে ব্রহ্মদৈত্য আছে: যে দিন সুযোগ পাইবে, সেই দিন উক্ত প্রেতযোনি তাহাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিবে। নরেন্দ্রনাথ নীরবে বৃদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিলেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধ দৃষ্টির অন্তরাল হইবামাত্র পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ সহকারে দুলিতে লাগিলেন। ক্রীড়াসঙ্গী ব্রহ্মদৈত্যের কথা উত্থাপন করিলে, বালক নরেন্দ্র সহাস্যে বলিলেন, "দূর্

আহাম্মক, কেউ কিছু বল্‌লেই কি চট্ ক'রে বিশ্বাস কর্‌তে হয়? সত্যি যদি ব্রহ্মদৈত্য থাক্‌ত তাহ'লে অনেক আগেই ঘাড় ভাঙ্‌তো।"

লেখাপড়ায় নরেন্দ্রনাথ সহপাঠিগণের শীর্ষস্থানে থাকিতেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় শৈশব হইতেই পাওয়া যায়। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি সমগ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সাত বৎসর বয়সে তিনি কৃত্তিবাস-বিরচিত রামায়ণ হইতে যে কোনও স্থল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। একবার কোনও বাড়ীতে রামায়ণ-গান হইতেছিল। নরেন্দ্রনাথ তথায় শ্রোতা। গায়ক রামায়ণ-কথা বলিতে বলিতে সহসা থামিয়া যান, একটা কথা তাঁহার মনে পড়িতেছিল না। নরেন্দ্রনাথ সেই স্থলটি আবৃত্তি করায় সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার স্মৃতি-শক্তির প্রখরতায় বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া পড়েন।

বিপৎকালে অবিচলিত থাকার অনেক উদাহরণ বালক নরেন্দ্রনাথের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে, সিমলা পল্লীর বালকদিগের ব্যায়ামশিক্ষার আখড়া ছিল। নরেন্দ্রনাথ তথায় প্রত্যহ গিয়া ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন। একদিন বালকেরা আখড়ায় একটা "ট্রাপিজ" খাটাইবার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছিল। প্রকাণ্ড কাঠের স্তম্ভটি কোনও মতেই স্থাপন করা যাইতেছিল না। পথে বহুলোক দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল। জনতার মধ্যে একজন বলিষ্ঠ ইংরাজ নাবিককে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। ইংরাজটি সানন্দে বালকদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। ট্রাপিজের পদদ্বয় ইংরাজ নাবিক গর্ত্তমধ্যে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট করাইতে লাগিলেন। বালকেরা উহার শীর্ষদেশ টানিয়া তুলিতে লাগিল। সহসা দড়ি ছিঁড়িয়া গেল। ট্রাপিজের একটি পা ঠিক্‌রাইয়া সাহেবের ললাটে প্রচণ্ড আঘাত করিল। নাবিকের সংজ্ঞাশূন্য রক্তাক্ত

দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। বালকের দল এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল,পরক্ষণেই যে যে দিকে পারিল, পলায়ন করিল। কিন্তু স্থিরবুদ্ধি প্রত্যুৎপন্নমতি নরেন্দ্রনাথ মাত্র দুই একজন সঙ্গীর সহিত ঘটনাস্থলে থাকিয়া সাহেবের ক্ষতস্থানটির প্রতীকারোপায় করিতে লাগিলেন। পরিধেয় বসন ছিন্ন করিয়া অগ্রে ক্ষিপ্রহস্তে তিনি নাবিকের ক্ষতস্থল বাঁধিয়া দিলেন। তার পর বিবিধ উপায়ে তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন করিয়া ট্রেণিং একাডেমী নামক বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া গেলেন। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, আঘাত সাংঘাতিক নহে। চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় সাহেব সুস্থ হইয়া উঠিলে, নরেন্দ্রনাথ পল্লীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া তাঁহাকে পাথেয় দিয়া বিদায় করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ যে উত্তরকালে একজন মহদ্ব্যক্তি হইবেন, এ বিষয়ে বাল্যকাল হইতেই কেহ কেহ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ যখন ষড়্বর্ষ-বয়স্ক বালকমাত্র, সেই সময় তাঁহার খুল্লপিতামহ পরলোকগমন করেন। "মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া বৃদ্ধ আত্মীয়-স্বজনকে কাছে ডাকাইয়া আনিলেন। বৃদ্ধের তখন একবার মহাভারত শুনিবার ইচ্ছা হইল। বালক নরেন্দ্রনাথ খুল্লপিতামহের শেষ সাধ পূর্ণ করিবার জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া পরিষ্কার-কণ্ঠে মহাভারতের নির্দ্দিষ্ট স্থলটি পড়িয়া শুনাইলেন। বৃদ্ধ তখনই বলিয়া-ছিলেন; "কালে এই বালক অতি মহৎ হইবে।"

শৈশব হইতেই নরেন্দ্রনাথ রামায়ণ-ভক্ত ছিলেন। কোনও স্থানে রামায়ণ-গান হইতেছে শুনিলেই তিনি সেখানে উপস্থিত হইতেন। শ্রীরাম-চন্দ্রকে সর্ব্বগুণাধার আদর্শ-পুরুষ বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল। রাম-ভক্ত হনূমান্‌ও তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পাত্র ছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, রামসেবক, ভক্তবীর হনূমানকে তদ্‌গতমনে ধ্যান করিলে

দেখিতে পাওয়া যায়। হনূমানকে দেখিবার জন্য জনৈক কথকের নির্দ্দেশ-মত বাটীর সন্নিকটস্থ কদলীবনে গিয়া নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও হনূমানের দর্শন না পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার মাতা ও অন্যান্য পরিজন যখন বুঝাইয়া বলিলেন যে, প্রভুর কার্য্যে সে দিন হনূমান অন্য কোথাও গিয়াছেন, তাই তাঁহার দর্শন ঘটে নাই, তখন বালক নরেন্দ্রনাথের ক্ষোভ দূরীভূত হয়। পরিণত-বয়সেও স্বামী বিবেকানন্দ হনূমানের বিষয়ে আলোচনায় যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিতেন। বেলুড়-মঠে পবন-নন্দনের একটি প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্পও তাঁহার ছিল।

জননীর প্রতি ভক্তি, ভালবাসা ও আকর্ষণ শৈশবাবধিই নরেন্দ্রনাথের জীবনে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিশ্বে যাঁহারা মহৎ নামে পরিচিত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই মাতৃভক্ত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথের মাতৃভক্তি আদর্শ ভক্তি ছিল। তাঁহার পিতার বিদ্যাবুদ্ধি, গাম্ভীর্য্য ও বিবেচনা শক্তিকেও নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। পরিণত-বয়সেও পিতার কথা বলিতে গিয়া তিনি গর্ব্ব অনুভব করিতেন। কোনও লোককেই তিনি তাঁহার জনকের সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতেন না। তথাপি প্রয়োজন হইলে পিতার মতের বিরুদ্ধে যুক্তি ও তর্ক দ্বারা নিজের মত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে তিনি কোনও দিন কুণ্ঠিত হন নাই। উত্তর-কালেও স্বামী বিবেকানন্দ সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্য নির্ভীকভাবে নিজের উপলব্ধ বিশ্বাসজাত বিষয় ব্যক্ত করিতে কোনও দিন কুণ্ঠিত হন নাই। যাহা সত্য, যাহা প্রকৃত, তাহার জন্য তিনি কোনও দিন তর্ক করিতে ও তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে কোনও দিন বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। পিতার শিক্ষার ফলেই তাঁহার চরিত্রের এই অংশটি

এমন ভাবে সুগঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বনাথবাবু স্বয়ং পুত্রের বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশের জন্য বহুক্ষণ নরেন্দ্রনাথকে লইয়া নানাপ্রসঙ্গের আলোচনায় কালক্ষেপ করিতেন; নিজের মত ঘাড়ে চাপাইতে চাহিতেন না; স্বাধীন-ভাবে স্বীয় মত ব্যক্ত করিবার অবকাশ দিতেন। বাল্যকাল হইতে পিতৃদেবের নিকট হইতে এইরূপ শিক্ষালাভের ফলে বিবেকানন্দ উদার দূরদৃষ্টির সহায়তায় প্রত্যেক বিষয়ে সূক্ষ্মতম বিচার করিতে পারিতেন।

খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব সে সময় বাঙ্গালাদেশকে অনেকটা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথের পিতার নিকট বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বহু ব্যক্তিই যাতায়াত করিতেন। অনেকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও ছিল। জাতি বা বর্ণের তারতম্য তাঁহার নিকট ছিল না। যাঁহার ভিতর মনুষ্য-ত্বের সন্ধান পাইতেন, বিশ্বনাথবাবু তাঁহাকেই সমাদর ও শ্রদ্ধা করিতেন। পুত্রের সহিত আলোচনাকালে বিশ্বনাথ হিন্দুধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে প্রভেদ কোথায় ও কিরূপ, তাহা বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেন। সেই সঙ্গে তিনি ইহাও লক্ষ্য রাখিতেন যে, স্বধর্ম্ম ও স্বদেশীয় সভ্যতার প্রতি পুত্রের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। তিনি নিজেও জাতীয় রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানাদি অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার মনে দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে, যে ব্যক্তি স্বজাতির অতীত গৌরব-কাহিনী বিস্মৃত হয়, নিজের ধর্ম্মে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সেই বিজিত। আত্মবিশ্বাস যাহার নাই, সেই ত আত্মবিস্মৃত। আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান না থাকিলে সে কথনও মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পারে না।

নরেন্দ্রনাথ পিতাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান যথেষ্টই করিতেন বটে; কিন্তু তাঁহার প্রাণের আকর্ষণ জননীর উপরই অধিক ছিল। প্রকৃত দেবীজ্ঞানে তিনি মাকে পূজা করিতেন। বিবেকানন্দ প্রায়ই বলিতেন, "যে মাকে পূজা

না করিতে পারে, সে কখনও বড় হইতে পারে না।" মাতার নিকট তিনি কোনও কথাই গোপন রাখিতেন না। যখন যাহা দেখিতেন বা শুনিতেন, অমনই গিয়া মাকে না শুনাইলে তাঁহার যেন আত্মা পরিতৃপ্ত হইত না। একবার একটি সহপাঠী বালকের নির্লজ্জ আচরণে ক্লাসের অন্যান্য বালকগণও হাসিতেছিল। শিক্ষকের নিষেধসত্ত্বেও সেই বালকটি তাহার অন্যায় আচরণে নিরস্ত হইল না। তাহার অঙ্গভঙ্গী ও হাস্যচ্ছটা দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। ইহাতে শিক্ষক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বালক নরেন্দ্রনাথের কর্ণ এমনভাবে নিষ্পীড়িত করিতে লাগিলেন যে, অবশেষে রক্তপাত হইতে লাগিল। অকারণে অপমানিত ও প্রহৃত হইয়া বালক নরেন্দ্রনাথ ক্লাসের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া শিক্ষকটিকে অত্যন্ত তিরস্কার করেন ও তদবধি শারীরিক দণ্ড দানের প্রথা মেট্রপলিটন বিদ্যালয় হইতে উঠিয়া যায়।

উল্লিখিত ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে ভূগোল পড়ায় ভুল হইয়াছে মনে করিয়া, এক শিক্ষক নরেন্দ্রনাথকে প্রহার করেন। পরে শিক্ষক নিজের ভ্রম বুঝিয়া অনুতপ্ত হন। এই দুইটি ঘটনাই নরেন্দ্রনাথ তাঁহার মাতার নিকট প্রকাশ করেন। তাঁহার জননী সে সময় তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন যে, "বাবা, সত্যকে ত্যাগ করিও না, অনেক সময় হয়ত সে জন্য লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে; কিন্তু তবু যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে, তাহা হইতে কখনও বিচলিত হইও না।"

নরেন্দ্রনাথের পিতার কাছে নানাজাতীয় মক্কেল আসিত। তন্মধ্যে একজন মুসলমান ছিল। এই ব্যক্তি নরেন্দ্রনাথকে বড় ভালবাসিত। অবসরকালে বালক নরেন্দ্র মুসলমান মক্কেলটির নিকট আফগানিস্থান

প্রভৃতি দুর্গম দেশে বাণিজ্যযাত্রার কৌতূহলপূর্ণ বিবরণ শুনিতেন। সে সময় সময় তাঁহাকে সন্দেশ, মিঠাই আনিয়া খাইতে দিত। নরেন্দ্রও অকুণ্ঠিত-চিত্তে উহা ভোজন করিতেন। অন্যান্য মক্কেল এই দৃশ্যে শিহরিয়া উঠিত। বিশ্বনাথবাবুও অনেকবার উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু আহারাদি সম্বন্ধে তিনি আচার-পালনে ততটা নিষ্ঠাবান্ ছিলেন না, সুতরাং পুত্রকে এ সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতেন না।

একবার মক্কেলদিগকে বিদায় দিবার জন্য বিশ্বনাথবাবু সদর-দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ ইত্যবসরে বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিয়া সারি সারি যতগুলি হুঁকা ছিল, তাহার প্রত্যেকটিতে মুখ দিয়া টানিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমানের হুঁকাটি একটু বেশীক্ষণ ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, কারণ, তাহাতে মৃগনাভি-গন্ধযুক্ত তাম্রকূট-ধূমের অস্তিত্ব তখনও বিদ্যমান। নরেন্দ্রনাথ অকস্মাৎ কেন এমন করিলেন, প্রশ্ন হইতে পারে। বালক নরেন্দ্রনাথ জাতিভেদ-রহস্যের মর্ম্মভেদ করিতে পারেন নাই। একের সহিত অন্যের ভোজন নিষিদ্ধ কেন, ইহা কোনও মতেই তিনি নিজ বুদ্ধিবলে মীমাংসা করিতে পারেন নাই। জাতিভেদ না মানিলে কি ব্রহ্মাণ্ড ভাঙ্গিয়া চূরিয়া মাথার উপর পড়ে? এইরূপ প্রশ্ন মনে রাখিয়াই তিনি বিভিন্ন জাতির জন্য—নির্দ্দিষ্ট হুঁকায় মুখ দিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। বালক দেখিলেন যে, তাঁহার এই "অহিন্দু" আচরণে নিখিল-বিশ্বের কোনও প্রান্তই খসিয়া পড়িল না। দুনিয়া যেমন চলিতেছিল, ঠিক তেমনই চলিতেছে। ঠিক এমনই সময় বিশ্বনাথবাবু ফিরিয়া আসিয়া পুত্রের কীর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে নির্ভীক পুত্র অম্লানবদনে বলিলেন, "দেখ্ছি, জাত না মান্লে কি হয়?" পিতা সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "বটে রে দুষ্ট!" তার পর তিনি কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

মুষ্টি-যুদ্ধে নরেন্দ্রনাথ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একবার মুষ্টি-যুদ্ধের প্রতিযোগী পরীক্ষায় তিনি প্রথম পুরস্কারস্বরূপ একটি রৌপ্যনির্ম্মিত সুন্দর প্রজাপতি উপহার প্রাপ্ত হন। বাল্যকালে শারীরিক শক্তির বলে তিনি সঙ্গীদিগকে স্বমতে আনিতেন। তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, "ছেলেবেলায় আমি ডানপিটে ছিলুম, নৈলে কি বিনা সম্বলে সারা দুনিয়াটা ঘুরে আসতে পারতুম রে?"

সকল প্রকার ব্যায়াম ও ক্রীড়ায় তিনি দক্ষ ছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গীতেই তাঁহার মহতী প্রতিভার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। আশৈশব তিনি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার পিতামাতা উভয়েই সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যার অনুরাগী ছিলেন। বিশ্বনাথবাবু ও ভুবনেশ্বরী মধুর-কণ্ঠে গান গাহিতে পারিতেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের নিকট হইতেই মিঠা গলা পাইয়াছিলেন। অতি অল্পবয়স হইতেই নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীত-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। সঙ্গীত-শাস্ত্রকে আয়ত্ত করিবার জন্য তিনি যথেষ্ট সাধনাও করিয়াছিলেন। স্বভাবতঃ তাঁহার কণ্ঠস্বর মধুর ছিল। সাধনফলে উহা আবার চরমোৎকর্ষ লাভ করে। উত্তরকালে নরেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্মসমাজে মিশিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মধুর সঙ্গীত-লহরীতে শ্রোতৃমাত্রেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া থাকিত। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও নরেন্দ্রনাথের অপ্সরোকণ্ঠবৎ মধুর সঙ্গীত-তরঙ্গে ভাব-সমাধি লাভ করিতেন। নরেন্দ্রনাথের পিতাও পুত্রকে সঙ্গীত-চর্চ্চার জন্য বিশেষরূপে উৎসাহিত করিতেন।

বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথ নির্ভীক, তেজস্বী ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন, রাখিয়া ঢাকিয়া বলিবার প্রবৃত্তি তাঁহার আদৌ ছিল না। যাহার যাহা দোষ বা ত্রুটি, তাহা সেই ব্যক্তির মুখের উপর বলিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা তাঁহার হইত না। অন্যায়ের প্রতিবাদকল্পে স্বাধীন, নির্ভীক বালক

সর্ব্বদাই উদ্যত ছিলেন। শৈশব হইতে জীবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত এই সকল মহদ্‌গুণের অভাব কখনও তাঁহার হয় নাই। একবার একস্থানে অভিনয় হইতেছিল। আদালতের পেয়াদা সেই সময় রঙ্গমঞ্চের উপর আসিয়া প্রধান অভিনেতার হস্তে ওয়ারেণ্ট দিয়া বলিল যে, সে তাহাকে রাজার আদেশ অনুসারে গ্রেপ্তার করিতেছে। এইরূপ অপ্রত্যাশিত প্রতিবন্ধকতায় রঙ্গস্থল কোলাহল-মুখরিত হইয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। দৃঢ়স্বরে তিনি তখনই পেয়াদাকে অভিনয়-স্থল হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন; বলিয়া দিলেন, "যতক্ষণ পালা শেষ না হয়, বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্ গে। তার পর তোমার কাজ-করো। এখন রসভঙ্গ কর্‌বার কোন অধিকার তোমার নেই।" তেজস্বী বালকের কণ্ঠস্বরে সুর মিলাইয়া বহু কণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হইলে বেগতিক দেখিয়া পেয়াদা বাহিরে চলিয়া গেল।

কল্পনাশক্তি নরেন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রখরা ছিল। তিনি কল্পনার সাহায্যে শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমৎকৃত ও মুগ্ধ করিয়া গল্প শুনাইতে পারিতেন। বর্ণনাশক্তি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সহৃদয়তা, তেজস্বিতা, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সকল প্রকার গুণে প্রতিবেশিগণও নরেন্দ্রনাথের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। পল্লীর যে কোনও অন্তঃপুরে তাঁহার অবারিতদ্বার ছিল। শুদ্ধান্তঃপুরচারিণীদিগের কাহাকেও মাসী, কাহাকেও পিসী, কাহাকেও খুড়ী বা মামী অথবা দিদি ইত্যাদি মিষ্ট ও গৌরবজনক নামে তিনি সম্বোধন করিতেন। নিম্নশ্রেণীর রমণীদিগকেও মাসী পিসী বলিয়া ডাকিতে তাঁহার সঙ্কোচবোধ হইত না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত, স্নেহ করিত, প্রীতি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিত। তিনি সকলেরই সুখ-দুঃখের অংশভাগী, ব্যথার ব্যথী ছিলেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্বনাথবাবু মধ্যপ্রদেশের রায়পুর নামক স্বাস্থ্যকর স্থানে সপরিবারে বায়ু-পরিবর্ত্তন করিতে যান। নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন চতুর্দ্দশবর্ষ মাত্র। তখন তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন। বিশ্বনাথবাবুর বাসায় বহু পণ্ডিত ও বিদ্বান্ ব্যক্তি আসিতেন। নরেন্দ্রনাথ স্থিরভাবে বসিয়া তাঁহাদের আলোচনা শ্রবণ করিতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি সে সকল বিষয়ে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতেন। পিতৃবন্ধুগণ বালকের বুদ্ধিমত্তায় চমৎকৃত হইতেন। একদা আলোচনা-প্রসঙ্গে বহু প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের রচনা হইতে গদ্য ও পদ্য আবৃত্তি করিয়া নরেন্দ্রনাথ কোন পিতৃবন্ধুকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "কালে এই বালক বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে।" যাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের রচিত "বর্ত্তমান ভারত," "পরিব্রাজক," "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য," "ভাববার কথা" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, নরেন্দ্রনাথের পিতৃবন্ধুর এই ভবিষ্যদ্বাণী কত দূর সফল হইয়াছে।

নরেন্দ্রনাথ অধিকাংশকালই খেলাধূলায় যাপন করিতেন। নিয়মিত পাঠ আয়ত্ত করিতে এক ঘণ্টার অধিক সময় তাঁহার লাগিত না। বৎসরের অধিকাংশকালই আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করিয়া পরীক্ষার পূর্ব্বে দুই তিন মাস মাত্র তিনি মনোযোগ দিয়া অধ্যয়ন করিতেন। অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি তাহার অনুরাগ ছিল না। পিতার ন্যায় তিনিও উপহাস সহকারে বলিতেন, "অঙ্কশাস্ত্রটা দোকানদারের জুয়াচুরী বিদ্যা।" কিন্তু ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার পাঠস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী দেখা যাইত।

ষোড়শ বর্ষ বয়সে নরেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করেন। সমগ্র বৎসর পাঠ্যপুস্তক স্পর্শ করেন নাই। পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে এ জন্য তাঁহাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির

সহায়তায় অল্প চেষ্টাতেই তিনি সমুদয় বিষয় আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভের দুই তিন দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জ্যামিতি তিনি আদৌ পড়েন নাই। সেই সময় সমস্ত রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক চব্বিশ ঘণ্টায় জ্যামিতির চারিভাগ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সুদৃঢ় মন ও বলিষ্ঠ শরীর এবং অনন্যসাধারণ স্মৃতিশক্তির সহায়তাতেই তিনি এই অসাধ্যসাধন করিতে সমর্থ হন। নরেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সেবার তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনও ছাত্রই সেই বিদ্যালয় হইতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নরেন্দ্রনাথ পিতার নিকট হইতে একটি পকেট-ঘড়ী উপহার প্রাপ্ত হন।

বিশ্বনাথবাবু রন্ধনকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নরেন্দ্রনাথও রায়পুরে অবস্থানকালে পিতার নিকট হইতে নানাপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিলেন। রন্ধনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। সতীর্থগণকে কতবার তিনি স্বহস্ত-প্রস্তুত উপাদেয় ভোজ্য-দানে প্রীত করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ হইয়াও তিনি শিষ্যবর্গকে বিবিধপ্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইতেন। রন্ধনানুরাগ শেষ-জীবন পর্য্যন্ত সমভাবেই তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমতঃ নরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়া তিনি তদানীন্তন জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে ভর্ত্তি হয়েন। এই সময়ে তাঁহার ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিবার শক্তি সমধিক বর্দ্ধিত হয়। কোনও অধ্যাপকের বিদায় উপলক্ষে বাগ্মিবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বন্ধুবর্গের অনুরোধে নরেন্দ্রনাথ

বক্তৃতা করিতে উঠেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল তিনি ইংরাজী ভাষায় এমন সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে এই নবীন বক্তার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। এই ঘটনার বহুদিন পরে বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষে ইঁহার তুল্য বক্তা জন্মগ্রহণ করে নাই।" বাগ্মী হইতে গেলে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, নরেন্দ্রনাথে তাহার কোনটিরই অভাব ছিল না। সুললিত, সুগঠিত সুন্দর মূর্ত্তি, মধুর অথচ মেঘমন্দ্রবৎ কণ্ঠধ্বনি, বচন-বিন্যাসের অসাধারণ পারিপাট্য, আবৃত্তি-প্রণালীর মনোহারিত্ব সকলই তাঁহাতে অপর্য্যাপ্ত-পরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

কলেজে প্রবিষ্ট হইবার পর নরেন্দ্রনাথের অধ্যয়নানুরাগ বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থনিচয় তিনি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন। যেখানে কোনও সন্দেহ বা মতানৈক্য ঘটিত, অধ্যাপক বা সহপাঠিবর্গের সহিত সেই বিষয় সম্বন্ধে তর্ক করিয়া বিষয়টিকে বিশদ করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেন।

পঠদ্দশায় নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত কাব্যানুরাগী ছিলেন। ইংরাজকবি ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থকেই তিনি পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান করিতেন। সঙ্গীতে তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল, সে কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অভিনয় এবং নৃত্যেও তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। কেশবচন্দ্রের "নববৃন্দাবন" নাটক অভিনয়কালে নরেন্দ্রনাথ "যোগীর" ভূমিকা দক্ষতা সহকারে অভিনয় করিয়াছিলেন। নৃত্যেও তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। ললিত-কলার প্রতি ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বশতঃ নৃত্যকালে অঙ্গ-সঞ্চালনের লীলায়িত ভঙ্গীতে তিনি দর্শকমাত্রেরই হৃদয় অভিভূত করিয়া ফেলিতেন।

নিরানন্দ নরেন্দ্রের নিকটে ঘেঁষিতে পারিত না। সদানন্দ, স্ফূর্ত্তিময়, যুবক সহপাঠী ও বন্ধুবর্গের সহিত সর্ব্বদাই নির্দ্দোষ আনন্দে তিনি রত থাকিতেন। কোনও উৎসবক্ষেত্রে নরেন্দ্র না আসিলে উৎসবের আনন্দ যেন নিবিয়া যাইত।

কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি বেশভূষার পারিপাট্যের বিরোধী ছিলেন। ছাত্রগণের কাহাকেও বিলাসী বাবু দেখিলে, তিনি তাহার মুখের উপর কঠোরভাবে সমালোচনা করিতেন। পুরুষের ভাবভঙ্গীতে নারীজনোচিত দুর্ব্বলতাকে তিনি অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে করিতেন। এজন্য সহপাঠীরা তাঁহাকে যমের মত ভয় করিত। তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান গুণ ছিল—পবিত্রতা ও নির্ম্মলতা। তিনি আশৈশব ভীষ্মের ন্যায় চরিত্রবলে বলীয়ান্ ছিলেন। স্ত্রীলোকমাত্রকেই তিনি মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন। বালক নরেন্দ্রনাথ অথবা স্বামী বিবেকানন্দ পবিত্রতার ভাস্বর সূর্য্যসম দীপ্তিমান্ ছিলেন। তাঁহার নয়নে ও আননে চিরব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় শুকদেবের অপূর্ব্ব প্রভা বিকসিত হইত। নিত্য আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকিয়াও চরিত্রের নির্ম্মল পবিত্রতা মুহূর্ত্তের জন্যও নরেন্দ্র-নাথ হারান নাই। বহু শতাব্দী পরে এরূপ চরিত্রবান্ মানুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন।

ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নরেন্দ্রনাথ বি, এ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় তাঁহার অধ্যয়নস্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। সে অধ্যয়ন শুধু কলেজের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না; উপন্যাস, নাটক, সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতি তিনি নিয়মিতভাবে পাঠ করিতে ভালবাসিতেন। গণিতশাস্ত্র এবং গণিত-জ্যোতিষও বিশেষ যত্ন সহকারে আলোচনা করিতেন। এই সময় হইতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন

করিতে আরম্ভ করেন। কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক তাঁহার বিশ্লেষণী শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "জর্ম্মণী অথবা ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন-শাস্ত্রবিষয়ে এমন একটিও ধীমান্ ছাত্র দেখি নাই।" সংস্কৃত-ভাষাতেও নরেন্দ্রনাথের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। কিন্তু মাতৃভাষা বাঙ্গালার প্রতি তাঁহার অনুরাগের সীমা ছিল না।

বি, এ শ্রেণীতে অধ্যয়নকালেই তাঁহার মনোরাজ্যে একটা বিষম বিপ্লব সূচিত হয়। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রপাঠে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিতে লাগিলেন। হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়ামী তাঁহার চিত্তকে পীড়িত করিতে লাগিল। তখন বাঙ্গালাদেশে সংস্কারের আন্দোলন প্রবলভাবে চলিতেছিল। সেই সকল আন্দোলনের সহিত যুবক নরেন্দ্রনাথ ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হওয়ায়, তাঁহার চিন্তারাজ্যে এক অভিনব পরিবর্ত্তন দেখা গেল। নরেন্দ্রনাথ পুরোহিত-শ্রেণীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে, পুরোহিত-শ্রেণীর প্রভুত্ব সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ধর্ম্মজীবন বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক বিবেকানন্দ এই অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে—পুরোহিত-শ্রেণীর প্রভুত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সঙ্কল্প করিলেন। পাশ্চাত্য-দর্শনের প্রভাব তখন নরেন্দ্রনাথের মধ্যে পূর্ণভাবে আধিপত্য করিতেছিল। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিরাগবুদ্ধি হেতু তখন তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

হেগেল, শোপেনহায়ার, মিল, ক্যাণ্ট প্রভৃতির মতবাদের দ্বারা তিনি জীবনকে কিয়ৎপরিমাণে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। সে অবস্থায় স্পেন্সারকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছিলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ও পুরোহিতদিগের সংকীর্ণতা দেখিয়া

তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু সাধারণ নীতিকে মানিয়া না চলা যে ঘোরতর অপরাধ ও পাপ, ইহা তিনি বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। ব্যবহারিক জীবনের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। হৃদয়ের নির্দ্দেশকে তিনি উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। হৃদয়বৃত্তির প্রেরণার ফলে তিনি সেই সময় হইতেই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে লাগিলেন। ভোগ-বিলাসে অনাস্থা, বিধবার ন্যায় শুভ্রবস্ত্র পরিধান, ভূমি-শয্যায় শয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে তিনি সংযমের পরিচয় দিতে লাগিলেন। হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে ত্যাগের প্রবাহ ভরিয়া উঠিতে লাগিল, সে প্রবাহের গতিরোধে তিনি বিন্দুমাত্র বাধা দিলেন না।

শৈশবকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথ ধ্যান-ধারণার অনুরাগী ছিলেন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কখনও কখনও সমস্ত রাত্রিই অতিবাহিত হইত। নিজের বাড়ী বহু লোকসমাগমে সর্ব্বদা কোলাহল মুখরিত থাকিত, বলিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী একটি নির্জ্জন বাড়ীর ক্ষুদ্র দ্বিতল কক্ষে একাকী বাস করিতেন। নির্জ্জনে পাঠাভ্যাসের বিশেষ সুবিধা হইত। দৈনিক পাঠ যতক্ষণ না আয়ত্ত হইত, তাবৎ সে কক্ষ ত্যাগ করিতেন না। ঘরের ভিতর পড়িতে বসিয়া পায়ে দড়ী বাঁধিয়া রাখিতেন। নিদ্রাকর্ষণ হইলে পায়ের দড়ীতে টান পড়িত, অমনই ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। এ কক্ষে বিলাসিতার কোনও বস্তু ছিল না। একখানি কম্বল মাত্র তাঁহার শয়নের শয্যা।। তিনি নিরামিষ আহার করিতেন।

নরেন্দ্রনাথ যে বৎসর এফ-এ পরীক্ষা দেন, পরমহংসদেবের সহিত সেইবার তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। পরমহংসদেবের এক শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ মিত্র; নরেন্দ্রনাথের পল্লীতেই তাঁহার বাস। তাঁহার

গৃহে একদিন পরমহংসদেবের শুভাগমন হয়। ধর্ম্মসঙ্গীত শ্রবণে পরমহংসদেব পরম প্রীতিলাভ করিতেন। তাই নরেন্দ্রনাথকে গান গায়িবার জন্য স্নুরেন্দ্র বাবু নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। নরেন্দ্রনাথের মধুর সঙ্গীতে পরমহংসদেব সমাধিস্থ হন। তার পর নরেন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাইবার জন্য শিষ্যবৃন্দকে বলিয়া যান।

এফ-এ পরীক্ষার পর নরেন্দ্রনাথকে বিবাহের জন্য তাঁহার পিতা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। ভাবী শ্বশুর জামাতাকে দশসহস্র মুদ্রা যৌতুকস্বরূপ দিতে প্রতিশ্রুতও ছিলেন। কিন্তু বিবাহে স্পৃহাহীন, আজন্মসন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথ দার-পরিগ্রহে ঘোরতর আপত্তি জানাইলেন। পুত্রের স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিতাও কোন কাজ করিতে সম্মত ছিলেন না। দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় ডাক্তার রামচন্দ্র মহাশয়ের নিকট নরেন্দ্র নিজের মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। রামচন্দ্র পরমহংসদেবের অন্যতম শিষ্য। তিনি নরেন্দ্রনাথকে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার উপদেশ দিলেন। তদনুসারে তিনি কয়েকজন বন্ধু সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

নরেন্দ্রনাথকে দেখিবামাত্র পরমহংসদেব চিরপরিচিতের ন্যায় তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। একান্তে ডাকিয়া লইয়া তিনি এমনই ভাবে কথা বলিতে লাগিলেন যে, তিনি যেন দীর্ঘকাল নরেন্দ্রের প্রতীক্ষায় কালযাপন করিতেছেন। তাঁহার আনন্দাশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি, সরল প্রাণের অভিব্যক্তি এবং ভগবদ্ভক্তি দর্শনে নরেন্দ্রনাথ চমৎকৃত ও অভিভূত হইলেন। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ সরলতা দর্শনে যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথের মনে একটা সংশয়ের উদ্রেক হইল। তাঁহার হাবভাব, চালচলন, কথাবার্ত্তায় বিন্দুমাত্র প্রলাপের চিহ্ন নাই, অথচ তাঁহার সহিত নির্জ্জনে যে ব্যবহার করিলেন, তাহা ত তখনকার নরেন্দ্রনাথের নিকট ঠিক স্বাভাবিক বলিয়া অনুমিত

হয় নাই। একবার তাঁহার মনে হইল, ভগবান্ ভগবান্ করিয়া বোধ হয় ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে। যাহা হউক, নরেন্দ্রনাথ পরমহংস-দেব সম্বন্ধে একটা ভাল ধারণা করিয়া সে যাত্রা গৃহে ফিরিলেন।

এই ঘটনার পর হইতে তিনি মাঝে মাঝে পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিয়া দিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে পরম স্নেহে ও আদরে আহ্বান করিতেন, কাছে বসাইয়া গান শুনিতেন এবং নির্জ্জনে অনেক কথা বলিতেন। নরেন্দ্রনাথ এ সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সমাজে গিয়া নিয়মিত ধ্যান-ধারণা করিতেন। পৌত্তলিকতার উপরও তাঁহার বিশ্বাস তখন আদৌ ছিল না। একদিন তিনি তাঁহার অন্যতম সহচর রাখালচন্দ্র ঘোষকে (পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ) কালী-প্রণাম করিতে দেখিয়া তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তিরস্কার করেন। কারণ, রাখালচন্দ্র তাঁহার ন্যায় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। ইহাতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বলেন যে, "ওর যদি সাকারে ভক্তি থাকে, তা হ'লে ও কি কর্‌বে? তোমার ভাল না লাগে, তুমি করো না। কিন্তু অন্যকে বাধা দিবার তোমার কি অধিকার আছে?" এই ব্যাপারে বুঝা যায় যে, নরেন্দ্রনাথের আন্তরিকতা কতই গভীর। তিনি যখনই যাহা করিতেন, গভীর আন্তরিকতা সহকারে, কায়মনোবাক্যে তাহা সাধনে যত্নবান্ থাকিতেন। এই ঘটনা হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তখন তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়।

নরেন্দ্রনাথ নিরাকার ধ্যানেরই ভক্ত ছিলেন। পরমহংসদেবও তাঁহাকে সেই ভাবেরই উপদেশ দিতেন। জোর করিয়া সাকার উপাসনায় বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা তাঁহার ছিল না; ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতেও তাঁহাকে নিষেধ করেন নাই। ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রথমাবধিই ধারণা জন্মিয়াছিল যে,

কালে এই যুবক ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারিবে। পাশ্চাত্য-সভ্যতা-বিমুগ্ধ, পথভ্রষ্ট দেশবাসীকে স্বদেশে স্বধর্ম্মে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে। জগন্মাতার বিশেষ কার্য্য-সিদ্ধির জন্য নরেন্দ্রনাথ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন—এইরূপ ভাবের কথা ঠাকুরের মুখে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াও নরেন্দ্রনাথ নিজে তাহা বিশ্বাস করিতেন না। একদিন ভাবসমাধি-লাভের পর ঠাকুর যখন বলিলেন, "কেশব যে শক্তিবলে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, ঐরূপ আঠারোটা শক্তি নরেন্দ্রের মধ্যে আছে," তখন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "আপনি কি বল্‌ছেন, কোথায় বিশ্ববিখ্যাত কেশবচন্দ্র, আর কোথায় স্কুলের নগণ্য একটা ছোঁড়া—লোকে শুন্‌লে আপনাকে পাগল বল্‌বে যে।" পরমহংসদেব সে কথার উত্তরে হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "তা কি কর্‌বো বল, মা যে দেখিয়ে দিলেন।"

ঠাকুরের এই সকল অদ্ভুত-দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে তখনও নরেন্দ্রনাথের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মে নাই। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত মতের সহিত পরিচয় লাভ করার ফলে তিনি পরমহংসদেবের অনন্য-সাধারণ দর্শন প্রভৃতিকে মস্তিষ্কবিকার ও খেয়াল বলিয়া ভাবিতেন। ঐ সম্বন্ধে তিনি অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সহিত ঘোরতর তর্ক করিতেন। তর্কে কেহই নরেন্দ্রনাথকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না।

এ দিকে হিন্দু সমাজের বিশৃঙ্খলা ও অবনতি দর্শনে তাহার সংস্কার সাধন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরূপে সমবয়স্কাদিগের নিকট অগ্নিময়ী বাণীর সাহায্যে সেই সংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। দীর্ঘকালের সঞ্চিত আবর্জ্জনা হিন্দুসমাজের বিরাট প্রাঙ্গণতলে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে দেখিয়া, স্বদেশপ্রেমিক নরেন্দ্রনাথের

হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তবে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ সংস্কারের যে উপায় ও পথের নির্দ্দেশ করিতেছিলেন, নরেন্দ্রনাথের মত ও উপায় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বিনাশমূলক সংস্কার অপেক্ষা গঠনমূলক সংস্কারেরই পক্ষপাতী। অন্তরে অন্তরে তিনি আপনাকে হিন্দু বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন, তবে সমাজের বর্ত্তমান সংকীর্ণতার পক্ষপাতী ছিলেন না। উদাব হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কালধর্ম্মের প্রভাবে যে সকল সংকীর্ণতা ক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সংস্কার করিয়া জাতীয়ভাবে দেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিবার কল্পনা তাঁহার মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

ব্রাহ্ম-সমাজের প্রধান নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, চিরঞ্জীব বাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মগণ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের নিকট তত্ত্বকথা শুনিতে গিয়া অনেকাংশে তাঁহাদের ধর্ম্মমতকে পরিবর্ত্তিত করিয়া আনিয়াছিলেন। বহু মনীষী ব্রাহ্ম সে সময় দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরের নিকট বসিয়া ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা শুনিতেন। এইরূপে ধর্ম্মকথা আলোচনা করিতে করিতে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ও যখন পূর্ব্ব-অবলম্বিত ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের সকল বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তখন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রি-প্রমুখ ব্রাহ্মনেতৃগণ মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা তখন ব্রাহ্ম-সমাজস্থ সকলকেই বুঝাইয়া দিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া নিরাপদ নহে। শাস্ত্রী মহোদয় নরেন্দ্রনাথকেও বুঝাইলেন যে, ভাবসমাধি প্রভৃতি কিছুই ফলপ্রসূ নহে। অতিরিক্ত দৈহিক কঠোরতা অবলম্বন করাতে পরমহংসদেবের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে। স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্যই ভাবসমাধি বা মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। নরেন্দ্রনাথ নীরবে শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা শুনিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার

মনের সংশয় দূর হইল না। এমন সরল উদার, নিষ্কাম ভালবাসা, অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, এ সকল কি বিকৃত-মস্তিষ্কের ফল?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত নরেন্দ্রনাথ বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। মহর্ষির বিশ্বাস ছিল যে, কালে এই যুবক অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিবে। এজন্য তিনি নরেন্দ্রনাথকে ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে বহুবিধ উপদেশ দিতেন। নরেন্দ্রনাথ উপাসনা, প্রার্থনা, ধ্যান-ধারণা করিয়াও হৃদয়ে শান্তি পাইতেন না। কিছুতেই তাঁহার হৃদয়ে পরমানন্দ জনিত তৃপ্তি জন্মিত না। একদা ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া অধীরভাবে তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন ভাগীরথী-বক্ষে বজরায় অবস্থান করিতেন। নরেন্দ্রনাথ গঙ্গাতীরে গিয়া সেই বজরায় আরোহণ করিলেন নরেন্দ্রের প্রশ্নে দেবেন্দ্রনাথের ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। আবেগবিহ্বলচিত্তে নরেন্দ্রনাথ অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কি নিজে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন?" মহর্ষি তাহার সদুত্তর না দিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ভগবৎ-সক্ষাতকার লাভ করা সহজে হইতে পারে না; তবে যত্নের ফল পরে ফলিতে পারে। যোগীদিগের ন্যায় গভীর ভাবময় দৃষ্টি নরেন্দ্রের নয়নে পরিলক্ষিত হইতেছে, উপযুক্ত ধ্যান-ধারণা করিলে কালে নরেন্দ্রনাথের ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইবে।

এ উত্তরে নরেন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। মহাশক্তিশালী, ধর্ম্মপ্রাণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও যখন ভগবদ্দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই, তখন কে আর তাঁহাকে সে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে পারে? কে তাঁহাকে বলিয়া দিবে যে, এইরূপেই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়? নরেন্দ্রনাথ সংশয়ান্দোলিত-হৃদয়ে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বহু

ধর্ম্মাচার্য্যকে ঐরূপ প্রশ্ন করিয়া কোনও সদুত্তর পান নাই। নরেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কি ঈশ্বরের দর্শন পাইয়াছেন?" অপূর্ব্বহাস্যে মহাপুরুষের প্রশান্ত মুখমণ্ডল অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। ঠাকুর অসঙ্কোচে বলিলেন, "হাঁ বৎস, আমি ঈশ্বরকে দেখিয়াছি। তোমাকে যেমন দেখিতেছি, ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতরভাবে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি।" বিস্মিত, বিমুগ্ধ নরেন্দ্রনাথকে নিরক্ষর ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তুমি দেখিতে চাও যদি, তোমাকেও দেখাইতে পারি, তবে আমি যেমন যেমন বলিব, সেইরূপ কাজ করিতে হইবে।"

অতঃপর একদিন নরেন্দ্রনাথের সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিতে করিতে পরমহংসদেব দক্ষিণপদ দ্বারা তাঁহার স্কন্ধদেশ স্পর্শ করেন। স্পর্শমাত্রেই নরেন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন যে, নিখিল বিশ্বের সমুদয় পদার্থই ঘুরিতে ঘুরিতে মহাশূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে, তাঁহার 'আমিত্ব' যেন বিলুপ্ত হইতে চলিল। নরেন্দ্রনাথ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া বলিলেন, "ওগো, আমায় এ কি কর্‌লে, আমার বাপ-মা যে আছেন।" তখন ঠাকুর মৃদুহাস্যে তাঁহার বক্ষস্পর্শ করিতেই নরেন্দ্রনাথ প্রকৃতিস্থ হন। এই ব্যাপারে নরেন্দ্রের মনে প্রথমতঃ সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, হয় ত উহা সম্মোহন-বিদ্যার ফলমাত্র। আর একদিন ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ মাত্রেই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এবার নরেন্দ্রনাথ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি কোনমতেই তিনি পরমহংস-দেবের স্পর্শের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তবে প্রথমবারের মত এ যাত্রা তিনি আতঙ্কে অভিভূত হন নাই; শুধু সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় প্রশ্নাদির দ্বারা নরেন্দ্রনাথের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরমহংসদেব সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াছিলেন।

ধীরে ধীরে নরেন্দ্রনাথের অন্তরে পরিবর্ত্তন আসিতেছিল। পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠে তাঁহার হৃদয়ে ভগবৎসম্বন্ধে যে ধারণা জন্মিয়াছিল, দক্ষিণেশ্বরের "পাগ্‌লা ব্রাহ্মণ" ক্রমে তাহার সমস্তই ওলটপালট করিয়া দিতে লাগিলেন। অক্ষর-জ্ঞানশূন্য ব্রাহ্মণের মুখে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বড় বড় তত্ত্বকথা, জটিল সমস্যা-সমাধানের সরল যুক্তি শুনিয়া শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইতেছিলেন। ভগবান্‌কে ইনি দর্শন করিয়াছেন, অন্যকেও দেখাইতে পারেন, গোঁড়া হিন্দুর মত আচার-ব্যবহার অথচ উদারতার তুলনা নাই। শ্রীশ্রীকালী-প্রতিমাকে গর্ভধারিণী জননীর ন্যায় জ্ঞান করেন, দিবানিশি তাঁহার সহিত কথা বলেন, আব্দার করেন, স্পর্শমাত্রেই যে কোন ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করিতে পারেন, অথচ অভিমান নাই, অহঙ্কার নাই, শিশুর ন্যায় সরল ও মধুর প্রকৃতি! জীবের দুঃখে কাতর, মানুষকে তত্ত্বকথা শুনাইতেই আনন্দ। নরেন্দ্রনাথ ক্রমেই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর এমনই ভালবাসিতেন যে, একদিন না গেলেই তিনি "নরেন নরেন" করিয়া অস্থির হইয়া উঠিতেন। নরেন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি অনন্যসাধারণ শক্তির সঞ্চার দেখিতে পাইয়াছিলেন। অনেক সময় নরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট না গেলে, তিনি গাড়ী ভাড়া করিয়া তাঁহাকে স্বয়ং দেখিতে যাইতেন।

নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে পরমহংসদেবের কার্য্যকলাপ ও কথা বুঝিবার চেষ্টা করিতেন। পরমহংসদেবের প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক কথা, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেন; কার্য্যে ও বাক্যে সামঞ্জস্য আছে কি না, তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নরেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া

বিচার সহকারে তাঁহার কার্য্যকলাপের বিশ্লেষণের পর তবে তিনি ঠাকুরের চরণাশ্রয়ে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে নরেন্দ্রনাথ বি, এ পরীক্ষা দেন। এই সময়েই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। সেদিন তিনি বরাহনগরে বন্ধু-গৃহে গীতবাদ্য করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তিনি সংবাদ পাইলেন যে, হৃদ্‌রোগে তাঁহার পিতার আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে। শোকার্ত্ত নরেন্দ্রনাথ অধীর হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

এই ঘটনার পর হইতে দারুণ অর্থকষ্টে নরেন্দ্রনাথকে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। বিশ্বনাথবাবু অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিলেও কিছুই সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই; বরং কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর সংসার প্রতিপালন করা নরেন্দ্রনাথ ও তদীয় জননী ভুবনেশ্বরীর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল। পিতৃশোকাতুর নরেন্দ্রনাথ জননীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, একটা কিছু উপায় নিশ্চয়ই হইবে। নিদারুণ দুর্দ্দশার সময় পুত্রের হৃদয়ের বল দেখিয়া মাতা অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে প্রকৃত অন্নকষ্ট আরম্ভ হইল। নরেন্দ্রনাথ তখন বি, এল পড়িতেছিলেন। অর্থাভাবে দীনদরিদ্রের ন্যায় কলেজে যাইতেন। কোথাও যাইতে হইলে পদব্রজেই যাইতে হইত। গাড়ীভাড়া জুটিত না। যে সকল গাড়োয়ান পূর্ব্বে তাঁহার নিকট বক্‌শীস্ পাইয়াছে, তাহারা কখনও কখনও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বিনা ভাড়ায় তাঁহার গন্তব্যস্থলে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত; কিন্তু তেজস্বী পুরুষসিংহ কাহারও অনুগ্রহ-গ্রহণে সম্মত ছিলেন না।

জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা নরেন্দ্রনাথ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলেন। সুযোগ বুঝিয়া পিতৃ-অন্নে পুষ্ট আত্মীয়-স্বজন সকলেই সরিয়া

দাঁড়াইলেন, অধিকন্তু কোনও জ্ঞাতি তাঁহাদিগকে গৃহচ্যুত করিবার জন্য মোকদ্দমাও উপস্থিতকরিলেন। প্রাণাধিক ভ্রাতা ও ভগিনীগণের অনশনক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের সদাপ্রফুল্লহাস্যময় আননে অনেক সময় নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিত। অন্যত্র নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া মধ্যে মধ্যে তিনি গৃহে আহার করিতেন না। কারণ, তাঁহার অংশের আহার্য্য দ্বারা ভ্রাতৃ-ভগিনীদিগের ক্ষুধার কষ্ট কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইবে। অথচ কোন বন্ধুর গৃহেও তিনি আহার করিতেন না। ক্রমাগত উপবাসে তাঁহার শরীর ক্রমে শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। এমন কি বলবতী ক্ষুধার তাড়নায় কোনও কোনও দিন তিনি মূর্চ্ছিতবৎ পড়িয়া থাকিতেন। কতিপয় সহৃদয় বন্ধু তাঁহার বিপদের অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহাকে অর্থ-সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু আত্মনির্ভরশীল নরেন্দ্রনাথ সবিনয়ে সে সকল সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিতেন। কাহারও দান তিনি গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলেন না। আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান তাঁহার কিরূপ প্রবল, তাহা সেই সকল বন্ধু অবগত ছিলেন, এজন্য তাঁহারা মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করিতেন। কিন্তু সংসারের দুঃখময় চিত্র মনে করিয়া, অনশনক্লিষ্ট মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের মুখচ্ছবি মনে করিয়া অনেক সময় নরেন্দ্রনাথ সে নিমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করিতেন। তিনি উদরপূর্ত্তি করিয়া রসনা-তৃপ্তিকর আহার্য্য ভোজন করিবেন, আর তাঁহার প্রিয়তম, স্নেহভাজন কনিষ্ঠগণ তাহাতে বঞ্চিত থাকিবে?

চাকরী করিয়া সংসারের দুঃখ ঘুচাইবার জন্য নরেন্দ্রনাথ প্রাণপণে চেষ্টাও করিতে লাগিলেন, কিন্তু সহসা কোন উপায় হইল না। মোটা গুণ-চটের মত বস্ত্র পরিয়া নগ্নপদে অনশনক্লিষ্ট নরেন্দ্রনাথ মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড রৌদ্রে দরখাস্ত হস্তে আপিসে আপিসে ঘুরিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও কোনরূপ

আশ্বাসের সংবাদ পাইলেন না। এই সময় সংসারটাকে যেন আসুরিক সৃষ্টি বলিয়া তাঁহার ধারণা হইত। সময় বুঝিয়া অবিদ্যারূপিণী মহামায়াও তাঁহাকে করায়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। এক সঙ্গতিশালিনী পূর্ব্ব হইতেই নরেন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। অবসর বুঝিয়া তিনি প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার সুখ-দুঃখের অংশভাগী হইলে নরেন্দ্র তদীয় বিপুল সম্পত্তির দ্বারা সাংসারিক সমুদয় অনটন ঘুচাইতে পারিবেন। আজন্ম ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় নরেন্দ্রনাথ নিদারুণ অবজ্ঞা সহকারে সেই ঘৃণিত প্রস্তাবে উপেক্ষা করেন। কয়েকজন ধনীর পুত্র তাঁহাকে সুরাপানে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিল; বারাঙ্গনা দ্বারা তাঁহাকে সুপথ-ভ্রষ্ট করিবার আয়োজনও হইয়াছিল। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ অবিচলিতভাবে এই সকল কঠোর পরীক্ষায় অবহেলায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

মাসের পর মাস চলিয়া গেল, তথাপি সংসারিক অভাব দূর করিবার উপযুক্ত সামান্য বেতনের চাকরীও নরেন্দ্রনাথের ভাগ্যে জুটিল না। একদিন উপবাসে অবসন্ন-দেহে তিনি বৃষ্টিতে ভিজিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন; সহসা অসহনীয় ক্লান্তিবশতঃ তিনি পথিপার্শ্বস্থ কোনও বাড়ীর রকের উপর বসিয়া পড়িলেন। সেই সময়ে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার বাহ্য-চৈতন্য ছিল না। ঈশ্বরের ন্যায়পরতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য সম্বন্ধে এতদিন তিনি যাহা মীমাংসা করিতে পারেন নাই, সেই দিন অকস্মাৎ অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। পরক্ষণেই অমিত শক্তিলাভ করিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসেন। নরেন্দ্রনাথ যখন বিবেকানন্দ নামে দেশপ্রসিদ্ধ হন, সেই সময় তিনি গুরুভ্রাতাদের নিকট নিজের এই উপলব্ধ জ্ঞানের কথা প্রকাশ করেন।

সংসার চালাইবার জন্য দিন কয়েক নরেন্দ্রনাথ "ফ্রি মেশন" দলে মিশিয়াছিলেন, কয়েক মাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে শিক্ষকতাও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

বিবাহ করিলে নরেন্দ্রনাথ অনায়াসে সংসারের দারিদ্র্যকে কিয়ৎ-পরিমাণে জয় করিতে পারিতেন ; কিন্তু সে দিকে তিনি ভ্রমেও মন দিলেন না। জ্ঞাতিদিগের মধ্যে যিনি তাঁহাকে ভদ্রাসনচ্যুত করিবার জন্য মোকদ্দমা করিতেছিলেন, আপোসে তাঁহার সহিত নিষ্পত্তি করিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ প্রথমতঃ চেষ্টার ক্রটি করেন নাই, কিন্তু জ্ঞাতির লুব্ধদৃষ্টি যখন কিছুতেই তৃপ্ত হইবার নহে বুঝিলেন, তখন আহত সিংহের ন্যায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়াইলেন। অনেকদিন ধরিয়া মোকদ্দমা চলিয়াছিল, ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় আরম্ভ হইয়া তাঁহার তিরোভাবের পরও কিছুকাল মোকদ্দমা হইতে থাকে। পরিণামে বিশ্বনাথ বাবুর পরিবারবর্গের তাহাতে কিছু সুবিধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু খরচার দায়ে তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।

দারিদ্র্যদুঃখে নিপীড়িত হইয়া একদিন নরেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবের শরণাপন্ন হন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেই একটা উপায় করিয়া দিতে পারেন। ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি ধরিয়া বসিলেন, একটা উপায় তাঁহাকে করিয়া দিতেই হইবে, সাংসারিক দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। পরমহংসদেব বলিলেন, "টাকাপয়সার জন্য আমি মাকে বল্‌তে পার্‌বো না। তুই নিজে গিয়ে মাকে বল।" নরেন্দ্রনাথ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি চিরদিন নিরাকারবাদী। দেবদেবীতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু যখন পরমহংসদেব দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,

"তুই নিজে যা, মার কাছে যা চাইবি, তাই পাবি।" তখন নরেন্দ্রনাথ মাতার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

তিনি দেখিলেন, যাঁহাকে পাষাণময়ী বলিয়া এতদিন তাঁহার জ্ঞান ছিল, আজ যেন চৈতন্যরূপিণী, জীয়ন্ত দেবী; অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী করুণাময়ী বিশ্বজননীর মধুরহাস্যে ঘর যেন আনন্দে, আলোকে ভরিয়া উঠিয়াছে। ভক্তির সমুদ্র নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে আলোড়িত হইয়া উঠিল। বরাভয়দাত্রী, স্নেহময়ী জগজ্জননীর সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়া নরেন্দ্রনাথ বিবেক, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। অর্থ, মান ও প্রতিপত্তির কথা তখন তাঁহার মনে উদিতও হইল না। মাতৃদর্শন করিয়া নরেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবের নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, মার কাছে বলেছিস্ ত?" নরেন্দ্রনাথের চমক ভাঙ্গিল, তিনি স্বীকার করিলেন যে, দারিদ্র্য-দুঃখ অবসানের জন্য ধনরত্নের কথা তিনি মার কাছে বলিতে পারেন নাই। পরমহংসদেব আবার তাঁহাকে কালীমাতার মন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু প্রার্থনাকালে নরেন্দ্রনাথের ঐহিক কোনও বিষয়েরই কথা মনে পড়িল না। এইরূপে তিনবার তিনি পরমহংসদেবের দ্বারা ভবতারিণীর মন্দিরে প্রেরিত হইলেন, কিন্তু একবারও সুখৈশ্বর্য্যের কথা তিনি মাতৃচরণে নিবেদন করিতে পারিলেন না। তখন ঠাকুর বলিলেন, "তুই যখন চাইতেই পার্‌লি না, তখন তোর অদৃষ্টে সংসারের সুখ নেই, তবে মোটা ভাত-কাপড়ের কোন দিন তোদের অভাব হবে না।" নরেন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হইলেন।

এই সময় হইতে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত একপ্রকার সমুদয় সংস্রব ত্যাগ করেন। অধ্যয়ন পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু সংসারের দিকে তাঁহার আকর্ষণ হ্রাস পাইল। পিতার জীবদ্দশায় তিনি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন, এখন হইতে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিলেন। মাতা ভুবনেশ্বরী পূর্ব্ব হইতেই পুত্রের সংসার-বৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন, ক্রমে তাঁহার ধারণা জন্মিল যে, হয় ত পুত্র একেবারেই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে জননী কোনরূপ প্রশ্ন করিলে নরেন্দ্রনাথ সে প্রশ্নের কোনও স্পষ্ট উত্তর দিতেন না বটে, তবে মাতাকে তিনি দুঃখের কবলে নিক্ষেপ করিয়া শীঘ্র কোথাও যাইবেন না, ইহা তাঁহার ব্যবহারে বেশ বুঝা যাইত। জননী তাঁহাকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিলে নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। পিতার মৃত্যুর পর তিন বৎসর তিনি গৃহে বাস করিয়াছিলেন, তার পর তিনি ধীরে ধীরে সংসারের মোহপাশ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে গিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেবের গলায় ক্ষতরোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় কাশীপুরের বাগানে তাঁহাকে আনয়ন করা হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ তখন হইতে বাড়ী ছাড়িয়া গুরুদেবের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। সংসার ত্যাগ করিলেও নরেন্দ্রনাথ একেবারে বাটীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন না। মাঝে মাঝে তিনি গৃহে যাইতেন। জননীর পদধূলি-রঞ্জিত গৃহ-প্রাঙ্গণটি তাঁহার নিকট পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া অনুভূত হইত। মাকে তিনি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন, ভক্তি করিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন।

প্রথম হইতেই নরেন্দ্রনাথ দার্শনিক ছিলেন ; ভক্তির দিক্ দিয়া ঈশ্বরকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেন না। পরমহংসদেবের সংস্রবে আসিয়া ক্রমে তিনি ভক্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে জ্ঞানরাজ্যের দ্বার মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝিলেন, অদ্বৈততত্ত্বই পরম ও চরম সত্য। পরমহংস-দেবকেই বেদান্তাদি শাস্ত্রের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ তাঁহার দৃঢ়প্রতীতি জন্মিল।

কাশীপুরের উদ্যানে পরমহংসদেব সন্নিধানে অনবরত অবস্থানকালে এই জ্ঞান তাঁহার মধ্যে পরিণতি লাভ করে। ক্রমে এমন হইয়াছিল, খোল-করতাল লইয়া তিনি সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিতেন এবং হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতেন। এই সময়ে সত্যলাভের জন্য তাঁহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, অন্তরে তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। রজনীযোগে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী-বনে বসিয়া ধুনি জ্বালাইয়া তিনি সাধনা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের অবস্থা এবং সাধনানুরাগ দর্শনে আনন্দিত হইয়া একদিন তাঁহাকে স্বোপার্জ্জিত অষ্টৈশ্বর্য্যলাভের ফলদানে উদ্যত হইলেন; বলিলেন, "সাধনকালে আমি পেয়েছিলুম, কোন দিন তা কাজে লাগে নি। তুই নে, তোর অনেক কাজে লাগ্‌তে পারে।" নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওতে ভগবান্‌কে লাভ কর্‌বার কোন সুবিধে হবে কি?" ঠাকুর যখন বুঝাইয়া দিলেন যে, "তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; তবে ইহার সাহায্যে ঐহিকের কোন বাসনাই অপূর্ণ থাকিবে না।" তখন ত্যাগধর্ম্মের অবতার নরেন্দ্রনাথ উহা ত্যাগ করিলেন।

কাশীপুরের বাগানে অবস্থানকালে একদা নরেন্দ্রনাথ কাহাকেও কিছু না বলিয়া দুইজন গুরুভ্রাতা সহ বুদ্ধগয়ায় চলিয়া যান। পরদিবস তাঁহাকে না দেখিয়া সকলেই চিন্তিত হইলেন, কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণ মধুর হাস্যে সকলকে উৎকণ্ঠিত হইতে নিষেধ করিলেন; বলিলেন, "সে ফিরে এলো ব'লে, তার জন্যে কেউ চিন্তা করো না। এ জায়গা ছেড়ে তার থাকবার যো নাই।"

বুদ্ধগয়ায় গিয়া যেখানে বোধিসত্ত্ব সমাধিস্থ হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, সেই বোধিদ্রুমমূলে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ ধ্যানস্থ হন। ক্রমাগত তিন দিন কঠোর তপস্যায় যাপন করিয়া তিনি কাশীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বুদ্ধগয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, যে ধর্ম্ম পিপাসা লইয়া তিনি অধীরভাবে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন, সে পিপাসা নিবারণের সুশীতল বারি পরমহংসদেবের কৃপা ভিন্ন লাভের সম্ভাবনা নাই। তখন হইতে তিনি একান্তমনে গুরুদেবের শরণাপন্ন হইলেন। পরমহংসদেবও তাঁহাকে বিভিন্ন প্রকার সাধনা ও আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্য দিয়া ধর্ম্মজীবনের চরমাদর্শের অভিমুখে লইয়া যাইতে লাগিলেন। একদিন নরেন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন যে, তিনি স্পর্শ মাত্রেই অন্যের ভাবরাজ্যের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। পরীক্ষাচ্ছলে তিনি জনৈক গুরুভ্রাতাকে স্পর্শ করিতেই ধ্যানমগ্ন সেই গুরুভ্রাতার মনোরাজ্যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। পরমহংসদেব এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া নরেন্দ্রনাথকে ঐরূপ শক্তি প্রয়োগ করিতে নিষেধ করেন। পরে কি উপায়ে ঐ শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাও তাঁহাকে শিখাইয়া দেন।

একদিন পরমহংসদেব কথাপ্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথকে বলেন, "কেউ কেউ আমায় ঈশ্বর বলে।" নরেন্দ্র উত্তরে বলেন, "হাজার লোকে ঈশ্বর বলিলেও আমার যতক্ষণ সত্য বলিয়া বোধ না হইবে, ততক্ষণ আমি কিছুই বলিব না।"

কাশীপুরের বাগানে অবস্থানকালে নরেন্দ্রনাথ পুনঃ পুনঃ নির্ব্বিকল্পসমাধিলাভের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে বলেন, "ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা? বিশাল বটগাছের মত তুই লক্ষ লক্ষ জীবকে ছায়া দান করবি, না শুধু তুই নিজের মুক্তি চাস্?"

ঠাকুরের ইঙ্গিত নরেন্দ্রের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়াছিল। একদিন তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিও লাভ করিয়াছিলেন। সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া তিনি

গুরুদেব-সন্নিধানে আগমন করিলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কেমন, মা তোকে ত আজ সব দেখিয়ে দিলেন? চাবী কিন্তু আমার কাছে রইল। এখন তোকে কাজ কর্‌তে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে, তখন আবার চাবী খুলে দেব।"

নরেন্দ্রনাথের ধ্যানের অবস্থা এখন সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। একদিন সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথ উভয়ে এক বৃক্ষতলে ধ্যানে বসিয়াছিলেন। মশকের ভীষণ উৎপাতে গিরিশচন্দ্র চিত্ত স্থির করিতে না পারিয়া চাহিয়া দেখিলেন, নরেন্দ্রনাথ সমাধিমগ্ন। তাঁহার শরীরে এত মশক বসিয়াছে যে, যেন একখানি কৃষ্ণবর্ণের কম্বল দ্বারা তাঁহার শরীর সমাচ্ছাদিত। গিরিশচন্দ্র পুনঃপুনঃ তাঁহাকে ডাকিয়াও উত্তর পাইলেন না; পরে তাঁহার আসন ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের চৈতন্যশূন্য দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে নরেন্দ্রনাথের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে।

দেহ-রক্ষার কয়েকদিবস পূর্ব্বে পরমহংসদেব প্রত্যহ প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে সন্ধ্যার সময় ডাকিয়া নির্জ্জনে ভবিষ্যৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ দান করিতেন। নরেন্দ্রনাথও বুঝিয়াছিলেন, ঠাকুর আর বেশী দিন মর্ত্তাধামে বিরাজ করিবেন না। এজন্য তিনিও শোকাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। একদিন ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কাছে বসাইয়া একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। নরেন্দ্রনাথ পরে বলিয়াছিলেন যে, সেই সময় তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, পরমহংসদেবের শরীর হইতে একটা সূক্ষ্মতেজ নির্গত হইয়া তাঁহার দেহে প্রবেশ করিতেছে। ক্রমে তিনিও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। কিয়ৎকাল পরে চৈতন্যলাভ করিয়া তিনি দেখিলেন, ঠাকুর অশ্রু ত্যাগ করিতেছেন। পরমহংসদেব বলিলেন,

"আজ তোকে সর্ব্বস্ব দিয়ে ফকীর হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ কর্‌বি, কাজ শেষ হ'লে ফিরে যাবি।"

দেহরক্ষার দুই দিন পূর্ব্বে পরমহংসদেব নরেন্দ্রনাথের হস্তে শিষ্যবৃন্দের ভার অর্পণ করেন। মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। শেষমুহূর্ত্তে নরেন্দ্রনাথ মনে মনে যখন চিন্তা করিতেছিলেন যে, অন্যান্য ভক্ত ঠাকুরকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনি যদি এখন স্বয়ং এ কথা বলেন, "আমিই ভগবান্", তবে তিনি তাহা বিশ্বাস করিবেন, নহিলে নহে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই পরমহংসদেব নরেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "এখনও তোর জ্ঞান হলো না? সত্যি সত্যি বল্‌ছি, যে রাম, যে কৃষ্ণ—সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।" আর কি হৃদয়ে অবিশ্বাস স্থান পায়? না। নরেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে সেই মুহূর্ত্ত হইতে 'অবতার' বলিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

পরমহংসদেবের দেহাবসানের পর নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েক জন যুবক শিষ্য আর গৃহে ফিরিলেন না। নির্দ্ধারিত চুক্তির দিন সমাগত হইলে কাশীপুরের বাগানবাটী ছাড়িয়া দিয়া বরাহনগরে বাড়ী ভাড়া করিয়া তাঁহারা সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

গুরুভ্রাতারা নরেন্দ্রনাথকে গুরুর আসনে বসাইয়া তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে সাধনানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অভিভাবকদিগের প্ররোচনায় কোনও কোনও যুবক গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনাইয়া সন্ন্যাসজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইয়া দিলেন। মঠে ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি আলোচনার একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইল।

ক্রমে ক্রমে সকলে মহা পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। অনেক সময় সমস্ত রজনী ধ্যানেই অভিবাহিত হইত।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মঠ বরাহনগরে ছিল। এই মঠের ভাড়া ৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্র দিতেন। তিনিই এই মঠের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। মঠের ভ্রাতাদিগের অভাব তিনি সাধ্যানুসারে পূরণ করিতেন। বরাহনগর-মঠে অবস্থানকালে নবীন সন্ন্যাসীদিগের কষ্টেরও অবধি ছিল না। কোনও দিন ভাত জোটে ত লবণ নাই; কোন কোন দিন অনাহারেই কাটিত; বাসনমাজা, জলতোলা, মাঝে মাঝে রন্ধনাদি পর্য্যন্ত নিজেদেরই করিতে হইত। কিন্তু এ সকল কষ্ট নবীন সন্ন্যাসীদিগের অতুল আনন্দকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পারিত না। কৌপীনধারণ করিয়া সকলে কঠোর তপস্যায় রত থাকিতেন। প্রথমতঃ মঠের সন্ন্যাসীরা প্রচার-কার্য্যের বিরোধী ছিলেন। অপরকে শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে নিজে উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক, গুরুভ্রাতাদিগকে নরেন্দ্রনাথ এইরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। সাধন ব্যতীত মঠে প্রত্যহ মন্ত্রপাঠের সহিত ধূপ-দীপ জ্বালাইয়া, শঙ্খঘণ্টার মধুর ধ্বনি সহকারে ঠাকুরের পূজা হইত। শত অভাব ও অনাটনের মধ্যেও ঠাকুরের নিত্যভোগের ব্যবস্থাও ছিল। নরেন্দ্রনাথই মঠে এইরূপ পূজা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন।

সন্ন্যাসীদিগের সকলেই তীর্থপর্যাটনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথের মনেও তীর্থভ্রমণস্পৃহা বলবতী হইয়া উঠে; কিন্তু সকলের হৃদয়ে এই ইচ্ছা সংক্রামিত হইলে মঠটি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া নরেন্দ্র মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন না এবং কেহ ঐরূপ অভিপ্রায় জানাইলে তাহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতেন; কিন্তু ক্রমেই তাঁহার ভ্রমণস্পৃহা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। ১৮৮৭

হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি হয় মঠে থাকিতেন, নয় ত গুরুভ্রাতাদিগের কাহাকেও সঙ্গে লইয়া বৈদ্যনাথ, শিমুলতলা প্রভৃতি স্থান বেড়াইয়া আসিতেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে নির্জ্জনবাসের ইচ্ছা বলবতী হইল। সেই সময় নরেন্দ্র একাকী পরিব্রাজকরূপে যাত্রা করিলেন, মঠের কোনও সন্ন্যাসীকে সঙ্গে লইলেন না। প্রব্রজ্যাকালে তিনি সাধারণ সাধুর ন্যায় ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার অতুলনীয় পাণ্ডিত্য, প্রখরা বুদ্ধি যথাসাধ্য গোপন করিয়া তিনি চলিতেন। তিনি নিজে প্রকাশ না করিলে কেহ সহজে বুঝিতে পারিত না যে, তিনি একটি ইংরাজী বর্ণের সহিতও পরিচিত। অনেক সময় তিনি ভিক্ষা মোটেই করিতেন না। ইহার ফলে মাঝে মাঝে তাঁহাকে একাদিক্রমে চারি পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অনাহারে কালযাপন করিতে হইত। এ সকল কথা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন।

নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার পর তিনি বারাণসীধামে গমন করেন। এক দিন দুর্গাবাড়ীর অভিমুখে যাত্রাকালে একদল বানর তাঁহাকে আক্রমণ করে। এই সময়ে বানরের দল নিরীহ লোকের উপর গুরুতর অত্যাচার করিত। স্বামীজী তাহা জানিতেন, এজন্য তিনি উদ্বিগ্নভাবে কিছু দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিলেন। বানরের দলও তদ্দর্শনে লম্ফে লম্ফে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। অকস্মাৎ একটি কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল ;— "থামো, থামো, সাম্‌নে দাঁড়াও।" স্বামীজী অবিলম্বে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। অমনি বানরের দলও থামিল। এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সেখানে আসিলে, তিনি বুঝিলেন, ইনিই তাঁহাকে প্রাগুক্তরূপ উপদেশ দিয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন। এই কথাটা স্মরণ রাখিয়া উত্তরকালে বিবেকানন্দ আমেরিকায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'প্রকৃতি, অবিদ্যা, মায়া ইহাদিগকে দেখিয়া কখনও কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিবে না ; বীরের ন্যায় সম্মুখীন হইবে।'

কাশীধামে স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত স্বামীজীর পরিচয় হয়। ত্রিকালজ্ঞ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দর্শনলাভও তিনি এইখানে পাইয়াছিলেন। ভাস্করানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বামীজী তাঁহার সহিত কাম-কাঞ্চন-ত্যাগ-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ভাস্করানন্দ স্বামী তাঁহাকে বলেন, কোনও ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করিতে পারে কি না, সন্দেহ। স্বামীজী তাহাতে বলেন, এমন মহাপুরুষকেও তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভাস্করানন্দ তাহাতে বিশ্বাস করেন নাই; তাঁহাকে বালক বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সহিত ঘোরতর তর্ক করেন। বিবেকানন্দ তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় গোপন করিয়াছিলেন। উত্তরকালে বিশ্ব-বিখ্যাত বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাতের জন্য ভাস্করানন্দ আগ্রহ প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু তিনি জানিতেন না, এক দিন যাঁহার সহিত ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধ হইয়াছিল, তিনিই বিবেকানন্দ স্বামী। নানাকারণ বশতঃ স্বামীজী তাঁহার সহিত আর দেখা করিবার অবসর পান নাই।

কাশীধাম হইতে ভিক্ষা করিতে করিতে স্বামীজী অযোধ্যার মধ্য দিয়া আগ্রায় গমন করেন। তথা হইতে বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। বৃন্দাবনের নিকটে আসিয়া তিনি দেখিলেন, এক ব্যক্তি ধূমপান করিতেছে। স্বামীজীর ধূমপানেচ্ছা তখন অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। কলিকাটি চাহিলে, সে যখন বুঝাইয়া দিল যে, সে মেথর, তখন স্বামীজী নৈরাশ্যভরে চলিয়া গেলেন; কিন্তু সহসা তাঁহার মনে হইল, আত্মার অভেদ তিনি আজীবন বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, এখন জাতিভেদের সংস্কার মনে আসিল কেন? তখনই তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই মেথরের দ্বারা তামাক সাজাইয়া ধূমপান করিলেন।

আত্মপরিচয়-গোপনকালে স্বামীজী কখনও "বিবিদিষানন্দ", কখনও বা "সচ্চিদানন্দ" প্রভৃতি নামধারণ করিতেন।

গোবর্দ্ধনগিরিতে পরিভ্রমণকালে স্বামীজী মনে মনে করিয়াছিলেন, তিনি কোনওমতেই কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা করিবেন না; বস্তুতঃ সমস্ত দিন পর্য্যটনে অত্যন্ত ক্ষুধিত হইলেও তিনি কাহারও নিকট ভিক্ষা চাহিলেন না। রাধারমণের মূর্ত্তি স্মরণ করিতে করিতে তিনি মন্থরপদে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। সহসা তিনি শুনিলেন, কে যেন পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে ডাকিতেছে। কিয়ৎকাল পরে পশ্চাৎস্থিত লোকটি নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী সহ তাঁহার নিকট আসিয়া অত্যন্ত অনুনয় সহকারে আহার্য্য-দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। স্বামীজী ভগবানের অপার করুণা-নিদর্শন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

রাধাকুণ্ডে যখন স্বামীজী আসিলেন, তাঁহার সম্বল তখন একমাত্র কৌপীন। তিনি উহা ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিলে ক্ষণকাল পরে একটা বানর আসিয়া উহা লইয়া বৃক্ষে আরোহণ করিল। স্বামীজী অনেক চেষ্টা করিয়াও বানরের নিকট হইতে উহা ফিরাইয়া পাইলেন না। অভিমানপূর্ণ-হৃদয়ে তখন তিনি অরণ্য প্রবেশ করিলেন। সঙ্কল্প, তিনি আর লোকালয়ে ফিরিবেন না। তাঁহার মনে হইল, ভগবান্ না চাহিলে তাঁহাকে কৌপীন-বাস দেন কি না, আজ তাহা পরীক্ষা করিবেন। বিস্ময়ের বিষয়, অরণ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবামাত্র কে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল। স্বামীজী সে দিকে কর্ণপাত না করিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সে ব্যক্তিও রুদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে সমাদরে নিজগৃহে লইয়া গিয়া আহার্য্যাদি দিল এবং একখানি নূতন গৈরিকবস্ত্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। ভগবানের আশ্চর্য্য করুণার

কথা ভাবিতে ভাবিতে রাধাকুণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজী দেখিলেন, তাঁহার কৌপীনখানা যেখানে শুকাইতে দিয়াছিলেন, সেইখানেই পড়িয়া রহিয়াছে।

হাতরাস্ জংশন ষ্টেশনের একাংশে ক্ষুৎপিপাসাকাতর স্বামীজী উপবিষ্ট। সেইখানে তত্রত্য সহকারী ষ্টেশন-মাষ্টার শরচ্চন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। শরৎবাবু সন্ন্যাসীকে সঙ্গে লইয়া নিজ বাসায় গমন করেন। সেখানে তাঁহার অনুরোধে স্বামীজী কয়েক দিন অবস্থান করেন। এই সময়ে শরৎবাবু স্বামীজীর সহিত আলাপ-পরিচয়ে এমনই মুগ্ধ হন যে, তিনিও সন্ন্যাসগ্রহণে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্বামীজী তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্ম্মের কঠোরতার বিষয় বিশেষরূপে বুঝাইয়া তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিতে নিষেধ করেন; কিন্তু শরচ্চন্দ্রের নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে অবশেষে তাঁহাকে শিষ্যত্বে বরণ করিতে বাধ্য হন। এই শরৎ-বাবুই উত্তরকালে 'সদানন্দ স্বামী' বা 'গুপ্ত মহারাজ' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

স্বামীজী শিষ্যসহ ভিক্ষা করিতে করিতে হৃষীকেশে গমন করেন। তথায় কিছুদিন ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত হইল; কিন্তু আজন্ম সুখৈশ্বর্য্যে প্রতিপালিত শরচ্চন্দ্র পথশ্রম ও অনিয়মে এখানে পীড়িত হওয়াতে স্বামীজী শিষ্যসহ হাতরাসে ফিরিয়া আসিলেন। গুরুভ্রাতৃগণ ঘটনাক্রমে তাঁহার সংবাদ পাইয়া মঠে ফিরিয়া আসিবার জন্য তাঁহাকে পত্র দ্বারা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বামীজীর মনও তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। শিষ্যকে হাতরাসে রাখিয়া তিনি বরাহনগরের মঠে ফিরিয়া আসিলেন। রোগমুক্ত হইয়া পরিশেষে শরচ্চন্দ্রও ঐ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দীর্ঘকাল পর্য্যটনের ফলে স্বামীজী অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি মঠের ভ্রাতাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ আবার একসূত্রে গ্রথিত হইবে। কিছুদিন মঠের ভ্রাতাদিগকে শিক্ষাদানের পর তিনি পুনরায় দেশ-পর্য্যটনে বহির্গত হন।

এ যাত্রা সর্ব্বপ্রথম তিনি গাজীপুরে গিয়া পাওহারী বাবা নামক জনৈক মহাশক্তিশালী জ্ঞানী পুরুষের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ করিলেন। এই মহাপুরুষ উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানমধ্যস্থ গুহার মধ্যে অবস্থান করিতেন। তন্মধ্যে সাধারণের প্রবেশের কোনও উপায় ছিল না। অনেক চেষ্টাসত্ত্বেও তাঁহার দেখা না পাইয়া সে যাত্রা স্বামীজী বরাহনগরে ফিরিয়া আসিলেন এবং কিছুদিন পরে পুনরায় পাওহারী বাবার সহিত সাক্ষাতের জন্য গাজীপুর গমন করেন। এবার যোগীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হইল। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে পাওহারী বাবা ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন জানিতে পারিয়া স্বামীজী তাঁহার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হন এবং পাওহারীবাবার নিকট দীক্ষা-গ্রহণের সংকল্প করেন; কিন্তু পরিশেষে সে সংকল্প পরিত্যক্ত হয়। দীক্ষা গ্রহণ করিতে যাইবার পূর্ব্বে তিনি পরমহংসদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পান। তাঁহার বেদনা-ব্যঞ্জক ছল-ছল দৃষ্টি দেখিয়া স্বামীজীর মনে অত্যন্ত আত্মগ্লানি জন্মে।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী পুনরায় দেশভ্রমণে যাত্রা করিলেন। এবার সংকল্প, আর তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিবেন না। বস্তুতঃ এ যাত্রায় সাত বৎসরের মধ্যে তিনি আর মঠে ফিরিয়া আসেন নাই। ইতিমধ্যে বরাহনগর হইতে মঠ আলমবাজারে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল। স্বামীজী হিমালয়-রাজ্যে ভ্রমণ করিবেন বলিয়া এবার বাহির হইয়াছিলেন।

সঙ্গে ছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। ভাগলপুর হইতে বৈদ্যনাথধামে গিয়া স্বামীজী শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসুর সহিত পরিচিত হন। রাজনারায়ণ বাবু ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই যে, উত্তরকালে বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দই তাঁহার অতিথি হইয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ মনে করিয়াই রাজনারায়ণ বাবু বিবেকানন্দ স্বামী ও স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তৎপরে উভয়ে কাশী ও অযোধ্যা নগরী দর্শনান্তে হিমালয় অভিমুখে প্রয়াণ করেন।

পদব্রজে হিমগিরির পাদদেশ অতিক্রম করিয়া নবীন পরিব্রাজকযুগল নৈনিতালে উপনীত হন। সেখানে রমাপ্রসন্ন বাবুর বাটীতে কয়েক দিবস অবস্থানের পর উভয়ে বদরিকাশ্রম-দর্শন মানসে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে কপর্দ্দকমাত্র নাই। কোথায় আহার করিবেন, মাথা রাখিয়া শয়ন করিবেনই বা কোথায়, তাহার কোনও স্থিরতা নাই। পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে তাঁহারা আলমোড়ার সন্নিধানে পৌছিলেন। এইখানে স্বামীজী ক্ষুৎপিপাসায় এমনই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তখন জীবন-রক্ষা হওয়াই কঠিন। সন্নিহিত মুসলমান সমাধিক্ষেত্রের রক্ষক জনৈক ফকীর তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া একটী শশা আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিয়াছিলেন। স্বামীজী সে দিনের সে স্মৃতি কখনও বিস্মৃত হন নাই। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ভুবনপ্রসিদ্ধ স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যর্থনার জন্য আলমোড়াবাসিগণ বিরাট্ আয়োজন করিয়াছিল। সেই সময়ে তিনি উক্ত মুসলমান ফকীরকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া সকলের নিকট ফকীরকে পরিচিত করেন। মুসলমান ফকীর কিন্তু স্বামীজীকে চিনিতে পারেন নাই

আলমোড়ায় অবস্থানকালে স্বামীজী তাঁহার সহোদরার মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হন। স্নেহময়ী ভগিনীর বিয়োগ-সংবাদে তিনি নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়েন। তার পর গাড়োয়াল রাজ্যাভিমুখে নবীন সন্ন্যাসীরা ধাবিত হইলেন। কর্ণপ্রয়াগ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বক চটিতে উপনীত হইয়া স্বামীজী জ্বররোগে আক্রান্ত হন। ক্রমে সুস্থ হইয়া তাঁহারা রুদ্রপ্রয়াগে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে শ্রীনগর ও পরে টিহিরিতে গিয়া কয়েক দিন বিশ্রাম করিলেন। এখানে কয়েকজন গুরুভ্রাতার সহিত তাঁহাদের মিলন ঘটে। কিছুদিন এই স্থানে থাকিয়া তপস্যা করিতে স্বামীজীর বিশেষ অভিলাষ ছিল; কিন্তু স্বামী অখণ্ডানন্দ অকস্মাৎ পীড়িত হওয়াতে তাঁহার চিকিৎসার জন্য স্বামীজীকে দেরাদুনে ফিরিয়া আসিতে হইল। দেরাদুনে তিন সপ্তাহ অবস্থানের পর কৃপানন্দের উপর অখণ্ডানন্দের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিয়া স্বামীজী হৃষীকেশ অভিমুখে গমন করিলেন। তথায় কুটীর বাঁধিয়া তিনি দুই জন গুরু-ভ্রাতার সহিত কঠোর তপস্যায় নিরত হন। কিছুদিন পরে স্বামীজীর এমন কঠিন পীড়া জন্মিল যে, গুরুভ্রাতৃগণ তাঁহার জীবনের আশা এক-প্রকার পরিত্যাগ করিয়া শোক-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

এক দিন স্বেদস্রাবে স্বামীজীর সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া গেল। জীবনের আর কোনও আশা নাই দেখিয়া গুরুভ্রাতারা নিরতিশয় শোকাকুল হইয়া উঠিলেন। এমন সময় জনৈক সন্ন্যাসীকে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাকে গৃহমধ্যে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নবাগত সন্ন্যাসী তাঁহার ঝুলী হইতে কিছু পিপুলচূর্ণ কিঞ্চিৎ মধু-মিশ্রিত করিয়া চৈতন্যহীন স্বামীজীকে সেবন করাইয়া দিলেন। ঔষধ-প্রয়োগের অনতিকাল পরেই স্বামীজী নয়ন উন্মীলিত করিলেন। অল্পক্ষণ

পরে তাঁহার বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসিল। স্বামীজী পরে গুরুভ্রাতাদের নিকট বলিয়াছিলেন, অচৈতন্য অবস্থায় তাঁহার স্পষ্ট প্রতীতি হইয়াছিল যে, বিধাতার বিশেষ কোনও কার্য্যসাধনের জন্য তাঁহাকে পৃথিবীতে থাকিতে হইবে। সে কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার ছুটী নাই।

শরীর কিছু সুস্থ হইলে সদলবলে স্বামীজী সমতলক্ষেত্রে নামিয়া আসিলেন। হিমালয়-ভ্রমণ আর হইল না। হৃষীকেশ হইতে মিরাটে আসিয়া 'শেঠজীর বাগান' নামক একটি বাগান-বাটীতে তিনি আশ্রয় লইলেন। ব্রহ্মানন্দ, অখণ্ডানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, কৃপানন্দ প্রভৃতি স্বামীজীর গুরুভ্রাতারা মিলিত হইয়া পরম আনন্দে তথায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন। বহু বাঙ্গালী ও স্থানীয় ভদ্রলোক ইহাঁদের নিকট আসিয়া নানাপ্রকার আলোচনায় কালক্ষেপ করিতেন। প্রত্যহ মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর স্বামীজী বিশ্রামকালে মেঘদূত, কুমারসম্ভব, মৃচ্ছকটিক, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্য ও নাটকাদি পাঠ করিয়া গুরুভ্রাতাদিগকে শুনাইতেন। ধ্যান-ভজনাদিও চলিত। এখানে আসিয়া স্বামীজীর স্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতি ঘটিতে লাগিল।

ক্রমে নির্জ্জনবাসের আকাঙ্ক্ষা স্বামীজীর হৃদয়ে বলবতী হইল। একদিন গুরুভ্রাতাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, তাঁহার জীবনব্রত স্থির হইয়া গিয়াছে। এখন তিনি নির্জ্জনবাস করিবেন। আর যেন কেহ তাঁহার সমভিব্যাহারী হইতে না চাহেন। এই সময়ে স্বামী অখণ্ডানন্দের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামীজী একাকী আলোয়ার রাজ্যাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। আলোয়ার ষ্টেশনে নামিয়া তিনি সরকারী চিকিৎসালয়ে আসিয়া তত্রত্য বাঙ্গালী ডাক্তার বাবুর সহিত আলাপ

করেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের অনতিদূরে একটি বাড়ী তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। অতুলনীয় রূপলাবণ্যশালী, দীপ্ত অরুণের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ-কলেবর, নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই ডাক্তার বাবু আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হন। ক্রমে সেখানে জনসমাগম হইতে লাগিল। স্বামীজী সকলকেই ধর্ম্ম-বিষয়ে উপদেশাদি দান করিতে লাগিলেন। সেই উপলক্ষে উর্দ্দু গান, হিন্দী ভজন, বাঙ্গালা কীর্ত্তন, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধক-বৃন্দের পদাবলী তিনি গান করিতেন; উপনিষদ্, কোরাণ, বাইবেল, পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে বচনাবলী উদ্ধৃত করিয়া সকলকে শুনাইতেন; বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, নানক, কবীর, চৈতন্য, তুলসীদাস, রামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের জীবনের নানা ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি সকলকেই ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতেন। হিন্দু, মুসলমান সকল শ্রেণীর লোক-সমাগম হইতে লাগিল। সকলে এই তরুণ সন্ন্যাসীর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকার, মধুর বর্ণনা-ভঙ্গী প্রভৃতি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল। কয়েকজন প্রবীণ ও বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি অবশেষে তাঁহাকে নগরের মধ্যবর্ত্তী কোনও আলয়ে লইয়া গেলেন। সেখানে জনসমাগম আরও বাড়িতে লাগিল। জনৈক মৌলবী প্রথমাবধিই স্বামীজীর প্রধান ভক্ত ও বন্ধু হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক দিন মৌলবীর-আলয়ে স্বামী বিবেকানন্দ আহারও করিয়াছিলেন।

আলোয়ার-মহারাজের দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজী এই অপূর্ব্বদর্শন, অগাধ-বিদ্যাবুদ্ধিশালী, তরুণ সন্ন্যাসীর কীর্ত্তিকলাপের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সমাদরে নিজের আলয়ে লইয়া গেলেন। কিঞ্চিৎ আলাপের পরই তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর প্রভাবে পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন আলোয়ার-মহারাজের মতি-গতি পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা। ইহা ভাবিয়া

তিনি মহারাজ বাহাদুরকে এই শক্তিশালী সাধুর কথা জানাইলেন। মহারাজ স্বয়ং দেওয়ানজীর বাড়ী আসিয়া স্বামীজীকে প্রণতি পুরঃসর কাছে বসাইলেন। মহারাজ তাঁহাকে পরীক্ষার জন্য নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু নির্ভীক, স্পষ্টভাষী বিবেকানন্দ সহজ ও সরলভাবে তাঁহার প্রশ্নের উত্তরদানে তাঁহার মতিগতির পরিবর্ত্তন-সাধন করেন। মূর্ত্তিপূজার আলোয়ার মহারাজের আদৌ শ্রদ্ধা ছিল না; কিন্তু স্বামীজীর অপূর্ব্ব নিদর্শন ও যুক্তির প্রভাবে মহারাজ প্রকৃতই বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে অন্যান্য বহুব্যক্তি স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিয়া জীবনের গতি ভিন্নপথে পরিচালিত করেন।

আলোয়ার-রাণী এবং তত্রত্য কয়েকজন বিশ্বাসী ও পবিত্রচেতা যুবক স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর উপদেশানুসারে তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা শিখিতে লাগিলেন। স্বামীজী নিজেও অনেক সময় তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। দুই মাসকাল আলোয়ারে অবস্থান করিবার পর স্বামীজীর প্রাণ আবার অন্যত্র গমনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

আলোয়ার ত্যাগ করিয়া স্বামীজী পাণ্ডুপোল হইয়া জয়পুরে গমন করেন। বান্দিকুই ষ্টেশনে জনৈক ভক্ত স্বামীজীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। জয়পুরে পৌঁছিবার পরই স্বামীজীর একখানি ফটোগ্রাফ লইবার জন্য সেই ভক্তটি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাহাতে বাধা দিতে পারিলেন না। সেই চিত্রেই পরিব্রাজকের ভাবটুকু চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছিল।

জয়পুরে অবস্থানকালে স্বামীজী একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণের নিকট পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী দুই সপ্তাহের মধ্যে আয়ত্ত করেন। যে পণ্ডিত তাঁহাকে

শিখাইতে গিয়াছিলেন, তিনিই শেষ স্বামীজীকৃত পাণিনির ভাষ্য ও ব্যাখ্যা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

জয়পুর হইতে আজমীর হইয়া স্বামীজী আবু পর্ব্বতের বিচিত্র সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার জন্য গমন করেন। কোটারাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ঠাকুর ফেচ সিংহের ভবনে অবস্থানকালে খেতড়ীর রাজার সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহনলাল স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসেন। তিনি স্বামীজীর সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া খেতড়ীর রাজার কাছে লইয়া যান। খেতড়ীর রাজা ধর্ম্মপ্রাণ অজিতসিংহ তাঁহার অসাধারণ গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া মুন্সীজী জগমোহনলালের সহিত স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরুভক্ত শিষ্যের সাগ্রহ অনুরোধে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া স্বামীজী কিছুদিন খেতড়ীতে অবস্থান করেন। তত্রত্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নারায়ণদাসের নিকট তিনি পাণিনির মহাভাষ্য শিক্ষা করেন। পণ্ডিতজী স্বামীজীর প্রতিভা-দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন, এরূপ প্রতিভা মানবে সম্ভবে, সে ধারণা পূর্ব্বে তাঁহার ছিল না।

অপুত্রক খেতড়ীর রাজা স্বামীজীর নিকট বারংবার পুত্রবর প্রার্থনা করেন।। শিষ্যের অনুরোধে স্বামীজী শেষে বলিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।"

অতঃপর স্বামীজী পদব্রজে গুর্জ্জরের মরুপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া আহম্মদাবাদ, লিম্বড়ী, জুনাগড়, ভুজ, ভেরাবাল, প্রভাস ও সোমনাথ দর্শন করিয়া পোরবন্দরে গমন করেন। লিম্বড়ীতে তিনি একদল ধর্ম্মধ্বজীর আলয়ে বিপন্ন হইয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে আশ্রয় দিবার প্রলোভনে ভুলাইয়া লইয়া একটা অট্টালিকায় আবদ্ধ করিয়া রাখে। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, পাপাচরণ দ্বারা তাঁহার ব্রতভঙ্গ করাইবে। স্বামীজী পরিশেষে

গোপনে জনৈক অনুরক্ত বালকের দ্বারা লিম্বড়ীর রাজপ্রাসাদে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। রাজা বাহাদুর কয়েকজন দেহরক্ষী সৈনিক পাঠাইয়া স্বামীজীর উদ্ধার-সাধন করেন। পরিশেষে লিম্বড়ীরাজ স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্বামীজী পোরবন্দর হইতে দ্বারকা, মাণ্ডবী, পালিটানা প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়া বোম্বাই নগরে পদার্পণ করেন। লোকমান্য তিলকের সহিত স্বামীজীর আলাপ হয়। সেখান হইতে বেলগ্রাম ও মারমাগোয়া পরিভ্রমণ পূর্ব্বক স্বামীজী অবশেষে মহীশূররাজ্যে প্রবেশ করেন। তত্রত্য প্রধান দেওয়ান শেষাদ্রি বাহাদুর স্বামীজীর সহিত আলাপে পুলকিত হইয়া মহীশূরাধিপ মহারাজ চামরাজেন্দ্র ওয়াডিয়ার বাহাদুরের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তরুণ তপস্বীর লোকাতীত প্রতিভার পরিচয় পাইয়া মহারাজ তাঁহাকে তদীয় প্রাসাদে অবস্থান করিবার জন্য সবিনয় অনুরোধ করিলেন। মহারাজের কোনও বিষয়ে ত্রুটী দেখিলে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ তাহার তীব্র সমালোচনা করিতেন। পরীক্ষার জন্য একদিন মহারাজ কৃত্রিম কোপসহকারে বলিলেন, তিনি শক্তিশালী নরপতি, তাঁহাকে ভয় করা, খোসামোদ করা কর্ত্তব্য ; নহিলে স্বামীজীর জীবন বিপন্ন হইতে পারে। মহারাজের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া স্বামীজী সরল-বিশ্বাসে, নির্ভীকভাবে বলিয়াছিলেন, "আপনার অন্যায় কার্য্যের সমর্থন করিবার জন্য বহু চাটুকার আপনার সভায় আছেন। আমি সন্ন্যাসী, সত্যই আমার অবলম্বন, আমার প্রধান তপস্যা ; আমি সত্যকে ত্যাগ করিব কেন? ভয়ে? মহারাজ, আপনি হিন্দু রাজা হইয়া হিন্দু সন্ন্যাসীর নিকট কি এরূপ হীন কার্য্যের প্রত্যাশা করেন? আশ্চর্য্য!"

স্বামীজীর নির্ভীক স্পষ্টবাদিতায় মহীশূরপতি অধিকতর মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাদপূজা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু স্বামীজীর সনির্ব্বন্ধ প্রতিবাদে অবশেষে তিনি ক্ষান্ত হন।

দেওয়ান বাহাদুর পণ্ডিত ছিলেন। একটি বিচার-সভায় তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিতগণ বেদান্তের বিচার করিতেছিলেন। অবশেষে স্বামীজী দেওয়ান বাহাদুরের অনুরোধে সুললিত সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে বেদান্তের বিভিন্ন প্রকার মতবাদগুলি যে পরস্পর বিরোধী নহে, বরং একে অন্যের পরিপোষক ও সমর্থক, অপূর্ব্ব যুক্তির সাহায্যে সকলের সমক্ষে তাহা প্রতিপন্ন করিলেন। বেদান্তের অভিনব ব্যাখ্যা-শ্রবণে পণ্ডিত-মণ্ডলী স্বামীজীকে সমস্বরে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ বাহাদুর স্বামীজীকে পাশ্চাত্যদেশে গমন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে অনুরোধ করেন। তিনি তজ্জন্য যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হন; কিন্তু স্বামীজী তখনও সংকল্প স্থির হয় নাই বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে কোনপ্রকার সাহায্য-গ্রহণে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে মহারাজের একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ক্ষুদ্র চন্দন-কাষ্ঠের একটি হুঁকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহীশূর হইতে যাত্রা করিয়া স্বামীজী কোচিনে গমন করেন। তথা হইতে মালাবার অতিক্রম পূর্ব্বক সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপনীত হন এবং রামনাদের রাজাকে শিষ্যপদে বরণ করিয়া কন্যাকুমারী-দর্শনে যাত্রা করিলেন।

ভারতবর্ষের সর্ব্বদক্ষিণ-প্রান্তস্থিত কন্যাকুমারী অন্তরীপের দেবীমন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব অনুভূতির উদয় হইল। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, ভারতবাসীর মূর্খতা স্মরণ করিয়া দেশবাসীর

সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির কামনা নবযুগ-প্রবর্ত্তক তরুণ সন্ন্যাসীর হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলে।

স্বামীজীর ভারতবর্ষ-পরিভ্রমণ কাহিনীর সম্পূর্ণ ইতিহাস এখনও পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। পর্য্যটনকালে যে সকল ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁহাদের নিকট হইতে যতটুকু সংবাদ আহরিত হইয়াছে, তাহা হইতেই জানা যায় যে, তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও ধর্ম্মপ্রভাবের বলে তিনি স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। দেশীয় রাজন্যবৃন্দের সহিত সাক্ষাতের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল,—তাঁহাদিগকে সুপথে পরিচালিত করিতে পারিলে জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

ভারতবর্ষ-পর্য্যটনের পর স্বামীজী দেখিলেন, নিদারুণ দারিদ্র্যের ভারে ভারতবাসী অবসন্নপ্রায়, অজ্ঞতাও দেশবাসীর অস্থিমজ্জায় সংক্রামিত। ধর্ম্মের নামে লোকের অন্তরে উৎসাহের সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু তাহাও ক্ষণস্থায়ী! কাহারও সহিত কাহারও মতের ঐক্য নাই। পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা, হিংসা, দ্বেষ ও গোঁড়ামীতে দেশটা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। লৌকিক আচার-বিচারকেই ধর্ম্মের আসনে স্থান দিয়া দেশবাসী, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই আসল সত্যকে বিস্মৃত হইয়াছে। স্বামীজী দেখিলেন, যদি ভারতবর্ষ এই ভাবেই চলিতে থাকে, তবে জাতীয় মৃত্যু অবধারিত। মহাপ্রাণ বিবেকানন্দের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। শ্রীগুরুর চরণতলে বসিয়া যে কার্য্যসাধনের মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সার্থক করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ আবেগ-চঞ্চল হইয়া উঠিল।

স্বামীজী অতঃপর হায়দ্রাবাদ হইয়া মান্দ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার মান্দ্রাজী শিষ্যগণ চিকাগোর বিরাট্ ধর্ম্মসভায় হিন্দুধর্ম্মের

প্রতিনিধিস্বরূপ স্বামীজীকে পাঠাইবার জন্য টাকা সংগ্রহ করিতেছিলেন। স্বামীজীরও তখন আমেরিকা যাইবার ইচ্ছা বলবতী। সাধারণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট হইতেই চাঁদা সংগ্রহ করা হইতেছিল। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "আমেরিকায় আমার যাওয়া যদি জগজ্জননীর অভিপ্রেত হয়, তবে সাধারণের নিকট হইতেই ভিক্ষা পাওয়া উচিত। কারণ, দরিদ্র ভারতবাসীর ও সাধারণ নরনারীর নিমিত্তই আমি আমেরিকায় যাইব।" পৃথিবীর বিরাট্ ধর্ম্মসভার হিন্দুধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তনের জন্য এ সময় তাঁহার প্রাণে প্রবল আগ্রহের সঞ্চার হয়। এমন সুবর্ণসুযোগ আর আসিবে না। আমেরিকা যাইবার জন্য প্রবল আগ্রহ জন্মিলেও তিনি দৈবাদেশ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে একদিন সত্য সত্যই তিনি ঠাকুরের অভিপ্রায় স্বপ্নঘোরে জানিতে পারেন। তিনি দেখিলেন, যেন পরমহংসদেব সমুদ্রতীর অতিক্রম পূর্ব্বক জলের উপর দিয়া অপর পারের দিকে চলিতে লাগিলেন এবং স্বামিজীকে তাঁহার অনুগামী হইতে ইঙ্গিত করিলেন। স্বপ্ন দেখিয়া স্বামীজীর হৃদয়ে প্রতীতি জন্মিল বুঝিলেন, বিদেশযাত্রায় পরমহংসদেবের বিশেষ অনুমোদন আছে। বিবেকানন্দের জননীও পুত্রের পত্র পাইবার পর অনুরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার অপূর্ব্ব স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে আমেরিকা-যাত্রার জন্য আশীর্ব্বাদসূচক অনুমতি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শিষ্যবর্গের উৎসাহে আমেরিকাযাত্রার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ অর্থ সংগৃহীত হইয়া গেল। এমন সময় খেতড়ীর মহারাজের সেক্রেটারী আসিয়া তাঁহাকে খেতড়ীতে যাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে জানাইলেন যে, দুই চারিদিন পরেই আমেরিকা যাত্রা করিবেন, এখন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করা অসম্ভব ; কিন্তু সেক্রেটারী জগমোহন

তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া বলিলেন, মহারাজ তাঁহার আমেরিকা-যাত্রার সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। অগত্যা স্বামীজীকে রাজসকাশে যাইতে হইল।

দুই বৎসর পূর্ব্বে স্বামীজী মহারাজকে পুত্র-বর প্রদান করিয়াছিলেন। এইসময় মহারাজের পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তদুপলক্ষে রাজ্যমধ্যে প্রচুর উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। রাজগুরু সভামধ্যে উপনীত হইলে, মহারাজ তাহার চরণ-বন্দনা করিলেন। রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বামীজী কয়েকদিন খেতড়ীতে অবস্থান করিলেন। তার পর বোম্বাই নগরে গিয়া সমুদ্র-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। মহারাজ জয়পুর পর্য্যন্ত তাঁহার গুরুদেবের অনুগামী হইলেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী জগমোহন স্বামীজীকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিবেন বলিয়া সঙ্গে চলিলেন। আবুরোড ষ্টেশনে স্বামীজীর জনৈক ভক্ত তাঁহার কামরায় বসিয়া স্বামীজীর সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন; সেই সময় জনৈক শ্বেতাঙ্গ রেলওয়ে কর্ম্মচারী সেখানে আসিয়া উক্ত ভদ্রলোককে গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে আদেশ করে। তিনি সে কথা গ্রাহ্য করিলেন না দেখিয়া সাহেবটি তাঁহার সহিত কলহ বাধাইয়া দিলেন। স্বামীজী ভক্তটিকে কলহে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছিলেন। সাহেব তাহাতে গরম হইয়া স্বামীজীকে ধমক দিয়া "তুমি" শব্দ ব্যবহার করিল। স্বামীজী তাহার অভদ্র আচরণে চক্ষু আরক্ত করিয়া তাহাকে তীব্রস্বরে 'কাপুরুষ' বলিয়া উল্লেখ করেন। একজন সন্ন্যাসী যে চমৎকার ইংরাজীতে কথা বলিতে পারেন এবং উপরওয়ালার নিকট তাহার নামে রিপোর্ট করিবার ভয় দেখাইতে পারেন, সোলা-হ্যাট মাথায় দিয়া সাহেব তাহা প্রথমে কল্পনাও করে নাই। সে বেগতিক দেখিয়া 'যঃ পলায়তি স জীবতি' পন্থার অনুসরণ করিল। এই প্রসঙ্গ উপলক্ষে স্বামীজী জগমোহনকে

বলিয়াছিলেন যে, "য়ুরোপীয়দিগের সঙ্গে ব্যবহার করিতে গেলে, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান বিশেষভাবে থাকা দরকার। নহিলে তাহারা পদে পদে আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিবে।"

বোম্বাই নগরে আসিয়া মুন্সী জগমোহন স্বামীজীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিলেন। তিনি রেশমের পাগড়ী, রেশমের আলখাল্লা প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছেন দেখিয়া স্বামীজী তাঁহাকে নিষেধ করিলেন; কিন্তু জগমোহন সে কথা শুনিলেন না। রাজার গুরু, সুতরাং তদুপযুক্ত বেশভূষায় দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিবেন। জাহাজে প্রথম শ্রেণীর একটি কামরাও স্বামীজীর জন্য ভাড়া করা হইয়াছিল। স্বামীজীর মান্দ্রাজী শিষ্য মিঃ আলসিঙ্গা পেরুমল গুরুদর্শন-কামনায় আসিয়াছিলেন। এই উভয় শিষ্য ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে স্বামীজীকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। বিচ্ছেদের সময় বিবেকানন্দের নয়ন শুষ্ক ছিল না। 'মা, তোমার হনূমান সাগর লঙ্ঘন করতে চল্লো' মাকে এই মর্ম্মে একখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিয়া—ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম স্মরণ করিয়া—প্রতিষ্ঠাবিহীন স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাত্রা করিলেন।

বোম্বাই-পরিত্যাগের পর স্বামীজী কলম্বো, পিনাং, সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি স্থান দর্শন করিতে করিতে চলিলেন। ক্যান্টনে স্বামীজী একটি চীনামঠ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু যে সকল স্থলে বৌদ্ধমঠগুলি অবস্থিত, সেখানে বৈদেশিকদিগের প্রবেশাধিকার নাই। স্বামীজী, যে কার্য্যে বাধা পাইতেন, তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা আরও বলবতী হইত। তিনি পথ-প্রদর্শককে লইয়া অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর স্পষ্টই দেখা গেল, কতকগুলি লোক লাঠি লইয়া তাড়া করিয়া আসিতেছে। "গাইড" তত্ক্ষণ 'পগার' পার। স্বামীজী

দাঁড়াইলেন। দূর হইতে চীৎকার করিয়া চীনাভাষায় আপনাকে যোগী বলিয়া পরিচিত করিলেন শুধু "যোগী" শব্দটা শুনিয়াই উন্মত্তপ্রায় চীনাগণ তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িল। তাঁহার নিকট হইতে রক্ষাকবচ আদায় করিয়া পরে তাঁহাকে মঠটি দেখাইল।

জাপান প্রভৃতি স্থান দর্শনের পর যথাসময় স্বামীজী চিকাগোতে পৌছিলেন। অর্থের ব্যবহারে স্বামীজী সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন, এজন্য পথে তিনি নানাপ্রকারে প্রতারিত হন। চিকাগো সহরের রাজপথে গৈরিক-বেশধারী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া কৌতূহলী ও আমোদপ্রিয় ব্যক্তিরা তাঁহাকে নানাপ্রকারে উত্ত্যক্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অনেক কষ্টে একটি হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তবে তিনি সে যাত্রা পরিত্রাণ লাভ করেন।

চিকাগোয় স্বামীজী ১২ দিন রহিলেন। প্রত্যহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি মেলা দেখিতে লাগিলেন। সে এক বিরাট্ কল্পনাতীত ব্যাপার! পৃথিবীর যাহা কিছু দর্শনীয়, যাহা কিছু উত্তম, সমস্ত দ্রব্যের সমাগম সেইখানে দেখিয়া স্বামীজী চমৎকৃত হইয়া গেলেন।

এতবড় বিরাট্ নগরে এত লোকসমাগমের মধ্যে তিনি কোনও পরিচিত লোক দেখিতে পাইলেন না। আমেরিকা ধনীর দেশ, খরচপত্রও অত্যন্ত অতিরিক্ত দেখিয়া স্বামীজী বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অনুসন্ধানে তিনি জানিতে পারিলেন যে, সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ব্বে সভার অধিবেশন হইবে না। তখন জুলাই মাস। এই দীর্ঘকাল এখানে থাকিবার মত সম্বল তাঁহার নাই। তিনি আরও জানিতে পারিলেন যে, প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের শেষ তারিখ গত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভালরূপ পরিচয়-পত্রাদি না থাকিলে কেহই প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না।

বিবেকানন্দের সম্মুখে ভীষণ সমস্যা সমুপস্থিত হইল। আপাততঃ নিরাশ হইলেও তিনি সহজে হটিবার পাত্র নহেন। শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া তিনি নিরস্ত হইবেন না স্থির করিলেন।

তিনি জানিতে পারিলেন, বোষ্টন সহর শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র। চিকাগোর তুলনায় সেখানে খরচ-পত্রও কমে হয়। স্বামীজী বোষ্টনে চলিয়া গেলেন। রেলে যাইবার সময় জনৈক বৃদ্ধার সহিত আলাপ হইল। এই বৃদ্ধা তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া এমনই মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহাকে স্বীয় আলয়ে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। বৃদ্ধার অবস্থা ভালই ছিল। তাঁহার মনটিও নিতান্ত অসরল ছিল না। প্রাচ্য-দেশীয় জীব কিরূপ অদ্ভুত এবং হিন্দু সন্ন্যাসীর ধর্ম্মব্যাখ্যাই বা কিরূপ, এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে বন্ধুবান্ধবদিগের কৌতূহল তৃপ্তির নিমিত্তই বৃদ্ধা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

চিকাগোয় প্রত্যহ স্বামীজীর পনের ষোল টাকা ব্যয় পড়িতেছিল। বৃদ্ধার বাড়ীতে আসার সে খরচ বাঁচিয়া গেল; কিন্তু প্রতীচ্যদেশের উপযোগী বেশভূষা প্রস্তুত করিতে তাঁহার বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়া গেল। অল্পদিনেই তিনি বুঝিলেন যে, সাধু-সন্ন্যাসীর বেশ সেখানে চলিবে না। তাহা ছাড়া সেখানে যেরূপ শীত, তাহাতে গরম পোষাক অত্যাবশ্যক। মহিলা বন্ধুদিগের পরামর্শ অনুসারে তিনি খৃষ্টান-ধর্ম্মযাজকদিগের মত কৃষ্ণবর্ণের লম্বা জামা প্রস্তুত করাইলেন। শুধু বক্তৃতার সময় গৈরিক আলখাল্লা ও পাগড়ী ধারণ করিলেই চলিবে।

বৃদ্ধার আলয়ে অবস্থানকালে অনেকগুলি মহিলার সহিত স্বামীজী পরিচিত হন। তথায় একটি মহিলা-সভাও ছিল। একদিন সেই সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া

পড়েন। ক্রমে এই প্রতিভাশালী হিন্দু সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা চলিতে লাগিল। ইহার ফলে আমেরিকার বিশিষ্ট ও বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের নিকট ক্রমে ক্রমে স্বামীজী পরিচিত হইতে লাগিলেন। হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রীকভাষার অধ্যাপক জে, এইচ, রাইট মহোদয় তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য, জ্ঞান ও প্রতিভা দর্শনে এমনই মুগ্ধ হইলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে তাঁহাকে মহামেলায় উপস্থিত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন; এবং তিনি নিজে ধর্ম্মমহাসভায় তাঁহাকে প্রবিষ্ট করাইবার সমুদায় ভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহারই চেষ্টায় স্বামীজী সমুদয় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে ধর্ম্ম-মহাসভার প্রবেশাধিকার পাইলেন।

রাইট সাহেবের নিকট হইতে মহাসভার কার্য্যস্থলের ঠিকানা স্বামীজী সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু চিকাগো আসিয়া তিনি সেই অভিজ্ঞান-পত্রটি কোথায় রাখিয়াছেন, তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। বিরাট্ নগরের মধ্যে আগন্তুক সন্ন্যাসী দিশাহারা হইলেন। কেহই তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানের সংবাদ দিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ তিনি নগরের যে অংশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, সে দিকে জর্ম্মান্গণের বাস। তাহারা তাঁহার কথা বুঝিতে পারিল না, আর কাফ্রী ভাবিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞাও প্রকাশ করিতে লাগিল। সে দিন কোথাও আশ্রয় পর্য্যন্ত না পাইয়া তিনি রাত্রিকালে রেলের মালগাড়ী রাখিবার প্রাঙ্গণে একটা খালি বাক্সের মধ্যে শয়ন করিয়া সারা রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন পদব্রজে তিনি ধর্ম্মসভার কার্য্যালয়ের পুনরায় অনুসন্ধান করিতে চলিলেন। একটি সুরম্য অট্টালিকার সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় জনৈক মহিলা তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া বুঝিলেন যে, তিনি ধর্ম্ম-মহাসভার একজন প্রতিনিধি। তখন

দয়াবতী রমণী তাঁহাকে স্বীয় ভবনে আনিয়া যথোপযুক্ত পরিচর্য্যা করেন। তার পর স্বয়ং তিনি স্বামীজীকে মহাসভার কার্য্যালয়ে লইয়া গিয়া তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত প্রভৃতি করিয়া দেন। এই মহিলা মিঃ জর্জ্জ ডব্লিউ হেল নামক চিকাগোর জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পত্নী।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর ধর্ম্ম-মহাসভার অধিবেশন হয়। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের প্রতিনিধি নির্দ্দিষ্ট সভাগৃহে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। প্রায় ছয় সাত হাজার মহাপণ্ডিত সভাস্থলে উপবিষ্ট। সে এক বিরাট্ দৃশ্য। মধ্যস্থলে উচ্চ সিংহাসনে রোমান্ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মযাজক কার্ডিনাল গিবন্স উপবিষ্ট। তাঁহার বামভাগে ও দক্ষিণভাগে প্রাচ্যদেশের প্রতিনিধিবর্গ বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রেশমের গৈরিক অঙ্গাবরণ ও পাগড়ী ধারণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ উপবিষ্ট। তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিবেকানন্দের এক পার্শ্বে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও অপর পার্শ্বে সিংহলের বৌদ্ধ ধর্ম্মপাল। বিবেকানন্দের আসন ত্রিশ জন প্রতিনিধির পর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

স্বামীজীর পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সভাপতি মহাশয় বিবেকানন্দকে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন; কিন্তু তিনি সঙ্কোচ বশতঃ বলিলেন, "এখন নহে।" উপর্য্যুপরি কয়েকবার তিনি আহূত হইয়াও বক্তৃতা করিতে উঠিলেন না। "এখন নহে" বলিয়া এড়াইয়া গেলেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুমান, বোধ হয় তিনি বক্তৃতা করিতে উঠিবেন না; অপরাহ্নের সময় সভাপতি মহাশয় পুনরায় বিবেকানন্দকে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিলেন। এবার যদি তিনি সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আর তাঁহাকে সময় দেওয়া

হইবে না বুঝিতে পারিয়া ত্রিংশদ্‌বর্ষীয় যুবক সন্ন্যাসী গাত্রোত্থান করিলেন। সেই বিপুলায়তন সভাগৃহে সহস্র সহস্র মহাপণ্ডিত প্রতিনিধিবর্গের সম্মুখে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া স্বামীজীর সুগৌর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। একবার তিনি চকিতে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ভারতীর বরপুত্র উদ্দেশে দেবীর চরণে প্রণতি জানাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মার্কিণ ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ!" এই অভিনব সম্বোধনে সমগ্র সভাস্থল বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকিত হইয়া উঠিল। আনন্দধ্বনিতে সভাতল মুখরিত হইল। আনন্দধ্বনি থামিয়া গেলে, ধীর-গম্ভীর-স্বরে ওজস্বিনী ভাষায় স্বামীজী বক্তব্য শেষ করিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িকতার বিন্দুমাত্র সংস্রব ছিল না। অন্যান্য বক্তৃগণ নিজ নিজ ধর্ম্মের পক্ষে ওকালতী করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন যে, সকল ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য,—লক্ষ্য এক। পরমহংসদেবের চরণতলে বসিয়া সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের পবিত্র মন্ত্র তিনি শিখিয়াছিলেন। সেই মন্ত্র তিনি পৃথিবীর সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের প্রতিনিধিবর্গের নিকট বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে, তাঁহার উদার বক্তব্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাঁহার প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠিলেন। এত অল্পসময়ের মধ্যে এত বড় দিগ্বিজয় পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্ব্বে কখনও সংঘটিত হয় নাই।

পরদিবস যাবতীয় সংবাদপত্রে স্বামীজীর ভূয়সী প্রশংসা বিঘোষিত হইল। সেদিন যতগুলি বক্তৃতা হইয়াছিল, সংক্ষিপ্ত হইলেও তাঁহার বক্তৃতাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আমেরিকাবাসিগণ মুক্তকণ্ঠে তাহা ঘোষিত করিলেন। স্বামীজীর পাশ্চাত্য জীবনী-লেখকগণ লিখিয়াছেন, "চিকাগোর বিরাট্ ধর্ম্মসভায় স্বামীজী যে মহাসত্যের প্রচার করিয়াছিলেন, যে অপূর্ব্ব

আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন, খৃষ্টের পর আর কোনও প্রাচ্যদেশবাসীর নিকট পাশ্চাত্য জগৎ তেমন কথা শুনে নাই।"

১৯ শে সেপ্টেম্বর ধর্ম্ম-মহাসভায় "হিন্দুধর্ম্ম" নামক একটি অপূর্ব্ব প্রবন্ধ স্বামীজী পাঠ করেন। ২০শে তারিখে "ভারতবর্ষ ধর্ম্মের অভাবপীড়িত নহে" বলিয়া একটা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। ভারতবর্ষে অর্থেরই যে প্রকৃত অভাব এবং সেই জন্যই তিনি মার্কিণে আসিয়াছেন, সে কথাটা সকলকেই তিনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সকলেই বুঝিতে পারিল, তিনি ধর্ম্মের রহস্য উদঘাটনেই সুদক্ষ দার্শনিক নহেন, অকপট স্বদেশ-প্রেমিক। স্বামীজীর অপূর্ব্ব বক্তৃতা-শক্তি এবং অতুলনীয় ধর্ম্মজ্ঞান দেখিয়া শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার এমনই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, প্রত্যহই তাঁহারা বিবেকানন্দের কিছু না কিছু বক্তব্য শুনিবার জন্য অধীর হইয়া থাকিতেন। সতের দিন ধরিয়া সভায় সহস্রাধিক প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। তাহার অধিকাংশই দীর্ঘ এবং নীরস। সভারম্ভের পূর্ব্বেই সভাপতি বলিয়া দিতেন যে, সর্ব্বশেষে বিবেকানন্দের বক্তৃতা আছে। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার আশায় শ্রোতৃবর্গ ঐ সকল নীরস প্রবন্ধ ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করিতেন। যে বক্তা যেমনই বক্তৃতা করুন না কেন, বিবেকানন্দই ধর্ম্ম-মহাসভার দিগ্বিজয়ী-বীর বলিয়া সকলের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও পূজার অর্ঘ্য লাভ করিলেন।

এইরূপে অপরিচিত প্রতিষ্ঠাহীন, তরুণ সন্ন্যাসী শুধু চিকাগো মহাসভায় বক্তৃতার ফলে বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষ বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। তাঁহার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল, তাঁহার প্রতিকৃতি নগরের সর্ব্বত্র প্রদর্শিত হইতে থাকিল। সংবাদপত্র সমুহ মুক্তকণ্ঠে তাঁহার কীর্ত্তি ও যশের কথা প্রচার করিতে লাগিল। নিউইয়র্ক হেরাল্ড নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোঁড়া সংবাদপত্রও তাঁহাকে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিলেন।

তাঁহার পূর্ণ চিত্র রাজপথের স্থানে স্থানে রক্ষিত হইল। পথচারিগণ শ্রদ্ধা-সহকারে এই প্রাচ্য-সন্ন্যাসীর চিত্রকে নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইত, কেহ কেহ চিত্র-সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতিভাপ্রদীপ্ত অবয়বের প্রতি চাহিয়া থাকিত।

প্রথম দিবসে অধিবেশন শেষ হইলে মার্কিণের জনৈক ধনকুবের বিবেকানন্দকে নিজের আলয়ে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। একটি উৎকৃষ্ট সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ স্বামীজীর অবস্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া গৃহস্বামী স্বয়ং তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হন। সেই প্রকোষ্ঠটি যেরূপ বিলাসোপকরণের দ্বারা সজ্জিত, তাহা দরিদ্র ভারতবাসীর কল্পনারও অতীত। স্বামীজী অমেরিকার অতুল ঐশ্বর্য্য-বিভবের সহিত দরিদ্র ভারতবর্ষের তুলনা করিয়া বেদনা-ব্যথিতচিত্তে সমস্ত রজনী ভূমিতলে পড়িয়া 'মা মা' করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

মার্কিণদিগের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া স্বামীজী হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহার ফলে অনেকেই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিলেন, কেহ কেহ তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণ করিয়া সাধন-ভজনে মনোনিবেশ করিলেন। স্বামীজীর অসাধারণ গুণগ্রাম দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া বহু সম্ভ্রান্তবংশীয়া কুলনারী তাঁহার অনুরাগিণী হইয়া পড়িলেন। এমন কি, কেহ কেহ তাঁহার পাণিপ্রার্থনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু আজন্ম কামজয়ী পুরুষসিংহ কোনও প্রলোভনে বিচলিত হইলেন না। একটি অপূর্ব্বরূপ-লাবণ্যবতী যুবতী স্বামীজীর চরণে রূপ, যৌবন, প্রভূত ঐশ্বর্য্য সমস্তই অর্পণ করিবার জন্য আকুল নিবেদন জানাইয়াছিলেন, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসিপ্রবর মধুরবাক্যে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "কল্যাণি, আমি সন্ন্যাসী, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নারীমাত্রই আমার জননী।"

চারিদিক্ হইতে অজস্র প্রশংসা, প্রভূত সম্মান লাভ করিয়াও স্বামীজীর চিত্তে বিন্দুমাত্র গর্ব্ব বা অহঙ্কারের ছায়াপাত হয় নাই। বরং এরূপ আত্মপ্রশংসায় তাঁহার মনে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। সন্ন্যাসীর পক্ষে এত প্রতিষ্ঠা তাঁহার প্রীতিপ্রদ ছিল না। এই জগদ্ব্যাপী খ্যাতিকে তিনি নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য-দেশকে সনাতন সত্যামৃত-প্রবাহ-ধারায় প্লাবিত করিবার জন্যই ভগবানের নির্দ্দেশক্রমে তাঁহাকে এদেশে আসিতে হইয়াছে। তিনি যন্ত্র মাত্র। কাজেই নিন্দাস্তুতি তাঁহাকে বিচলিত বা অভিভূত করিতে পারিত না।

বিবেকানন্দের যশঃসৌরভে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া একদল গোঁড়া অদূরদর্শী খৃষ্টান তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। আক্রোশ চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা তাঁহাকে বিপন্ন ও অপদস্থ করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। কোন কোন সংবাদপত্র তাঁহার সম্বন্ধে অলীক নিন্দা প্রচার করিয়া, তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়া, তাহাকে ভণ্ড, প্রতারক প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু বহু সম্ভ্রান্ত, উচ্চপদস্থ ও শিক্ষাভিমানী ভদ্রলোক ও মহিলা তাঁহার পক্ষপাতী; সুতরাং সেই সকল হীনমতি লোকের কোনও চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। কোনও দুষ্টলোক দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত হইয়া তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলে তিনি উহার মনের ভাবটি প্রকাশ করিয়া দিতেন। সে ব্যক্তি তখন অপ্রতিভ হইয়া পলায়ন করিত, নয় ত তাঁহার শরণাপন্ন হইত।

আমেরিকার কোনও বক্তৃতা-কোম্পানী স্বামীজীকে আমেরিকার বিভিন্ন নগরে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ

দেখিলেন, ইহাতে সুবিধা আছে। বক্তৃতা-কোম্পানী তাঁহাকে যে অর্থ দিবেন, উহা দ্বারা তিনি ভারতে ধর্ম্ম ও লোকহিতকর অনুষ্ঠানেও অর্থ-সাহায্য করিতে পারিবেন। উক্ত কোম্পানীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তিনি আমেরিকার সর্ব্বত্র গমন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ ও ভ্রমণবৃত্তান্ত এখন দুষ্প্রাপ্য। তবে এই সকল বক্তৃতা দ্বারা তিনি আমেরিকাবাসীর মন হইতে ভারতবাসীরা অসভ্য এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করিতে পারিয়াছিলেন।

বক্তৃতা করিবার সময় অনেকে অনেক প্রকার স্বামীজীকে পরীক্ষা করিয়াছিল। একবার একস্থলে নিমন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতা করিবার সময় তিনি দেখিলেন যে, মধ্যস্থলে একটি কাঠের গামলা উপুড় করিয়া রাখা হইয়াছে। স্বামীজ অম্লানবদনে তাহার উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সহসা বন্দুকের ভীষণ শব্দ হইল। একটা গুলী তাহার কাণের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। স্বামীজীর বক্তৃতায় কোন বাধা জন্মিল না। তিনি অবিচলিতভাবে বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন। বক্তৃতাশেষে শ্রোতৃগণ বলিল, পরীক্ষার জন্যই তাহারা ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিল; এজন্য তাহারা দুঃখিতান্তকরণে ক্ষমা চাহিতেছে।

বক্তৃতা কোম্পানীর অধ্যক্ষেরা স্বামীজীর সাহায্যে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, অথচ তাঁহাকে যৎসামান্য মাত্র প্রদত্ত হইত। এক এক দিন তাঁহারা সাড়ে সাত হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়া মাত্র তাঁহাকে ছয় শত টাকা দিতেন। এইরূপ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া স্বামীজী পয়সা লইয়া বক্তৃতা দিবার অভিপ্রায় ত্যাগ করিলেন, আর উক্ত কোম্পানীর সহিত কোনও সংস্রব রাখিলেন না।

পাশ্চাত্যদেশে জাতিবিচার ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী। আমেরিকার হোটেলে নিগ্রো প্রভৃতি কৃষ্ণকায় ব্যক্তির স্থান নাই। অনেকে স্বামীজীকে নিগ্রো মনে করিয়া তাহাদের হোটেলে স্থান দিত না। তিনি ভারতবাসী বলিয়া যদি পরিচয় দিতেন, তবে তাঁহার পক্ষে সর্ব্ব স্থানেই অবারিত দ্বার হইত ; কিন্তু অপরকে ক্ষুদ্র করিয়া নিজে বড় হইবেন, এরূপ ইচ্ছা তিনি কোনও মতেই পোষণ করিতেন না। একবার দক্ষিণ-আমেরিকায় নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন। তত্রত্য কোনও হোটেলে তিনি স্থান পাইলেন না। নিমন্ত্রণকারীরা অবশেষে বহু কষ্টে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেয় ; কিন্তু তিনি, "আমি নিগ্রো নই" এ কথা মুখ ফুটিয়া তখনও বলেন নাই। একদা একজন ধনকুবের তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বাড়ীর দ্বারবান্ নিগ্রো বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। কিছুকাল পরে সেই ভদ্রলোক সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া বলেন, "আপনি আত্মপরিচয় কেন দিলেন না?" উত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "অন্যকে ছোট করিয়া আমি আত্মপ্রতিষ্ঠা করিব? এরূপ নীচ কার্য্যের জন্য আমার জন্ম হয় নাই।"

বক্তৃতা-কোম্পানীর সহিত কাজ করিবার সময় স্বামীজীকে সপ্তাহে বারো চৌদ্দ অথবা তদধিক বক্তৃতা প্রদান করিতে হইত। অত্যধিক পরিশ্রমে সময় সময় তাঁহার শরীর ও মন অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িত। অনেক সময় বক্তব্য বিষয় কিছুই তিনি খুঁজিয়া পাইতেন না। মনে হইত, তাঁহার পুঁজি যাহা ছিল, সব যেন নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিয়াছেন। তখন তিনি পরদিবস কি বক্তৃতা করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেন। এই সময়ে তাঁহার অপূর্ব্ব অনুভূতির উদয় হইত।

নিশীথ-রজনীতে তন্দ্রাঘোরে তিনি যেন শুনিতে পাইতেন, পরদিবস তিনি যে সকল কথা বলিবেন কে যেন উচ্চরবে তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া সেই সকল কথা বলিতেছে। সময়ে সময়ে এই উপায়ে অনেক অপূর্ব্ব তত্ত্ব—নূতন ভাব-রসের বিচিত্র সংবাদ তিনি জানিতে পারিতেন। সে সব এমনই নূতন যে, ইহ-জন্মে কোনও দিন তিনি সে সকল কথা শুনেন নাই বা চিন্তা করেন নাই। নিদ্রাভঙ্গের পর সেই সকল কথা স্মরণ করিয়া তিনি পরদিবস বক্তৃতা দিতেন।

পাশ্চাত্যদেশে অবস্থানকালে স্বামীজীর নানা প্রকার যোগ শক্তিলাভ হইয়াছিল। স্পর্শমাত্রেই তিনি লোকের জীবনের গতি নূতন পথে পরিচালিত করিতে পারিতেন। বহুদূরের ঘটনাবলী সুস্পষ্ট নয়নগোচর হইত। কাহারও মুখের দিকে চাহিবামাত্র তাহার অতীত জীবনের সমগ্র ইতিহাস পর্য্যন্ত তিনি বলিয়া দিতে পারিতেন।

স্বামীজীর বিজয়-বার্ত্তা ভারতবর্ষে বিঘোষিত হইলে সকলেই আনন্দে উল্লাসিত হইয়া উঠিলেন। পরমহংসদেবের ও বিবেকানন্দের জয়ধ্বনি ভারতবর্ষের আকাশ ও বাতাসকে মুখরিত করিয়া তুলিল। বহু শতাব্দীর পর মুমূর্ষু ভারতবাসী যেন সঞ্জীবন-মন্ত্রে প্রাণ পাইয়া জাগিয়া উঠিল। স্বামীজীর নিকট আনন্দোৎফুল্ল, মত্ত ভারতবর্ষের হৃদয়োত্থিত কৃতজ্ঞতা নিবেদিত হইল।

স্বামীজীর ছাত্রসংখ্যা আমেরিকায় ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে "গ্রিন্‌একার কন্‌ফারেন্স" নামক সমিতির কতিপয় অধিবেশনে তিনি বক্তৃতা করেন। সেখানে কয়েকজন ছাত্রও জুটিয়াছিল। তাহারা একটি বৃহৎ ও প্রাচীন দেবদারু-বৃক্ষের তলে বাঙ্গালীর ন্যায় অসানপিঁড়ি হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক স্বামীজীর প্রমুখাৎ

বেদান্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিত। এখনও সেই বৃক্ষটি "স্বামীজীর দেবদারু" নামে অভিহিত।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী নিউইয়র্কে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। তখন ইতস্ততঃ পর্য্যটন ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা স্থগিত রাখিয়া রীতিমত ক্লাস খুলিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কয়েকটি বাছা বাছা শিষ্যকে ধ্যান-ধারণাও শিক্ষা দেওয়া হইত। ধ্যান-শিক্ষা দিতে গিয়া সময়ে সময়ে স্বামীজী নিজে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। ক্লাসে প্রধানতঃ রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের শিক্ষা প্রদত্ত হইত। এ সময়ে স্বামীজী যোগিজনোচিত সংযম, আহারাদি সকল বিষয়েই পালন করিতেন।

অনেকগুলি প্রসিদ্ধ মার্কিণ স্বামীজীর অনুরাগী, পৃষ্ঠপোষক ও শিষ্যশ্রেণীর অন্তর্গত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইজন প্রকাশ্যভাবে সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শিষ্য বলিয়া আপনাদিগকে অভিহিত করিতেন। এক জনের নাম ম্যাদাম্ মেরী লুই। ইনি ফরাসী রমণী। অপরটি একজন রুসীয় ইহুদী। ইনি নিউইয়র্কের কোন প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রের লেখক ও পরিচালক ছিলেন। দীক্ষা-গ্রহণের পর ম্যাদাম্ লুই স্বামী অভয়ানন্দ ও ইহুদী ভদ্রলোকটি স্বামী কৃপানন্দ নামে পরিচিত হন। এইরূপে স্বামীজী আমেরিকায় বেদান্তধর্ম্ম-প্রচারের দ্বারা ছয় মাসের মধ্যে সহস্র সহস্র ভক্ত ও শিষ্য লাভ করিয়াছিলেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু স্বামীজী অতঃপর বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার কোনও শিষ্য তাঁহাকে "সহস্র-দ্বীপোদ্যান" নামক দ্বীপে পরমরমণীয় নির্জ্জন কুঞ্জকুটীরে কয়েক দিন বিশ্রামের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে

গ্রীষ্মকালটি স্বামীজী এইখানেই যাপন করিয়াছিলেন। এই স্থানে অবস্থানকালে একদিন নদীতীরে বসিয়া তিনি নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত "সন্ন্যাসীর গান" এইখানেই রচিত হয়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কয়েকজন ইংরাজ বন্ধুর নিমন্ত্রণে স্বামীজী ইংলণ্ডে গমন করেন। এ দিকে খৃষ্টান মিশনারীরা তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ষড়্‌যন্ত্র পাকাইয়া তাঁহার দুর্নাম ঘোষণা করিতে থাকে। বাধ্য হইয়া স্বামীজীকে অনেক সময় তাহাদের কল্পিত অপবাদের জবাব দিতে হইত।

ইংলণ্ডে স্বামীজী মহাসমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধু মিঃ ষ্টার্ডি ও মিস্ হেনরিয়েটা তাঁহাকে নিজ নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। লণ্ডনে উপস্থিত হইবার পর এক মাসের মধ্যেই কয়েকটি বক্তৃতা দিয়া স্বামীজী নগরের অধিবাসিবৃন্দের চিত্তে শ্রদ্ধার আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন। এই সময়ে মিস্ মার্গারেট নোবল (ইনিই উত্তরকালে ভগিনী নিবেদিতা নামে পরিচিতা) স্বামীজীর প্রথম দর্শন লাভ করেন।

বিবেকানন্দের বক্তৃতা-শ্রবণে বিলাতের লোক এমনই মুগ্ধ হইল যে, ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহাদের ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া স্বামীজীকে বেদান্তধর্ম্ম ব্যাখ্যার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভদ্রমহিলারা স্থানাভাবে অনেক সময় গৃহতলে বসিয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন।

কিছুদিন পরে স্বামীজীকে পুনরায় আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। সেখানে কয়েকটি স্থায়ী ধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্র সংস্থাপিত হইল। স্বামীজীর অনুপস্থিতিকালে স্বামী কৃপানন্দ, অভয়ানন্দ ও মিস্ ওয়াল্ডো আমেরিকায় প্রচারের কার্য্য পরম উৎসাহভরে সম্পাদন করিতেছিলেন। স্বামীজী আমেরিকায় আসিয়া পুনরায় বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এই সময় মিঃ জে, জে, গুড্উইন নামক জনৈক বিশিষ্ট সাঙ্কেতিক লিপি কুশল (Short-hand) ব্যক্তি নিউইয়র্কে আসিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তিনি নিযুক্ত হইলেন। অত্যল্পকাল পরে গুড্উইন সাহেব স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুড্উইন সাহেবের অক্লান্ত চেষ্টায় স্বামীজীর পরবর্ত্তী বক্তৃতাগুলি রক্ষিত হইয়াছে। প্রচার-কার্য্যে সহায়তা লাভের জন্য স্বামীজী গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দকে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবার জন্য লিখিলেন। তার পর স্বামীজী ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া স্বামী সারদানন্দকে আমেরিকায় পাঠাইয়া দিবেন স্থির করিলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তারিখে স্বামীজী পুনরায় লণ্ডন-নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্বামী সারদানন্দ ইতিমধ্যে লণ্ডনে পৌঁছিয়াছিলেন। উভয়ে মিস্ মুলার ও মিঃ ষ্টার্ডির অতিথিরূপে বাস করিয়া ইংলণ্ডে প্রচারের কার্য্য পূর্ণ উদ্যমে চালাইতে লাগিলেন।

অক্সফোর্ডে অধ্যাপক মোক্ষমূলরের সহিত স্বামিজীর সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজীর সহিত আলাপে অধ্যাপকপ্রবর অত্যন্ত মুগ্ধ হন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-চরিত লিখিবার উপকরণ স্বামীজী আচার্য্য মোক্ষমূলরকে প্রদান করিয়াছিলেন।

বহুদিন গুরুতর পরিশ্রম করাতে স্বামীজীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। কিছুদিন বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন বোধে তিনি গুরুভ্রাতৃযুগল ও শিষ্যগণের উপর প্রচার ভার অর্পণ করিয়া মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বিদায়ের দিন রাত্রিকালে ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া অতিবৃদ্ধ অধ্যাপক মোক্ষমূলর স্বামীজীকে বিদায়কালীন অভিনন্দন জানাইবার জন্য স্বয়ং রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। স্বামীজী লজ্জাকুণ্ঠিত আননে

অধ্যাপকপ্রবরকে বলিয়াছিলেন, "আমার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না।" অধ্যাপক উত্তরে বলিয়াছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্যতম শিষ্যের দর্শনলাভের সৌভাগ্য সর্ব্বদা ভাগ্যে ঘটিয়া উঠা অসম্ভব।"

দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে আগমন করিয়া স্বামীজী সেভিয়ার দম্পতীকে শিষ্যরূপে লাভ করেন। শ্রীমতী সেভিয়ার শিষ্যা হইলেও স্বামীজী তাঁহাকে মাতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। অদ্যাবধি তিনি সন্ন্যাসীদিগের মাতৃস্থান অধিকার করিয়া মায়াবতীর মঠে অবস্থান করিতেছেন।

জুলাই মাসের শেষভাগে শিষ্য ও বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে স্বামীজী লণ্ডন হইতে জেনেভা নগরে উপস্থিত হন। সেখানে বেলুনে উঠিয়া তিনি সমগ্র স্থানটি দর্শন করেন। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মন অধ্যাপক পলডয়সন স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণকালে স্বামীজী সেই পত্র প্রাপ্ত হন ও তথা হইতে অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য জর্ম্মনীতে গমন করেন। অধ্যাপক সারাজীবন বেদান্তের চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন। স্বামীজীর সহিত আলাপ ও আলোচনায় তিনি পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক কোনও কার্য্যব্যপদেশে ক্ষণকালের জন্য গৃহান্তরে গেলে স্বামীজী একখানি কবিতা-পুস্তক অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। অধ্যাপক ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন; কিন্তু পুস্তকপাঠে স্বামীজীর মন এমনই ডুবিয়া গিয়াছিল যে, অধ্যাপকের আহ্বান তিনি শুনিতে পাইলেন না। পরিশেষে পাঠ শেষ করিয়া চাহিতেই অধ্যাপককেই দেখিতে পাইলেন। তিনি বুঝিলেন অধ্যাপক অনেকক্ষণ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। স্বামীজী ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন যে, তিনি বই পড়িতেছিলেন, তাই তাঁহার ডাক শুনিতে পান নাই। অধ্যাপক কথাটা যে বিশ্বাস করেন নাই, তাহা

তাঁহার আকার ইঙ্গিতেই প্রকাশ পাইল। তখন আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী পঠিত কবিতাগুলি অনর্গল আবৃত্তি করিয়া গেলেন। অধ্যাপক সবিস্ময়ে বলিলেন যে, বোধ হয়, পূর্ব্বে স্বামীজী কবিতাগুলি পড়িয়াছিলেন; নহিলে একবার চক্ষু বুলাইয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে চারিশত পৃষ্ঠায় পুস্তক আয়ত্ত করা মনুষ্যশক্তির বহির্ভূত। স্বামীজী তাঁহাকে মৃদু হাস্যের সহিত বুঝাইয়া দিলেন যে, সংযতমনা যোগীর পক্ষে উহা আদৌ অসম্ভব নহে। আজীবন ব্রহ্মচর্য্যের ফলস্বরূপ এরূপ ক্ষমতা লাভ করা যায়। পাশ্চাত্য জগৎ ইহা বিশ্বাস না করিতে পারে; কিন্তু প্রাচ্য-জগতে এরূপ শক্তিশালী লোকের সংখ্যা একান্ত দুর্লভ নহে।

১৬ই ডিসেম্বর স্বামীজী সেভিয়ার-দম্পতীসহ লণ্ডন ত্যাগ করিলেন। গুড্‌উইন সাহেব নেপল্‌স নগরে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবেন স্থির হইল। চারি বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর ভারতবর্ষের বক্ষে ফিরিবার জন্য স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রতি ধূলিকণা তাঁহার নিকট পবিত্র বিভূতি; মাতৃভূমি যে মাতার যোগ্যতম সন্তানের কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ।

ফ্রান্স ও আল্পস্ পর্ব্বতমালা অতিক্রম পূর্ব্বক মিলান, পিসা প্রভৃতি নগরী দর্শন করিয়া সশিষ্য স্বামীজী ফ্লোরেন্স আসিলেন। তথা হইতে রোমনগর দর্শন করিয়া তাঁহারা নেপ্‌ল্‌সে আসিয়া ভারতগামী জাহাজে আরোহণ করিলেন। গুড্‌উইন সাহেব সেই জাহাজেই ছিলেন।

পথিমধ্যে জনৈক খৃষ্টান পাদরী উপযাচক হইয়া স্বামীজীর সঙ্গে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তর্ক আরম্ভ করে; কিন্তু তর্কে পরাস্ত হইয়া সে ব্যক্তি হিন্দু-ধর্ম্মের অজস্র নিন্দা করিতে থাকে। স্বামীজী দেখিলেন, লোকটা অত্যন্ত অর্ব্বাচীন; যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না। তখন তিনি দৃঢ়বলে তাহার

স্কন্ধদেশ ধারণ পূর্ব্বক গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ফের যদি আমার ধর্ম্মের নিন্দা কর্‌বে, তবে সমুদ্রের জলে তোমায় ফেলে দিব।" পাদরী-পুঙ্গব স্বীকার করিল, সে ভবিষ্যতে এমন অপকার্য্য আর করিবে না।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ১৫ই তারিখে সন্ধ্যাকালে স্বামীজী কলম্বোতে পদার্পণ করেন। বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য নগরের যাবতীয় লোক ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছিল। গৈরিক উষ্ণীষধারী, ভারতবর্ষের যোগ্যতম সন্তানের পবিত্রমূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই বিপুল জনতা জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিল। সমাদরে মহাসমারোহে অভ্যর্থিত হইয়া বিবেকানন্দ সভামণ্ডপে নীত হইলেন। শত শত ব্যক্তি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

কলম্বোবাসিগণের বিশেষ আগ্রহে তিনি ১৮ই তারিখ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেরই হৃদয়ে হিন্দুধর্ম্মের লুপ্তপ্রায় বিস্মৃত-গৌরব-কাহিনী জাগিয়া উঠিল। নূতন আশার বাণী সকলের হৃদয়ে নবজীবনের স্পন্দন-সঞ্চার করিল।

সিংহল ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থান হইতে ক্রমাগত সাগ্রহ আহ্বান আসিতেছে দেখিয়া স্বামীজী জাহাজে চড়িয়া মান্দ্রাজে যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। স্পেশাল ট্রেণে কাণ্ডি এবং তথা হইতে জাফ্‌নায় গমন করিলেন। তথা হইতে গুরুভ্রাতা নিরঞ্জনানন্দ স্বামীকে সঙ্গে লইয়া সশিষ্য স্বামীজী রামনাদে উপস্থিত হন। রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি গুরুদেবের দর্শন-মানসে নৌকাসহ ষ্টীমারে-ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী নামিবামাত্র সপারিষদ রাজা গুরুর চরণ-বন্দনা করিয়া তীরে উপনীত হইলেন। তার পর গাড়ীতে বসাইয়া রাজা স্বয়ং নগ্নপদে শোভাযাত্রার সঙ্গে হাঁটিয়া স্বামীজীকে স্বরাজ্যে লইয়া

গেলেন। স্বামীজী যে স্থলে প্রথম অবতীর্ণ হন, রামনাদরাজ তথায় চল্লিশ ফুট উচ্চ একটি স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

স্বামীজীর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের শুভ সংবাদ অচিরকালমধ্যে বিঘোষিত হইল। সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার নামে মাতিয়া উঠিল। রামনাদ হইতে মান্দ্রাজে যাইবেন জানিতে পারিয়া পথিমধ্যে যে সকল ষ্টেশন বা নগর ছিল, তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। স্বামীজী কাহারও আবেদনে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। পরমকুড়ি, মদুরা, কুম্ভকোনম্ প্রভৃতি স্থানে নামিয়া তিনি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ষ্টেশনে সহস্র সহস্র দর্শক তাঁহাকে দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। কোন কোন ষ্টেশনে ট্রেণ থামাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করাও হইয়াছিল। একটি ছোট ষ্টেশনে সকল গাড়ী থামিত না। তত্রত্য শত শত লোক ষ্টেশনে সমবেত হইয়া ষ্টেশন-মাষ্টারকে গাড়ী থামাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ষ্টেশন-মাষ্টার কি করিবেন ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্ব্বেই পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেশন হইতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখন গাড়ী থামাইবার অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া কয়েকজন সাহসী বীর রেল-লাইনের উপর শুইয়া পড়িলেন। এই দৃষ্টান্তে বহু ব্যক্তি সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। ষ্টেশন মাষ্টার প্রমাদ গণিয়া রক্ত পতাকা দেখাইতে লাগিলেন। ট্রেণ থামিল। তখন স্বামীজীর জয়ধ্বনিতে চারিদিক নিনাদিত হইল। সমবেত জনমণ্ডলী স্বামীজীকে অভিনন্দন জানাইয়া কৃতার্থ হইলেন।

স্বামীজী মান্দ্রাজে যে ভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন, তেমন সমারোহ আর কখনও হয় নাই। মান্দ্রাজের সমুদয় অধিবাসী সম্মিলিত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। সমস্ত নগরটি পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত

হইয়াছিল। সতেরটি সুদৃশ্য তোরণও নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্বামীজী নয়দিন মান্দ্রাজে ছিলেন। এই নয়দিন মান্দ্রাজ সহর উৎসব-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখানে তিনি যে কয়টি বক্তৃতা দেন, "ভারতে বিবেকানন্দ" নামক গ্রন্থে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে পুনঃ পুনঃ সাগ্রহ আহ্বান আসিয়া স্বামীজীকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবও আসন্ন প্রায়; সুতরাং স্বামীজী মান্দ্রাজ হইতে জলপথে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

জাহাজ হইতে ডায়মণ্ড-হারবারে নামিয়া স্পেশাল ট্রেণে সশিষ্য স্বামীজী শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপনীত হইলেন। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীর, মাতৃভূমির সুযোগ্য সন্তান, দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসীকে বরণ করিবার জন্য সহস্র সহস্র দর্শক ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছিলেন। যুবকগণ তাঁহাকে গাড়ীতে বসাইয়া নিজেরাই উহা টানিয়া লইয়া চলিলেন। পত্র-পল্লব ও পুষ্পমালায় সুশোভিত তিনটি তোরণ পার হইয়া শকট রিপণ কলেজের সম্মুখে উপনীত হইল। রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের ভবনে মধ্যাহ্ন যাপনের পর স্বামীজী ইউরোপীয় শিষ্যগণসহ কাশীপুরের শীলের বাগান-বাটীতে চলিয়া গেলেন। এইখানেই তাঁহাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তথায় দিবাভাগ যাপন করিয়া স্বামীজী রাত্রিকালে আলমবাজারের মঠে চলিয়া যাইতেন। শত শত লোক দর্শনপ্রার্থী হইয়া প্রত্যহ তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত। স্বামীজী প্রত্যেকের সহিত আলাপ ও তাঁহাদের প্রশ্নসমূহের সদুত্তর প্রদান করিতেন।

আলমবাজারাবস্থিত অন্যান্য রামকৃষ্ণ-শিষ্য-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে পরম সাদরে অভ্যর্থনা করিলেও সহসা তাঁহার প্রচারিত সন্ন্যাস ও

কর্ম্মযোগের আদর্শ গ্রহণ করিলেন না। ধ্যান-ধারণা তপস্যার দ্বারা আত্মার মোক্ষলাভের জন্যই তাঁহারা চিরাচরিত প্রথা অবলম্বন পূর্ব্বক কালাতিপাত করিতেছিলেন। স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে কেবল আত্মসাক্ষাৎকার হইলেই চলিবে না। নিজের মুক্তিই চরম কাম্য নহে। কোটী কোটী নরনারীর অজ্ঞতা দূর করিয়া তাহাদিগকে মুক্তির সন্ধান বলিয়া দিতে হইবে। এমন একটি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় গঠন করিতে হইবে—যাহারা নিজের মুক্তি চাহে না; দেশের কল্যাণকামনায় নরকে যাইতেও দ্বিধা করিবে না। "যত্র জীব তত্র শিব" এই মন্ত্রে বিরাটের, অনন্তের পূজা করিতে হইবে। পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিতে না পারিলে মানবদেহধারণাই বৃথা। পরমহংসদেবের শিষ্য যাঁহারা, তাঁহাদিগকে দেশের মুক্তিতে, দশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে।

স্বামীজীর বক্তব্য ক্রমে সন্ন্যাসিবৃন্দের হৃদয়ে স্থান পাইল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের পূজা ছাড়িয়া বেদান্ত-প্রচারের জন্য দাক্ষিণাত্যে এবং স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ জেলায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর সেবার জন্য চলিয়া গেলেন। অন্যান্য গুরুভ্রাতারাও নানাপ্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

বহু পরিশ্রমে স্বামীজীর সুদৃঢ় দেহ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। চিকিৎসকের পরামর্শে অবশেষে তিনি দার্জ্জিলিঙ্গে গিয়া কয়েক মাস যাপন করেন; কিন্তু তাহাতেও স্বাস্থ্যের উন্নতি হইল না। তখন তিনি পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন ঋগ্বেদের অধ্যাপনার সময় নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ তথায় উপস্থিত হন। স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, "জি, সি, তুমি এ জিনিষ পড়ার কোন দরকার মনে কর না, কেবল থিয়েটার লইয়াই

সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলে।" গিরিশবাবু উত্তরে বলিলেন, "ও সকল বুঝিবার বুদ্ধি ও অবকাশ দুই-ই আমার নাই। ভগবান্ রামকৃষ্ণের কৃপায় ভবসমুদ্র পার হয়ে চ'লে যাব। তুমি লোকশিক্ষা দিবে, তাই তিনি তোমার ও সব পড়িয়েছেন।" তার পর গিরিশবাবু আবার বলিলেন, "আচ্ছা নরেন, বেদ-বেদান্ত তো ঢের প'ড়েছ; কিন্তু অন্নাভাবে ক্ষুধিতের চীৎকার, দরিদ্রের অসহনীয় দুঃখ, লম্পটের হস্তে সতীর লাঞ্ছনা প্রভৃতি নানাপ্রকার ভীষণ ব্যাপার ঘটছে, বেদ-বেদান্তের মধ্যে কি এর কোন প্রতিকার পেয়েছ?" স্বামীজী অশ্রুসিক্ত লোচনে, ভাবাবেগ-পূর্ণ-হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া স্বামী সদানন্দকে রুগ্ন, আতুর ও আর্ত্তের সেবার জন্য একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার উপদেশ দিলেন। এই দিন স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "জগতে এক জনের দুঃখ-কষ্ট দূর করবার জন্যও আমি হাজারবার জন্মগ্রহণ করিতে রাজি আছি, নিজের মুক্তি তুচ্ছ, উহা চাই না। প্রত্যেকে যাতে মুক্ত হইতে পারে, আমি সেই সাহায্য করতে চাই।"

সেবাশ্রম, মঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামীজী বহু চেষ্টা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শরীরের অবস্থা ক্রমেই অবনতির পথে চলিতেছে দেখিয়া, গুরুভ্রাতা ও শিষ্যবর্গ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে মিস্ মুলর ইংলণ্ড হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। এদিকে চিকিৎসকগণ স্বামীজীকে পরামর্শ দিলেন, বায়ু-পরিবর্ত্তন ও বিশ্রাম অত্যাবশ্যক। বাধ্য হইয়া কতিপয় শিষ্য ও গুরুভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজীকে আলমোড়ায় গমন করিতে হইল।

হিমালয়ে নির্জ্জন অরণ্যানীর মধ্যে আত্মগোপন করিলেও স্বামীজী বহির্জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে নির্লিপ্ত রাখিতে পারিলেন না।

তাঁহার যশঃ, প্রতিপত্তি ও ভূয়সী প্রতিষ্ঠা দর্শনে কতিপয় মিশনরী আমেরিকায় তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুৎসা রটনা করিতেছিল। স্বামীজীর ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার অত্যল্পকাল পরেই চিকাগো ধর্ম্মমহামেলার সভাপতি ডাক্তার বারোজ, এ দেশে আসিয়াছিলেন। তিনিও স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্বামীজীর নিন্দাপ্রচারে যোগ দিলেন। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি ভারতে আসিয়া মার্কিণ রমণীদিগের আচার-ব্যবহারেরও নিন্দা রটাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া স্বামীজী স্বদেশবাসিগণের নিকট যেরূপ আদর-অভ্যর্থনা পাইয়াছেন বলিয়া কাগজে বাহির হইয়াছিল। তাহা অতিরঞ্জিত, ভারতবাসীরা তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, বিবেকানন্দ অতি নিম্ন শ্রেণীর লোক, হিন্দু-সমাজে তাঁহার কোনও প্রতিষ্ঠাই নাই, এই প্রকার নানাকথা আমেরিকার কয়েকখানি সংবাদপত্রে প্রচারিত হইতে আসিল। স্বামীজীর স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ভক্তগণ স্বামীজীর সম্বন্ধে এবম্প্রকার মিথ্যা রটনা শুনিয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু যাঁহার সম্বন্ধে এত গোলযোগ, তিনি হিমালয়ের মত অচল অটল হইয়া রহিলেন। পৃথিবীতে যাঁহারা নূতন বার্ত্তা বহন করিয়া আসেন, তাঁহাদের সকলেরই অদৃষ্টে এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসই তাহার সাক্ষী। স্বামীজী সে সব নিন্দাকে উপেক্ষা করিয়া আপন কার্য্যসম্পাদনে অবহিত হইলেন।

মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারীর দুঃখনিবারণকল্পে স্বামী অখণ্ডানন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন জানিতে পারিয়া স্বামীজীর হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিল। তিনি নিত্যানন্দ স্বামী ও সুরেশ্বরানন্দ স্বামীকে তাঁহার সাহায্যকল্পে পাঠাইয়া দিলেন; নিজেও উক্ত অঞ্চলে যাইবার জন্য

ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন ; কিন্তু চিকিৎসকগণ নিবারণ করায় অগত্যা তাঁহাকে সে সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইতে হইল।

স্বামীজী সংবাদ পাইলেন, কলিকাতা ও মান্দ্রাজ উভয় স্থলের কার্য্যই সুন্দররূপে চলিতেছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেও প্রচার-কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইতেছিল। চারিদিক্ হইতে সাফল্যের সংবাদ শুনিয়া তাঁহার হৃদয় নবীন উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আড়াইমাসকাল আলমোড়ায় যাপনের পর স্বামীজী সমতলক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। বেরেলী, অম্বালা, অমৃতসহর প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন থাকিয়া তিনি রাউলপিণ্ডিতে গমন করেন। সেথান হইতে মরি ও বাক্‌মূলা হইয়া স্বামীজী জলপথে শ্রীনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভূস্বর্গ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের প্রধান বিচারপতি ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বামীজীকে সসম্মানে নিজ ভবনে রাখিয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। কাশ্মীরের জলবায়ুর গুণে স্বামীজী কিছু সুস্থ হইলেন। কাশ্মীর-রাজ স্বামীজীকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহাকে উচ্চাসনে বসাইয়া সপারিষদ রাজা নিম্নে উপবেশন করিয়া তাঁহার মুখনিঃসৃত আলোচনা শ্রবণ করিলেন। জলবিহারে স্বামীজীর স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে বিবেচনা করিয়া উজীর সাহেব স্বামীজীর জন্য বজরার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

কয়েকদিন পরে স্বামীজী নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া সমতলক্ষেত্রে পুনরায় নামিয়া আসিলেন। লাহোরে অবস্থানকালে আর্য্যসমাজী স্বামী অচ্যুতানন্দ, প্রকাশানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন প্রচারক স্বামীজীর জ্বলন্ত উৎসাহে অণুপ্রাণিত হইয়া বেদান্তপ্রচার কার্য্যে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন। অতঃপর দেরাদুনে স্বামীজী শারীরিক অসুস্থতার জন্য কয়েকদিন বাস করিলেন। খেতড়ী হইতে স্বামীজীর আমন্ত্রণ সূচক পত্র আসিতে

লাগিল। সে আমন্ত্রণে তিনি উপেক্ষা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। আলোয়ারে উপনীত হইলে তাঁহার অভ্যর্থনার প্রচুর আয়োজন হইল। ষ্টেশনে একটি দরিদ্র শিষ্যের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজী সর্ব্বাগ্রে তাহাকে ডাকিয়া কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। আলোয়ারে চারি পাঁচদিন অতীত হইল। তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যমণ্ডলী এই সময় লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, বিশ্ববরেণ্য বিবেকানন্দ, অতুল প্রতিষ্ঠা ও মান-সম্ভ্রম লাভ করিয়াও পূর্ব্ববৎ তেমনই বন্ধুবৎসল, দীনদরিদ্রের প্রতিপালক, স্নেহপরায়ণ সন্ন্যাসীই আছেন। বহুদিন পূর্ব্বে এক দরিদ্রা বিধবা ভক্তিমতী মহিলার আতিথ্য তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন; একদিন স্বামীজী উপযাচক হইয়া সশিষ্য তাঁহার গৃহে 'চাপাটী' ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া আসিলেন।

আলোয়ার হইতে স্বামীজী খেতড়ীতে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। কিছুকাল এখানে থাকিয়া তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। "ছুৎমার্গের" ফলে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, এই সম্বন্ধে তিনি একটি চমৎকার বক্তৃতাও দেন। রাজশিষ্যের আলয়ে কয়েকদিন মহানন্দে যাপনের পর স্বামীজী কিষেণগড়, আজমীর, যোধপুর, ইন্দোর প্রভৃতি স্থলে বক্তৃতা করিয়া খাণ্ডোয়ায় উপনীত হইলেন। সেখান হইতে আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হওয়াতে তাঁহাকে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল।

ভাগীরথীতীরে একটি মঠ নির্ম্মাণের সংকল্প বহুদিন হইতেই স্বামীজীর মনে উদিত হইয়াছিল। গুরু ভ্রাতৃগণ তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে উপযুক্ত

ভূমির সন্ধানে ছিলেন। বেলুড় গ্রামে জমীর সন্ধান পাইবামাত্র স্বামীজীর ভক্ত মিস্ হেনরিয়েটা মূলরের প্রদত্ত অর্থে উক্ত ভূমি ক্রয় করা হইল। মঠের জমী সমতল করিয়া প্রাচীন একতল গৃহকে সংস্কৃত করিয়া দ্বিতলে পরিণত করিতে যে অর্থ ব্যয়িত হয়, স্বামীজীর লণ্ডনস্থ শিষ্যগণ তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। বেলুড়-মঠে যে বর্ত্তমান ঠাকুরঘরটি আছে, স্বামীজীর মার্কিণ শিষ্যা মিসেস্ ওলিবুল উহা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। শুধু তাহাই নহে, এই মহীয়সী নারী মঠের সন্ন্যাসীদিগের ব্যয়ভার নির্ব্বাহার্থ একলক্ষ মুদ্রাও দান করেন। বেলুড়-মঠের নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আলমবাজার হইতে মঠটি গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্ত্তী নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগান-বাড়ীতে উঠিয়া আসিল। স্বামীজী সশিষ্য এই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

জানুয়ারী মাসের শেষভাগে মিস্ মার্গারেট নোবল ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী ব্রহ্মচারিণী নোবলকে (নিবেদিতাকে) দীক্ষাদান করিলেন। ইঁহার শিক্ষার ভার সুযোগ্য শিষ্য স্বরূপানন্দের হস্তে অর্পিত হইল।

স্বামীজী এই সময় শিষ্যবৃন্দকে স্বয়ং শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন; কিন্তু শরীর ক্রমেই অসুস্থ হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া পুনরায় বায়ু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল। অবশেষে চৈত্রমাসে তিনি দার্জ্জিলিঙ্গে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া তাঁহার শরীর ক্রমেই সুস্থ হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সেই সময় কলিকাতায় প্লেগ-রোগের মহা প্রকোপের কথা অবগত হইয়া স্বামীজী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ত্যাগ ও সেবার অবতার বিবেকানন্দ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতায় আসিয়া গুরু-ভ্রাতা ও শিষ্যগণ সহ তিনি আর্ত্ত, বিপন্ন ও

পীড়িতের সাহায্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। সেই সময় অর্থের বিশেষ অভাব অনুভূত হইল। জনৈক গুরুভ্রাতা যখন বলিলেন, "এত টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে?" উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, "টাকা না পাওয়া যায়, মাঠের জমী বেচিয়াও এ কাজ করিতে হইবে। আমরা সন্ন্যাসী, আমরা গাছের তলায় থাকিব; এত লোক আমাদের চক্ষুর সমক্ষে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিবে, আর আমরা থাক্‌বো মঠে?" কিন্তু সুখের বিষয়, অর্থের কিছুমাত্র অভাব হইল না; চারিদিক্ হইতে উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য আসিতে লাগিল। "যত্রজীব তত্র শিব" এই মহামন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি বিবেকানন্দ কর্ম্মের দ্বারা, সেবার দ্বারা স্বদেশবাসীকে সে যাত্রায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, নারায়ণজ্ঞানে জীবমাত্রকে কেমন করিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিতে হয়।

প্লেগের প্রকোপ কমিয়া গেলে স্বামিজী সে কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া সশিষ্য নাইনিতালে গমন করিলেন। তথা হইতে আলমোড়ায় গিয়া সেভিয়ার-দম্পতীর বাংলায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য-দেশীয় শিষ্যগণ নিকটবর্ত্তী আর একটি বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আলমোড়ায় আসিয়া স্বামীজী নির্জ্জনতার অতিমাত্র ভক্ত হইয়া উঠিলেন, বেশীক্ষণ কোন আলোচনায় যোগ দিতেন না; নির্জ্জনে ধ্যান-ধারণা করিতেন। ৫ই জুন তারিখে তিনি দুইটি দুঃসংবাদ শ্রবণ করেন;— পাওহারী বাবা দেহরক্ষা করিয়াছেন ও ২রা জুন তারিখে মিঃ গুড্‌উইন্ জ্বররোগে উত্তকামণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। স্বামিজী ধীরভাবে দুঃসংবাদ শ্রবণ করিলেন বটে, কিন্তু গুড্‌উইনের অকাল-বিয়োগে একজন কর্ম্মীর অভাব হইল, এজন্য তিনি যে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন, তাঁহার শিষ্যগণ পরে তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন।

অতঃপর স্বামীজী পুনরায় শ্রীনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে আসিয়াই তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। প্রায়ই তিনি শিষ্যগণের অজ্ঞাতসারে স্বীয় নৌকারোহণে অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। ৪ঠা জুলাই মার্কিণ শিষ্যগণের অতি পবিত্র দিন। "স্বাধীনতার দিন" বলিয়া স্বামীজী এতদুপলক্ষে শিষ্যগণকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য গোপনে আয়োজন করিতে লাগিলেন। মার্কিণ শিষ্যগণ সেদিন তাঁহার নৌকায় প্রাতরাশ সমাপন করিলেন। স্বামীজী ৪ঠা জুলাই উপলক্ষে একটি ইংরাজী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ভাবসম্পদে কবিতাটি অতি চমৎকার। স্বামিজীর মুখে উহার আবৃত্তি শুনিয়া শিষ্যগণ পরম পরিতৃপ্ত হন।

কাশ্মীরের ক্ষীরভবানীর মন্দির-দর্শনে গমনকালে স্বামীজী কোনও শিষ্যকে সঙ্গে গ্রহণ করেন নাই। এখানে স্বামীজী কঠোর তপস্যা করেন। মুসলমানের অত্যাচারে ভগ্ন মন্দির দর্শনে বিবেকানন্দের মনে হইল, "হিন্দুরা মার মন্দির রক্ষা করিতে পারিলেন না; আমি যদি তখন থাকিতাম, প্রাণপণে মার মন্দির রক্ষা করিতাম।" বিস্ময়ের বিষয়, ঠিক সেই সময় কে যেন বলিয়া উঠিল, "তুই আমাকে রক্ষা করিস্, না আমি তোকে রক্ষা করি?" এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে স্বামীজী যার পর নাই বিস্মিত হন। পরদিবস তিনি সেই স্থানে বসিয়া সংকল্প করিলেন, মায়ের মন্দিরটির সংস্কার করিবার জন্য অর্থসংগ্রহ করিবেন। আবার তিনি অনুরূপ বাণী শুনিতে পাইলেন, "আমার ইচ্ছা হইলে কি আমি এখানে সোনার সাততালা মন্দির তৈয়ার করিতে পারি না?" কর্ম্মযোগী স্বামীজী বুঝিলেন, মহামায়ার বিরাট ইচ্ছাতেই তিনি যন্ত্রবৎ চালিত হইতেছেন। এই প্রত্যাদেশের পর হইতেই স্বামীজী অত্যন্ত গম্ভীর ও বিমনা হইলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজী নবনির্ম্মিত বেলুড়-মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাবশেষ-রক্ষিত পূত তাম্রাধার ও তাঁহার প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠার কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ তারিখে উদ্বোধন পত্রিকা প্রচারিত হইল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ও আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকল্পে স্বামীজীর নির্দ্দেশমতেই উক্ত পত্রিকার আবির্ভাব হয়। স্বামী ত্রিগুণাতীত উহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

শরীর দিন দিন ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া সকলের পরামর্শে স্বামীজীকে প্রতীচ্যদেশে যাত্রার জন্য পুনরায় আয়োজন করিতে হইল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা সহ তিনি ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। লণ্ডনে পৌছিয়া কয়েক দিবস অবস্থানের পর পুনরায় তিনি সশিষ্য আমেরিকায় উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী এ যাত্রা অধিকাংশ সময় কালিফোর্ণিয়ায় ছিলেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে প্যারীনগরীতে একটি ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সভা হইবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম-যাজকগণ এই সভার ঘোরতর বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। চিকাগো ধর্ম্ম—মহামেলায় হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব আমেরিকায় বিস্তৃত হইয়াছে, আবার সে আপদ্‌কে ইউরোপে আহ্বান করিয়া কাজ নাই! অবশেষে স্থির হইল, সভায় শুধু ধর্ম্মের ইতিহাসের আলোচনা হইবে। স্বামীজী সেই সভার আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে য়ুরোপে আসিয়া বক্তৃতা করেন। তৎপরে য়ুরোপের নানাস্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক তত্রত্য দার্শনিকগণের সহিত নানাপ্রকার আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের চিন্তা-প্রণালী তিনি পাশ্চাত্য-দার্শনিকগণকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে মিশর প্রভৃতি দেশ-দর্শনান্তে অকস্মাৎ ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বেলুড়-মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরে তিনি মায়াবতীতে গিয়া আশ্রম পর্য্যবেক্ষণ করেন; জানুয়ারী মাসে তিনি বেলুড়মঠে প্রত্যাবৃত্ত হন। মঠের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দোষভাবে চলিতেছে দেখিয়া তিনি আনন্দিত ও উৎসাহিত হইলেন। অতঃপর শীতকালে তিনি ঢাকা, চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা প্রভৃতি পরিদর্শনের পর নাগ মহাশয়ের বাটীতে গিয়া অতিথি হন। তখন নাগ মহাশয় ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী পরমযত্নে স্বামীজী ও তদীয় শিষ্যগণকে অভ্যর্থনা করিলেন।

শিলং স্বাস্থ্যকর স্থান জানিয়া স্বামীজী কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থান করেন; কিন্তু এখানে তাঁহার কোনও দৈহিক উপকার দেখা গেল না; বরং শ্বাসকৃচ্ছ্রতা বাড়িতে লাগিল। একদিন এমনই অবস্থা দাঁড়াইল যে, আর বুঝি জীবন থাকে না। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া স্বামীজী তখন বলিয়াছিলেন, "এখন দেহত্যাগ হইলেই বাঁচি, আমি জগৎকে বহুবর্ষ চিন্তা করিবার মত পর্য্যাপ্ত উপকরণ দিয়াছি।"

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামভ্রমণ শেষ হইলে স্বামীজী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। বহুমূত্ররোগে তিনি বহুদিন হইতে পীড়িত ছিলেন; এখন তাহার পরিণাম শোথ দেখা দিল। সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত হইল; কবিরাজী ঔষধে অনেকটা উপকারও হইল; কিন্তু স্বামীজী সকল সময় চিকিৎসক-নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন করিয়া চলিতেন না। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্বামীজীর অভিপ্রায়ানুসারে মঠে প্রতিমা গড়িয়া দুর্গোৎসব, লক্ষ্মীপূজা ও শ্যামাপূজা যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইল।

শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন স্বামীজী নবযুগের বার্ত্তা আশানুরূপ ভাবে প্রচার করিতে পারিতেন না। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "আমি দুই হাজার কর্ম্মী যুবক ও ত্রিশকোটী টাকা পাইলে ভারতবর্ষকে নিজের

পায়ের উপর দাঁড় করাইয়া দিতে পারি।" আর একদিন বলিয়াছিলেন, "আমরা জন্মভূমির একটি সামান্য কুকুর—যতদিন পর্য্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় থাকবে, ততদিন তাহাকে আহার-প্রদানই আমার ধর্ম্ম। ইহা ছাড়া আর যা কিছু, সকলই অধর্ম্ম।"

১৯০২ খৃষ্টাব্দে জাপানী পণ্ডিত ওকুয়ার নিমন্ত্রণে স্বামীজী বুদ্ধ-গয়ায় যান, পরে কাশীধামে গমন করেন। কাশী হইতে মঠে আসিয়া স্বামীজীর পীড়া আবার বর্দ্ধিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবের দিন স্বামীজী রোগশয্যায় শায়িত; তথাপি উৎসব-ক্ষেত্রের বিপুল জনতা দেখিবার জন্য একবার জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

স্বামিজীর ধ্যান-ধারণা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। মঠের কার্য্যপ্রণালীর প্রতি তাঁহার উৎসাহ ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল। তিনি যে মহাপ্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, ক্রমে সকলেরই মনে সেইরূপ আশঙ্কা বলবতী হইয়া উঠিল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলিয়াছিলেন, "ও যে কে, যে দিন বুঝতে পারবে, সেই সময়ই আর ও দেহে থাকবে না।" জনৈক গুরুভ্রাতা তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া বুঝিলেন, স্বামীজী স্ব স্বরূপ অবগত হইয়াছেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে স্বামীজী নিজের শরীরকে যেন সুস্থ মনে করিতে লাগিলেন। পরদিন মঠে কালীপূজা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, পূজার আবশ্যকীয় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তিনি ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকের জানালা দরজা রুদ্ধ করিয়া ধ্যানে বসিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা কাল ধ্যানের পর "মন চল নিজ নিকেতনে" গানটি গায়িতে গায়িতে মঠের প্রাঙ্গণে পাদচারণা করিতে লাগিলেন; তারপর সকলের সহিত ভোজনে বসিলেন।

ভোজনান্তে স্বামীজী ব্রহ্মচারিবৃন্দকে সংস্কৃতক্লাশে ডাকাইয়া পাঠ দিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে তিনি স্বামী প্রেমানন্দের সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইয়া বেলুড় বাজার পর্যান্ত গমন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর আরতির সময় স্বামীজী স্বীয় কক্ষে চলিয়া গেলেন; তার পর গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া ধ্যান করিতে বসিলেন। একঘণ্টা ধ্যানের পর তিনি কক্ষতলে শয়ন করিলেন এবং জনৈক ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া বাতাস করিতে বলিলেন। রাত্রি ৯টার সময় তাঁহার হস্ত কম্পিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রিত শিশুর ন্যায় তিনি অস্ফুটস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। দুইবার গভীর দীর্ঘশ্বাস পতিত হইল, অমনই উপাধান হইতে মস্তক গড়াইয়া পড়িয়া গেল। ব্রহ্মচারী স্বামীজীকে তদবস্থ দেখিয়া দৌড়িয়া সকলকে সংবাদ দিলেন। সন্ন্যাসীরা আসিয়া দেখিলেন, পরম যোগী, পরম জ্ঞানী, পরমত্যাগী, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সন্তান নির্ব্বিকল্প সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

হে জ্ঞানযোগিন্ কর্ম্মবীর! হে ত্যাগ-ধর্ম্মের পূর্ণাবতার সন্ন্যাসীপ্রবর! ভারতবর্ষকে, নির্জ্জীব নিস্পন্দপ্রায় দেশবাসীকে জাগাইয়া, মাতাইয়া কর্ম্মপ্রবাহে ভাসাইয়া দিবার জন্য তুমি বহু বহু শতাব্দীর পর অলকনন্দার তীর হইতে এপারে—মর্ত্তাধামে নামিয়া আসিয়াছিলে! তোমার বিশ্ব-বিশ্রুত পাঞ্চজন্য-শঙ্খনাদে আসমুদ্র হিমাচলের ধমনীতে নবজীবনের প্রবাহ কি অপূর্ব্ব ছন্দেই না নৃত্য করিয়া উঠিয়াছে! হে যুগাবতার, কলির নর-নারায়ণ! সংশয়, সন্দেহ, জড়তা ও কর্ম্মহীনতার যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীগুরুর চরণতলে বসিয়া যে মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলে, নিখিল বিশ্বে তুমি তাহা জলদ-গম্ভীর-নিঃস্বনে প্রচার করিয়া গিয়াছ। সমগ্র ভারতবাসী তোমার নিকট শিখিয়াছে—"যত্র জীব তত্র শিব," দরিদ্রনারায়ণের সেবা মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, লোক-সেবাই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তুমি দীপ্তসূর্য্যের ন্যায়

প্রাচীর ললাটে উদিত হইয়াছিলে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোকপ্রবাহে ভাসাইয়া দিয়াছিলে, আবার অত্যল্পকালের মধ্যেই নবযুগের বার্ত্তা দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিয়া কোন্ লোকাতীত রাজ্যে প্রয়াণ করিয়াছ! হে ত্যাগীশ্বর, হে যোগীন্দ্র! তুমি আবার কবে ভারতের তপোবনে অবির্ভূত হইবে? তোমার পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় নবযুগের সন্তানগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। কে বলে তুমি গিয়াছ? তোমার পাঞ্চভৌতিক দেহ ভস্মীভূত হইয়াও দেশের মাটীতে বিভূতিরূপে বিরাজ করিতেছে, তোমার আত্মা দেশের অন্তরে অক্ষয়, অবিনশ্বরভাবে কার্য্য করিতেছে। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনের অপূর্ব্ব মিশ্রণ, আজন্ম-সন্ন্যাসী, জিতেন্দ্রিয় বিবেকানন্দ! তোমা ছাড়া নিখিল বিশ্বে দ্বিতীয় কোনও মানবে এরূপ গুণরাজি আর কেহ দেখে নাই!

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

১৮৪০খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত বাঁশলীবেড়িয়া গ্রামে প্রতাপচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া তিনি পিতামাতার আদরের দুলাল ছিলেন; সমধিক আদর-যত্ন পাইয়াও তিনি লেখাপড়ায় অমনোযোগী ছিলেন না। বাল্যকালে গ্রাম্য-পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ। পাঠশালার পড়া শেষ হইয়া গেলে, তিনি হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হন। এক বৎসর তথায় অধ্যয়ন করিবার পর তিনি কলিকাতা হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হইয়া বাৎসরিক পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হন। প্রত্যেক বিষয়ে তিনি এমন সন্তোষজনক উত্তর লিখিয়াছিলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে একেবারে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া দেন। প্রথম শ্রেণীতে ছয় মাস অধ্যয়নের পর তিনি পাঠে এমন আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করেন যে, কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ পুনরায় তাঁহাকে নিম্ন-বিভাগ হইতে উচ্চতর বিভাগে উন্নীত করেন। এইরূপে অল্পসময়ের মধ্যে তিনি কতকগুলি শ্রেণীতে পাঠ না করায় গণিত-শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তিনি প্রতিভাবলে ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাস প্রভৃতি অনায়াসে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপচন্দ্রের ছাত্রজীবনের অবসান হয়। তিনি কলেজ ছাড়িয়া কোনও ব্যাঙ্কের কার্য্যে নিযুক্ত হন। কেরাণীগিরি করিতে করিতে তাঁহার ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন ঘটে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহিত এই সময় তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। সেই পরিচয়ের ফলে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কেশবচন্দ্রের আদর্শে জীবনকে কর্ম্ম ও ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিবার

সংকল্প করিয়া প্রতাপচন্দ্র ব্যাঙ্কের কাজ ছাড়িয়া দিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ বৰ্দ্ধিত হইল, তিনি প্রচারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

এই সময়ে কলিকাতা হইতে "ইণ্ডিয়ান মিরার" নামক ইংরাজী ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্র বাহির হইতে থাকে। প্রতাপচন্দ্র উক্ত পত্র-সম্পাদন কার্য্যে সম্পাদকের সহায়তা করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। নবধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি সমাজের নানাপ্রকার দোষ বা ত্রুটী সংশোধনের জন্য ইংরাজীতে প্রবন্ধ রচনা করিতেন। পঞ্চবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে প্রতাপচন্দ্র আচার্য্যের পদে নিযুক্ত হইয়া ধর্ম্ম-প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি কখনও হিন্দী, কখনও বাঙ্গালা, কখনও বা ইংরাজী ভাষায় উপাসনা করিতেন।

বক্তৃতা-শক্তি প্রথমতঃ তাঁহাতে বিকসিত হয় নাই। প্রথমাবস্থায় কোনও কিছু বলিবার প্রয়োজন হইলে তিনি দুই চারি কথার পরই নিতান্ত লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইয়া আসন গ্রহণ করিতেন; বক্তব্য বিষয় বাক্যে ফুটিয়া উঠিত না; প্রায়ই গোলমাল হইয়া যাইত। প্রতাপচন্দ্র নিজের এই দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া উহার প্রতীকারের জন্য কঠিন সাধনা আরম্ভ করেন। কিছুদিন তিনি বক্তব্য বিষয় কাগজে লিখিয়া লইয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতেও বহু ত্রুটি ঘটিত; অনেক কথা বলা হইত না, অথবা অবান্তর কথার অবতারণা আসিয়া পড়িত। পুনঃ পুনঃ এইরূপ লজ্জা পাইয়াও তাঁহার উদ্যম-হ্রাস পায় নাই। ক্রমে তিনি নির্জ্জনে আপনার বক্তৃতা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন।

সাধিলেই সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য। প্রতাপচন্দ্রের জীবনে তাহার পর্য্যাপ্ত উদাহরণ দেখা যায়। ক্রমে তাঁহার বাক্‌পটুতা এমন বৃদ্ধি

পাইল যে, তিনি বাগ্মী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা-শক্তির মধ্যে এমন একটা সামঞ্জস্য ও উদ্দীপনা ছিল যে, শ্রোতৃবর্গ তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিত। ক্রমে তাঁহার ধর্ম্মভাব ও বক্তৃতা-শক্তির কথা ইংলণ্ড ও আমেরিকা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য গমন করেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অপূর্ব্ব অধিকার এবং বক্তৃতা করিবার ভঙ্গী দর্শনে ইংলণ্ডের লোক বিস্মিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় ইংলণ্ড মাতিয়াছিল, প্রতাপচন্দ্রের বাগ্মিতাও অল্প সমাদর লাভ করে নাই।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো নগরে নিখিল বিশ্বের ধর্ম্ম-সম্মিলনী হয়। সেই বিরাট্ ধর্ম্মসভায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রতাপচন্দ্র গমন করেন। সেই সভায় বক্তৃতা করিয়া বিবেকানন্দ আমেরিকায় ভাব-রাজ্যে যেরূপ যুগান্তর উপস্থিত করেন, প্রতাপচন্দ্রও "এসিয়ার কাছে জগতের ধর্ম্ম ঋণ" সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

বোষ্টন নগরে প্রতাপচন্দ্র লাউয়েল ইন্‌ষ্টিটিউটে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে চারিটি বক্তৃতা করেন। সে বক্তৃতা শ্রবণের জন্য এত শ্রোতার সমাবেশ হইত যে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রত্যেক বক্তৃতা দুইবার করিয়া দিতে হইয়াছিল। প্রতাপচন্দ্রের বক্তৃতায় মার্কিণগণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বিশিষ্টতা না থাকিলে আমেরিকায় সে ব্যক্তির আদর হয় না। প্রতাপচন্দ্রের বিশিষ্টতা ছিল বলিয়াই তিনি মার্কিণ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রতাপচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে তিনি পৃথিবীর অন্যান্য স্থানও পর্য্যটন করেন। জাপান প্রভৃতি দেশেও তিনি গিয়াছিলেন; সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম-সম্বন্ধে

কিছু না কিছু বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। তাঁহার বাগ্মিতার এমন আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, সর্ব্বদেশের সর্ব্ব সম্প্রদায়ই তাহা সাগ্রহে শ্রবণ করিত।

প্রতাপচন্দ্র "Oriental Christ" "Keshab Chandra Sen", "A Study" প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থনিচয়ের ভাষা সুমার্জ্জিত এবং ভাব উচ্চ আদর্শস্থানীয়। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বহু মনীষী লেখক তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুন্দর ইংরাজী রচনা দর্শন করিয়া গ্রন্থগুলির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীর ইংরাজী রচনা অনেক ইংরাজেরও আদর্শস্থল হইয়াছে।

প্রতাপচন্দ্র ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যেই সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন; কাজেই তাঁহার কার্য্যে ও জীবনযাত্রা-প্রণালীতে তেমন কিছু বৈচিত্র্য ছিল না। অধিকাংশ সময় তিনি পাঠে ও সৎচিন্তায় অতিবাহিত করিতেন। পাঠে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের দিকে তাঁহার চরম লক্ষ্য ছিল। নিভৃতস্থলে বসিয়া তিনি তত্ত্বচিন্তায় অনেক সময় যাপন করিতেন। জীবনের শেষভাগে তিনি তুষার-কিরীটী হিমালয়ের কার্সিয়াং শৃঙ্গে বাস করিয়া ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন; ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

প্রতাপচন্দ্রের চরিত্র ও মনের দৃঢ়তা বাঙ্গালীর আদর্শ। জীবনে তিনি যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি তাহা হইতে বিন্দুমাত্র স্খলিতপদ হন নাই। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করা সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। নীচতা, হীনতা, পরধর্ম্মগ্লানি প্রভৃতি দোষ হইতে ধর্ম্মপ্রচারক প্রতাপচন্দ্র সম্পূর্ণ বিমুক্ত ছিলেন। বাঙ্গালাকে তিনি যার-পর-নাই ভালবাসিতেন। দেশের মঙ্গলানুষ্ঠানে তিনি কোনও দিন অনবহিত ছিলেন না। বঙ্গমাতার সুযোগ্য সন্তানবৃন্দের মধ্যে প্রতাপচন্দ্রের আসন চিরদিনই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে বঙ্গাব্দ ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন, ইংরাজী ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরে কীর্ত্তিচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; জননীর নাম ভারতী দেবী। বালক জন্মগ্রহণ করিবার কিয়ৎকাল পরে, পিতামহ রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দ্দেশক্রমে গ্রহাচার্য্য কেনারাম ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মকোষ্ঠী প্রস্তুত করেন। গণনায় বালকের ভবিষ্যৎ-জীবন অত্যন্ত শুভজনক বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা সামান্য বেতনে কলিকাতায় চাকরী করিতেন। সামান্য আয়ে সংসারের সর্ব্বপ্রকার অভাবের প্রতীকার হইত না; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মগ্রহণের পর হইতেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে ধীরে ধীরে কমলার প্রসন্ন দৃষ্টিপাতের পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। পল্লীর নরনারীরা কথাপ্রসঙ্গে সবিস্ময়ে বলিত, বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবারে সৌভাগ্যবশে ভাগ্যবান্ পুত্র আবির্ভূত হইয়াছে। পল্লীর ইতর-সাধারণ সকলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে বাল্যাবধি স্নেহের ও প্রীতির পাত্র বলিয়া মনে করিত।

পিতামহ রামজয়ের ইচ্ছানুসারেই পৌত্রের "ঈশ্বর" নামকরণ হয়। বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত জেদী ছিলেন ; যাহা ধরিতেন, তাহা সম্পূর্ণ না করিয়া কোনও মতেই নিবৃত্ত হইতেন না। তাঁহার এই "এক-গুঁয়েমি" ভাব চিরদিনই তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে তাঁহার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার প্রভাব পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়।

পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমকালে ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। বীরসিংহ গ্রামের অবস্থা তখন বিশেষ উন্নত হয় নাই। গ্রাম্য পাঠশালাতেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হইলেন। পাঠশালার গুরুমহাশয়ের নাম, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ইনি অতি যত্ন সহকারে বালকদিগকে শিক্ষা দান করিতেন। গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন-কালেই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার স্ফুরণ দেখা গিয়াছিল। তিন বৎসরে পাঠশালায় পাঠ তিনি সাঙ্গ করেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি চমৎকার ছিল। গুরু-মহাশয়, ঈশ্বরচন্দ্রের অধ্যয়নানুরাগ দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, "এই বালক উত্তরকালে দেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইবে।" পাঠশালায় অধ্যয়নকালে ঈশ্বরচন্দ্র প্লীহা ও উদরাময়ে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। অনেক কষ্টে ছয় মাস চিকিৎসার পর মাতুলালয়ে গিয়া তিনি আরোগ্য লাভ করেন। গুরুমহাশয় কালীকান্তের উপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অটল শ্রদ্ধা ঐকান্তিকী ভক্তি ছিল। কালীকান্তের জীবদ্দশায় ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে ভক্তি ত করিতেনই, তাঁহার অবিদ্যমানেও গুরুপত্নী এবং তদীয় সন্তানগণের নানাপ্রকার সাহায্য করিয়া গুরুর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

বাল্যকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। তাঁহার শিশুসুলভ অত্যাচারে পল্লীর অনেকেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত। তাঁহার

দুরন্তপণায় বহু কিংবদন্তী প্রসিদ্ধ আছে। মথুর মণ্ডল নামক জনৈক প্রতিবেশীর প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত অধিক ছিল। মথুরের স্ত্রী ও জননী বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিত। এই স্নেহ ও প্রীতির বিনিময়ে বালসুলভ দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রত্যহ পাঠশালায় গমনকালে মথুরের বাড়ীর দ্বারদেশে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া যাইতেন। মথুরের মাতা ও স্ত্রী অকুণ্ঠিতচিত্তে সেই মলমূত্র পরিষ্কার করিত।

একবার ঈশ্বরচন্দ্রের কণ্ঠনালীতে ধান্যের "সুঙা" বিঁধিয়া যায়। তিনি উহার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়েন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহী অনেক কষ্টে উক্ত "সুঙা" বাহির করিয়া দেন। ধান্যক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া গমনকালে তিনি প্রায়ই ধানের শীষ ছিঁড়িয়া লইয়া চর্ব্বণ করিতেন। একদিন ঐ কার্য্যের ফলেই তিনি উল্লিখিত রূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অনেকেই তাঁহার বাল্যকালের দুরন্তপণার অনেক কাহিনী শুনিয়াছিলেন। কোনও বালককে বাল্যকালে দুষ্টামী করিতে দেখিলে তিনি বলিতেন, "আমিও বাল্যকালে ভারী দুষ্ট ছিলাম। পাড়ার বাগানের ফলমূল পাড়িয়া খাইতাম, কেহ কাপড় শুকাইতে দিয়াছে দেখিলে তাহার উপর মল-মূত্র ত্যাগ করিতাম, আমার জ্বালায় পাড়ার লোক অস্থির হইয়া উঠিত।"

পাঠশালার বিদ্যা পরিসমাপ্ত হইলে গুরুমহাশয় একদিন ঠাকুরদাসকে বলেন যে, তাঁহার যাহা বিদ্যা ছিল ঈশ্বরচন্দ্র তাহা আয়ত্ত করিয়াছেন। এখন কলিকাতায় লইয়া গিয়া পাঠের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। সেই সময় ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ মহাশয় পরলোকযাত্রা করেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে ১২৩৬ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগে

ঈশ্বরচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরদাস ও গুরু কালীকান্ত কলিকাতা যাত্রা করেন। তখন ঈশ্বরচন্দ্র অষ্টমবর্ষীয় বালক মাত্র।

তখন বীরসিংহ হইতে কলিকাতায় গমনাগমনের বিশেষ সুবন্দোবস্ত ছিল না। পদব্রজেই তাঁহাদিগকে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র উত্তরকালে যে প্রতিভার বিকাশ দেখাইয়া গিয়াছেন, বাল্যকালেও তাহার স্ফুরণ দেখা গিয়াছিল। পথিমধ্যে আসিতে আসিতে মাইলষ্টোন অথবা পথের দূরত্বজ্ঞাপক শিলাখণ্ড দর্শনে বালক বিদ্যাসাগর চমৎকৃত হন। পিতার নিকট হইতে উহার পরিচয় অবগত হইয়া তিনি এক হইতে দশ পর্য্যন্ত ইংরাজী সংখ্যা গণনার অক্ষরগুলি আয়ত্ত করেন।

পুত্র সহ ঠাকুরদাস কলিকাতায় আসিয়া জগদ্দুর্ল্লভ সিংহের বাড়ী আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা পূর্ব্বে ঠাকুরদাসকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এজন্য এই পরিবারের সহিত ঠাকুরদাসের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল। কলিকাতায় আসিবার পরদিবস ঠাকুরদাস জগদ্দুর্লভ বাবুর কয়েকখানি ইংরাজী অক্ষরে লিখিত বিলের অঙ্ক ঠিক দিতেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তাহা দেখিয়া স্বয়ং ঐ কার্য্য করিতে চাহেন। প্রকৃতই তিনি নির্ভুল ভাবে বিলের অঙ্কগুলি যোগ দিয়াছিলেন। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া জগদ্দুর্ল্লভ বাবু ও উপস্থিত সকলেই অষ্টমবর্ষীয় বালকের প্রতিভা দর্শনে চমৎকৃত হন। এক দিনে মাইল-ষ্টোন দেখিয়া ইংরাজী অক্ষর শিখিয়া নির্ভুল ভাবে যোগের কার্য্য সম্পাদন করা অষ্টমবর্ষীয় বালকের পক্ষে প্রতিভার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

বালক ঈশ্বরচন্দ্রের বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া সকলেই তাঁহাকে কোনও উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য মতপ্রকাশ করিলেন। পুত্রকে হিন্দুস্কুলে প্রবেশিত করাই ঠাকুরদাসের সঙ্কল্প। কিন্তু তাঁহার

বেতন মাত্র দশমুদ্রা। হিন্দুস্কুলে পুত্রকে পড়াইতে গেলে তথায় মাসিক পাঁচ টাকা শুধু বিদ্যালয়ের বেতন দিতেই হইবে; সুতরাং ইচ্ছাসত্ত্বেও ঠাকুরদাস তখন ঈশ্বরচন্দ্রকে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া দিতে সমর্থ হন নাই। বাসার সন্নিহিত একটি পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্র পাঠাভ্যাস করিতে যাইতেন।

ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতা জগদ্দুর্ল্লভ বাবু পিতাপুত্র উভয়কেই ভালবাসিতেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার পরিবারস্থ অন্যান্য সকলেও ঈশ্বরচন্দ্রকে যথেষ্ট স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। পিতা ও পুত্র সকলেরই নিকট হইতে পর্য্যাপ্ত আদর-যত্ন পাইতেন। জগদ্দুর্ল্লভ বাবুর কনিষ্ঠা সহোদরা রাইমণি ঈশ্বরচন্দ্রকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। উত্তরকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই রমণীর সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিতেন যে, এরূপ উন্নতহৃদয়া স্নেহশালিনী রমণী তিনি আর কোথাও দেখেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে মাতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইত।

রাইমণির স্নেহ-যত্নে ঈশ্বরচন্দ্র স্নেহময়ী মাতা ও পিতামহীর অভাব অনেক পরিমাণে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। রাইমণি নানাপ্রকার মিষ্টবাক্যে, আহার্য্যদানে ও ক্রীড়নক দেখাইয়া বালক ঈশ্বরচন্দ্রের মন ভুলাইয়া রাখিতেন।

কলিকাতায় আসিবার কিয়ৎকাল পরে ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভেই ঈশ্বরচন্দ্র জ্বরাতিসাররোগে আক্রান্ত হন। রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে শুনিয়া তাঁহার পিতামহী কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে দেশে লইয়া যান। সেখানে গিয়া সেবাশুশ্রূষার গুণে ঈশ্বরচন্দ্র আরোগ্য লাভ করেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমভাগে ঠাকুরদাস পুত্রকে পুনরায় কলিকাতায় লইয়া আসেন।

অতঃপর পুত্রকে সংস্কৃত শিখাইবার বাসনা ঠাকুরদাসের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। ১২৩৬ সালে ২০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে শুভক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। সে সময়ে সংস্কৃত কলেজে কেবল সংস্কৃত শিক্ষাদানেরই ব্যবস্থা ছিল; ইংরাজী শিক্ষা অতি সামান্যভাবেই হইত। তদানীন্তন ছাত্রগণ ইংরাজী পড়িতে বাধ্য ছিলেন না। যাঁহার ইচ্ছা হইত, তিনি ইংরাজী শিক্ষা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র যে সময়ে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশলাভ করেন, সেই সময় হিন্দু কলেজের অধিকাংশ ছাত্র পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে বিজাতীয় ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে হিন্দুস্কুলে না দিয়া সংস্কৃত কলেজেই ভর্ত্তি করিয়া দেন। সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণ বিভাগে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

ঠাকুরদাস প্রত্যহ নবম ঘটিকার সময় ঈশ্বরচন্দ্রকে কলেজে লইয়া যাইতেন; আবার অপরাহ্ণ চারিটার সময় তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এইরূপে ছয় মাস অতীত হইলে ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং কলেজে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ষাণ্মাসিক পরীক্ষার পর ঈশ্বরচন্দ্র পাঁচ টাকা বৃত্তিলাভ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত খর্ব্বকায় ছিলেন। তাঁহাকে এজন্য সহপাঠীদিগের মধ্যে অনেকে "বাঁটুল," "যশুরে কৈ" প্রভৃতি বলিয়া উপহাস করিত। দেহের অনুপাতে মস্তকটি অধিকতর বড় ছিল বলিয়াই সহপাঠীরা "যশুরে কৈ" বলিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র বড় বিরক্ত হইতেন। তিনি বাল্যে একটু তোতলাও ছিলেন; সুতরাং ক্রোধ হইলে তাড়াতাড়ি কথা বাহির হইত না। ইহাতে সহপাঠী ও

সমবয়স্ক ক্রীড়াসঙ্গীরা উচ্চহাস্যে গগনতল বিদীর্ণ করিয়া উপহাসের মাত্রা বাড়াইয়া দিত।

বিদ্যার্জ্জনের দিকে বাল্যবধি ঈশ্বরচন্দ্রের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি বিদ্যালয়ে প্রত্যহ যাহা শিখিয়া আসিতেন, রাত্রিকালে পিতার নিকট তাহার পরীক্ষা দিতেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রে ঠাকুরদাস, একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। বিশেষতঃ প্রত্যহ পুত্রের সহিত পাঠ আলোচনায় তাঁহার নিজেরও ব্যাকরণশাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঠাকুরদাস পুত্রের পাঠাভ্যাস-বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন। পরের চাকরী করা সত্ত্বেও তিনি প্রত্যহ স্বয়ং রন্ধনাদি করিয়া পুত্রকে আহার করাইতেন; রাত্রি-শেষে পুত্রের পাঠ কিরূপ হইয়াছে, তাহার পরিচয় গ্রহণ করিতেন। নিজে তিনি অনেক উদ্ভট শ্লোক জানিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে মুখে মুখে সেইগুলি শিখাইয়া দিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা কোপন স্বভাব; সুতরাং কঠোর শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। কোনও দিন বালক ঈশ্বরচন্দ্র নিয়মিতকাল পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস না করিয়া যদি ঘুমাইয়া পড়িতেন, তবে আর তাঁহার নিস্তার থাকিত না। নিষ্ঠুরের ন্যায়ই পুত্রের অঙ্গে প্রহার করিতেন। এক এক দিন প্রহারের মাত্রা এতই বর্দ্ধিত হইত যে, সিংহ-পরিবারের সকলেই বিরক্ত হইয়া ঠাকুরদাসকে তিরস্কার করিতেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রও সতর্ক হইয়া চলিতেন, পাঠাভ্যাসের সময় আর ঘুমাইয়া পড়িতেন না। কঠোরতম শাসনের পরিণাম প্রায়ই বিষময় ফল প্রসব করিয়া থাকে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে তাহা ঘটে নাই।

ঈশ্বচন্দ্রের অধ্যয়নস্পৃহা দেখিয়া কলেজের অধ্যাপক, অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বালককে তিনি স্নেহের চক্ষেই দেখিতে আরম্ভ

করেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রে অন্যান্য ছাত্র অপেক্ষা ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার সম্যক্ স্ফুরণ হইয়াছিল। অধ্যাপকের নিকটও ঈশ্বরচন্দ্র বহু উদ্ভট শ্লোক শিখিয়াছিলেন।

ব্যাকরণ-শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিন বৎসরের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র দুই বৎসর বহু পারিতোষিক পাইয়াছিলেন; কেবল এক বৎসর তিনি পান নাই। এজন্য অভিমানে তিনি কলেজ ছাড়িয়া দিতে সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতার ও ব্যাকরণ-অধ্যাপকের অননুমোদনে তিনি আপনার 'সংকল্পকে' কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের 'একগুঁয়েমী' বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি যে বিষয়ে যখন যাহা সংকল্প করিতেন, তাহা হইতে তাঁহাকে বিরত করা অত্যন্ত কঠিন হইত। তবে মুখে তিনি কাহারও কথার প্রতিবাদ করিতেন না; কেবল ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে ঈশ্বরচন্দ্র ১২৩৭ সালে কলেজের ইংরাজী শ্রেণীতে ছয়মাস মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী শ্রেণী খোলা হয়। দীর্ঘকাল ইংরাজী অধ্যয়নের অভাবে ফলে ঈশ্বরচন্দ্র ইংরাজী ভাষায় তাদৃশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। উত্তরকালে বহু আয়াস-স্বীকার করিয়া তাঁহাকে ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণ-শ্রেণীতে তিন বৎসর অধ্যয়ন পূর্ব্বক উহা আয়ত্ত করেন। তার পর ছয়মাসকাল অমর কোষ ও ভট্টিকাব্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পাঠ্যাবস্থা হইতেই রাত্রিজাগরণ করিয়া তাঁহাকে পাঠাভ্যাস করিতে হইত। পাঠ সমাপ্তির পর আহার করিয়া তিনি নিদ্রা যাইতেন। তাঁহার পিতা রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতেন। তার পর ঈশ্বরচন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে পড়িতে

আদেশ করিতেন। সারারাত্রি জাগিয়া বালক ঈশ্বরচন্দ্র পাঠাভ্যাস করিতেন। এইরূপ রাত্রিজাগরণ ও গুরুতর পরিশ্রমে বালকের সময় সময় স্বাস্থ্যভঙ্গ হইত; তথাপি পাঠাভ্যাসে তাঁহার বিরতি ছিল না। বাল্যকালের এই অভ্যাস ঈশ্বরচন্দ্রের ভবিষ্যৎজীবনে সম্পূর্ণ বিদ্যমান ছিল। এইরূপ গুরুতর শ্রম করিয়া সারাজীবনই তিনি কাটাইয়া দিয়াছিলেন।

নবম বৎসর সময় বালক ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে প্রবিষ্ট হন। ইহার দুই বৎসর পরে একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন হয়। অনভ্যাসের ফলে কিছুদিন পরে ঈশ্বরচন্দ্র সন্ধ্যা-আহ্নিক বিস্মৃত হন; কিন্তু পাছে পিতা জানিতে পারেন, এই আশঙ্কায় তিনি সন্ধ্যাবন্দনাদির অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদন করিতেন। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে তিনি কলেজের কাব্যশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার সতীর্থগণের সকলেই উত্তরকালে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর-চন্দ্রের প্রতিভা সকলকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। অধ্যাপকগণ প্রতিপদে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইতেন। প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই বৎসরে তাঁহাদের পাঠ্য ছিল,—রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, রাঘবপাণ্ডবীয় প্রভৃতি গ্রন্থ। দ্বিতীয় বর্ষে শকুন্তলা, মেঘদূত, উত্তরচরিত, মুদ্রারাক্ষস, কাদম্বরী, বিক্রমোর্ব্বশী, দশকুমার-চরিত প্রভৃতি কাব্য-নাটক ঈশ্বরচন্দ্রের কণ্ঠাগ্রে ছিল। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে কোনও কাব্য বা নাটক পুস্তক না দেখিয়া তিনি আবৃত্তি করিয়া যাইতে পারিতেন। এই সময়ে তাঁহার অনুবাদের শক্তি স্ফুরিত হয়। সংস্কৃত ও প্রাকৃতে তিনি আলাপ করিতে পারিতেন; একটুও বাধিত না, অনর্গল বলিয়া যাইতে পারিতেন। দ্বিতীয়বর্ষের পরীক্ষায়ও ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেন। তাঁহার

প্রতিভার ক্রমবিকাশ দেখিয়া অধ্যাপকবৃন্দের বিস্ময়ও ক্রমে বাড়িতে লাগিল। ঈশ্বরচন্দ্রের হস্তলিপি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। তিনি স্বহস্তে অনেক সংস্কৃত পুঁথি লিখিয়া লইয়াছিলেন। সে লেখা দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে সকলেই তাঁহার হস্তাক্ষরের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র যেরূপ কঠোর দারিদ্রের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই আদর্শ-স্বরূপ। এই সময় তদীয় মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু বিদ্যার্জ্জনের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আগমন করেন। এই সময় রন্ধনাদির কার্য্য ঈশ্বরচন্দ্রকেই করিতে হইত। প্রাতঃস্নান শেষে তিনি বাজারে গিয়া দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিতেন। বাটনা নিজেকেই বাঁটিয়া লইতে হইত। স্বহস্তে চারিজনের মত দ্রব্যাদি রন্ধন করিয়া সকলকে খাওয়াইতেন, উচ্ছিষ্ট মুক্ত করিতেন। বাসনমাজা, কাঠ চেলা-করা প্রভৃতি কার্য্যও তাঁহাকে করিতে হইত। প্রসন্নমুখে প্রফুল্ল অন্তরে ঈশ্বরচন্দ্র এ সকল কার্য্য করিতেন। দারিদ্র্য মানুষকে গড়িয়া তুলে, ঈশ্বরচন্দ্রও তাহার প্রভাবে উত্তরকালে কত মহৎ, কত বড় লোক হইয়াছিলেন, তাহা এখন কোন্ বাঙ্গালী না জানে?

যে ঘরে রন্ধন করিতে হইত, তাহার অবস্থা অতিশয় জঘন্য ছিল। সেকালের কলিকাতা সহরের এক্তল কক্ষ মনুষ্যের ব্যবহারের অযোগ্য। আলোক ও বাতাস সে কক্ষে প্রবেশ করিতে পাইত না। আবার উহার সন্নিকটে দুইটি দুর্গন্ধময় পায়খানা অবস্থিত ছিল। বর্ষাকালে এই ঘরের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। চর্ম্ম-চটিকা ও তৈলপায়িকার দৌরাত্ম্য কম ছিল না। একবার ঈশ্বরচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে ব্যঞ্জনে একটি তৈলপায়িকা পড়িয়াছিল। আহারের সময় স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্রের অংশে উহা আসিয়াছিল। মৎস্য ভাবিয়া মুখে দিয়া

ঈশ্বরচন্দ্র নিজের ভ্রম বুঝিতে পারেন। কিন্তু তখন, প্রকাশ করিলে পাছে ভ্রাতা ও পিতার আহারের ঘৃণা জন্মে, এজন্য তিনি উহা মুখে করিয়াই রাখিয়াছিলেন। সকলের আহার শেষ হইলে তিনি বাহিরে গিয়া বমন করিয়া ফেলেন, কিন্তু পিতা বা ভ্রাতাকে সে কথা তখন প্রকাশ করেন নাই।

দরিদ্রের সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র শয়ন সম্বন্ধেও বাল্যকালে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন। দৈর্ঘ্যে দুইহস্ত ও প্রস্থে দেড়হস্ত পরিমিত বারাণ্ডার উপর কখনও মাদুর বিছাইয়া, কখনও বা অমনই শয়ন করিতেন। বারাণ্ডার আলিসা তাঁহার মস্তকে উপাধানের কার্য্য করিত।

বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন। দরিদ্রের সন্তান পরিণামে পর্য্যাপ্ত অর্থোপার্জ্জন করিয়া বিলাসী হইয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র কায়মনোবাক্যে বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন। বাল্যে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" পরিতে আরম্ভ করিয়া বার্দ্ধক্যেও তাঁহার চাল বিগড়াইয়া যায় নাই। প্রকৃতই তাঁহার জননী স্বহস্তে চরকায় সূতা কাটিয়া, বস্ত্র বয়ন করিয়া, পুত্রের ব্যবহারের জন্য পাঠাইতেন। সেই মোটা সূতার কাপড় পরিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে ঈশ্বর-চন্দ্র কলেজে যাইতেন।

পাঠে ঈশ্বরচন্দ্র কখনও অবহেলা করেন নাই। অখণ্ডমনোযোগের সহিত তিনি পাঠাভ্যাস করিতেন। ঠাকুরদাস কোন বিষয়ে পুত্রের সামান্য ত্রুটি দেখিলে কঠোর শাসন করিতেন, এজন্য পুত্রও বিশেষ সতর্কভাবে থাকিতেন। তথাপি মধ্যে মধ্যে তিনি পিতার নিকট হইতে শাসনবাক্য শুনিতেন। পিতার শাসনভয়ে তিনি পরিশেষে পুঁথির সাহায্যে বিস্মৃত-প্রায় সন্ধ্যার মন্ত্র আয়ত্ত করেন।

কলেজে পাঠকালে ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যরচনার দিকেও চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল কাব্য ও ব্যাকরণ উভয় বিষয়েই তাঁহার অনন্যসাধারণ অধিকার ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই বালক ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত ভাষায় অতি উপাদেয় কবিতা রচনা করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিতারচনার শক্তি দেখিয়া পণ্ডিতগণও তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ক্রমে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। অনেকে এইরূপ সুপাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াও উঠিলেন। অতঃপর ক্ষীরপাই গ্রামনিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা দীনময়ীর সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের পরিণয় ক্রিয়া সংসাধিত হয়। তখন দীনময়ীর বয়ঃক্রম সাত বৎসর মাত্র। ঈশ্বরচন্দ্র অল্পবয়সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে প্রথমতঃ সম্মত হন নাই, কিন্তু পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। কাজেই বাধ্য হইয়া পরিশেষে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইয়াছিল।

১২৪২ সালে ঈশ্বরচন্দ্র অলঙ্কার শাস্ত্র শিখিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। এক বৎসরের মধ্যে তিনি অনেকগুলি অলঙ্কার গ্রন্থ আয়ত্ত করেন। বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার লাভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক ৮৲ টাকা হারে বৃত্তি পাইতে-ছিলেন। তখন উহাই প্রধান বৃত্তি ছিল। বৃত্তির টাকা তিনি পিতার হস্তে প্রদান করিতেন। পিতা কিছুকাল বৃত্তির সমুদয় টাকাই লইতেন, পরে সম্পূর্ণ লইতেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বৃত্তির টাকার সাহায্যে হস্তলিখিত পুঁথি ক্রয় করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিখ্যাত পুস্তকা-গারে এই সকল হস্তলিখিত পুঁথি সযত্নে সংরক্ষিত ছিল।

বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ে পরোপকার প্রবৃত্তি ও দয়ার বিকাশ জন্মিয়াছিল। উত্তরকালে "দয়ারসাগর" বলিলে শুধু বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই উহা বিশেষণ বলিয়া লোকে বুঝিত। সেই দয়া বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ে সমস্ত স্থলটাই জুড়িয়াছিল। বৃত্তির টাকা হইতে প্রত্যহ জলযোগের মত কিছু অর্থ থাকিত। জলযোগকালে যাহারা তাঁহার কাছে থাকিত, তাহাদিগকে অংশ না দিয়া তিনি কিছুই আহার করিতেন না। কাহারও কোনও বিষয়ে অভাব দেখিলে নিজের কাছে অর্থ থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার দ্বারা তাহার সেই অভাব পূর্ণ করিতেন। নহিলে অপরের নিকট হইতে অর্থ ঋণ করিয়া তাহার সেই অভাব মোচন করিতেন। কাহারও দুঃখ বা কষ্ট তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সতীর্থ বা সমবয়স্ক কোনও বালকের পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহার রোগশয্যার পার্শ্বে আসন গ্রহণ :করিতেন। সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া কোনও সঙ্কোচ অথবা আশঙ্কা ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ে বিভীষিকার সঞ্চার করিতে পারিত না। অকুণ্ঠিতচিত্তে তিনি পীড়িতের মলমূত্র পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিতেন।

স্বগ্রামের উপর ঈশ্বরচন্দ্রের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। মধ্যে মধ্যে তিনি গ্রামে গিয়া সর্ব্বাগ্রে প্রথম শিক্ষাগুরু কালীকান্তের চরণ বন্দনা করিতেন। পাণ্ডিত্য তাঁহাকে উদ্ধত করিয়া তুলে নাই। যাঁহারা প্রণম্য, তাঁহাদিগের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে কোনও দিন তিনি বিস্মৃত হইতেন না। পল্লীর কাহারও পীড়া হইলে ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে তাহার শুশ্রূষায় রত হইতেন। তাঁহার করুণা গ্রামের কুকুর বিড়ালটির প্রতি সমভাবে বিদ্যমান ছিল।

ভোগ-বিলাসে-বিগত-স্পৃহ ঈশ্বরচন্দ্রের একটি সখ ছিল "কবির গান"। কোথাও কবির গান হইতেছে শুনিলে তিনি সেইখানে উপস্থিত হইতেন এবং সাগ্রহে শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়া উঠিতেন না। "কবির গান" তিনি সংগ্রহও করিতেন। সংগৃহীত গানগুলি তিনি খাতায় লিখিয়া রাখিতেন।

সেকালে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলার প্রচলন হয় নাই। ঈশ্বরচন্দ্র কপাটি খেলিতেন। লাঠিখেলাতেও তাঁহার অনুরাগ ছিল।

অলঙ্কার শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া ১২৪৪ সালে ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এ সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তদশবৎসর। এই অল্পবয়সে মাত্র ছয়মাস অধ্যয়নের পর তিনি স্মৃতির পরীক্ষা প্রদান করেন। তৎপরে ল-কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উভয় পরীক্ষাতেই তিনি প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন। সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র ঈশ্বরচন্দ্রের নখদর্পণে ছিল।

ল-কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ত্রিপুরা জেলার জজপণ্ডিতের শূন্যপদে নিযুক্ত হইবার জন্য তিনি আবেদন করেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সেই পদে নিযুক্ত করেন; কিন্তু পিতা পুত্রকে সুদূর ত্রিপুরাজেলায় পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। পিতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্র অগত্যা সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। তারপর বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার বাসনা হৃদয়ে জাগ্রত হইল। মনোযোগ সহকারে ঈশ্বরচন্দ্র বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এই সময় প্রতিযোগী পরীক্ষায় গদ্য রচনা করিয়া তিনি একশত মুদ্রা পারিতোষিক লাভ করেন।

এই সময়ে ঠাকুরদাস ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধুর বিবাহে বিশেষ ঋণ হইয়াছিল। তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রও অধ্যয়নার্থ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ঠাকুরদাস ঋণমুক্ত

হইবার বাসনায় কলিকাতার বাসার ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়াছিলেন। জলযোগ ভিজা ছোলা ও বাতাসার সাহায্যে সম্পন্ন করিতে হইত। এ সময় ঈশ্বরচন্দ্রের পরিশ্রমও সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। দুই বেলাই তাঁহাকে রন্ধন করিতে হইত। এই অবস্থায় বেদান্ত শাস্ত্রের পর তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ন্যায়ের পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র প্রথমস্থান অধিকার পূর্ব্বক একশত টাকা পুরস্কার লাভ করেন। কবিতা রচনায়ও একশত টাকা পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। সমগ্র দর্শনশাস্ত্র পাঁচ বৎসরে সমাপ্ত করিয়া, কলেজ হইতে ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। এই সময় তাঁহার বয়ক্রম মাত্র বিংশতি বৎসর।

১২৪৮ সালে (ইংরাজী ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এই পদের বেতন ৫০্ টাকা ছিল। এই কলেজে অধ্যয়ন করিয়া সিবিলিয়ানদিগকে মাসে মাসে পরীক্ষা দিতে হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কার্য্য গ্রহণের পর ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করিলেন। সিবিলিয়ানদিগের প্রশ্নোত্তর কাগজ পরীক্ষার সময় হিন্দী শিক্ষারও আবশ্যকতা অনুভূত হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় জনৈক হিন্দীভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট হইতে উক্ত ভাষা শিখিয়া লইলেন। তারপর ডাক্তার নীলমাধববাবুর নিকট প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ইংরাজী শিখিবার জন্য যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এখানে কিছুদিন ইংরাজী শিক্ষার পর, হিন্দুকলেজের জনৈক ছাত্র রাজনারায়ণ গুপ্তের নিকট রীতিমত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। শোভাবাজার রাজবাটিতে গিয়া পরিশেষে তিনি আনন্দকৃষ্ণ বসুর নিকট শেক্ষপীয়রের নাটকাবলী অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এইখানে অক্ষয়কুমার দত্তের

সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। অক্ষয়বাবু সে সময় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষয়বাবুর অনূদিত প্রবন্ধগুলিকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালার ছাঁচে ঢালিয়া সংশোধন করিয়া দিতেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে যে সমিতি ছিল, অক্ষয় বাবুর প্রস্তাবে এবং অন্যান্য সভ্যের সমর্থনে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই সমিতির একজন সদস্য পদে নিযুক্ত হন। এই সূত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেও ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোনই সংস্রব ছিল না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় সংস্কৃত মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে থাকেন; কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছেন শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাভারত অনুবাদে ক্ষান্ত হন এবং সিংহ মহাশয়কে মহাভারত অনুবাদে উৎসাহিত করেন।

অসামান্য প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁহার অধ্যাপনা প্রণালী দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষের শ্রদ্ধা তাঁহার উপর সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মার্শেল সাহেব তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিখিতেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সর্ব্বান্তকরণে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকুরী গ্রহণের পর বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় পিতৃদেবকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ দেন। উপযুক্ত পুত্রের অনুরোধে ঠাকুরদাস কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বগ্রামে ফিরিয়া যান। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতার বাসার খরচের জন্য ত্রিশ টাকা রাখিয়া বাকি ২০৲ টাকা পিতার নিকট পাঠাইতেন। কলিকাতার বাসায় ৭।৮ জন

ব্যক্তি দুইবেলা আহার করিতেন। এ সময়েও পর্য্যায়ক্রমে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও রন্ধন করিতে হইত। ত্রিশ টাকায় কলিকাতার ব্যয়ভার বহন করিয়াও সাধ্যানুসারে আর্ত্ত ও পীড়িতের সাহায্য করিতেন। করুণাময় বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি এদিকে চিরদিনই সমভাবে বিদ্যমান ছিল।

পীড়িতের সেবাশুশ্রূষায় বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল; কালে উহা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। একবার নারিকেলডাঙ্গায় ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বিসূচিকা পীড়া হইয়াছে শুনিবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইয়া নিজের ব্যয়ে তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। রোগীর মলমূত্র পরিষ্কারেও তাঁহার বিন্দুমাত্র ঘৃণা জন্মে নাই।

পীড়িতের সেবা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে অনেক ঘটনা শুনা যায়। একবার তাঁহার বাসার সন্নিকটস্থ কোনও ভদ্রলোকের ভৃত্যের কলেরা হয়। উক্ত ভদ্র মহোদয় রোগাক্রান্ত ভৃত্যকে বাটী হইতে বাহিরে, পথে রাখিয়া আসেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র করুণার অবতার বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই পীড়িত ভৃত্যটিকে নিজের বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা উত্তোলন করিয়া বাসায় উপস্থিত হন এবং নিজের শয্যায় তাহাকে শায়িত করিয়া তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন। অল্পদিনেই লোকটি রোগ মুক্ত হয়। এরূপ ঘটনা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিতকালে বহুবার ঘটিয়াছিল।

আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেরই উপকারের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বদা সমুৎসুক থাকিতেন। সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই তিনি বেকার আত্মীয় বন্ধুর চাকরী করিয়া দিতেন। একবার সংস্কৃত কলেজে ৮০৲ বেতনের এক অধ্যাপকের পদ খালি হয়। মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উক্ত পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়

তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে চাকরী করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। আত্মসুখপরায়ণ হইলে ঈশ্বরচন্দ্র অধিক বেতনের এই পদটির মায়া কখনই ত্যাগ করিতে পারিতেন না ; কিন্তু সত্যবাদী ব্রাহ্মণ নিজের দিকে চাহিলেন না। মার্শেল সাহেবকে বলিয়া কহিয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয়কেই ঐ পদে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন। শুধু তাহাই নহে, বাচস্পতি মহাশয় কলিকাতা হইতে দূরবর্ত্তী কাল্না গ্রামে অবস্থান করিতেন। পদব্রজে তিনি পঁচিশক্রোশ অতিক্রমপূর্ব্বক বাচস্পতি মহাশয়কে চাকরীর সংবাদ দিতে গিয়াছিলেন। প্রতিশ্রুতিরক্ষার এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে আদর্শ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইবার যোগ্য।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরী করিবার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় পদব্রজেই বাড়ী যাইতেন। পথ চলায় তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। তিনি এত দ্রুত চলিতে পারিতেন যে, কেহ তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতায় সমকক্ষ ছিল না। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যেরূপ দ্রুত চলিতে পারিতেন, অনেক যুবাও তাহা পারিত না। পদব্রজে পথ চলিবার সময় পথে নানাপ্রকার ঘটনা সংঘটিত হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সকল ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থাকিতেন। একবার পদব্রজে তিনি কলিকাতায় ফিরিতে ছিলেন, সেই সময় তিনি দেখিলেন যে, একটি মাঠের মাঝে একটি বৃদ্ধ মাথায় মোটসহ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় জানিতে পারিলেন যে, লোকটির বাড়ী সেইস্থান হইতে প্রায় তিনক্রোশ দূরে অবস্থিত। বৃদ্ধের যুবা পুত্রটি পিতার মাথায় মোট চাপাইয়া দিয়া তাহাকে গৃহে প্রেরণ করিয়াছে। এতবড় বোঝা মাথায় করিয়া বেচারা আর হাঁটিতে পারিতেছে না। তাহার দুর্দ্দশা শ্রবণে দয়ার-সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। বিনা বাক্যব্যয়ে দীন দুঃখী আর্ত্ত

পীড়িতের বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বৃদ্ধের মস্তক হইতে বোঝা নিজের মস্তকে তুলিয়া লইয়া বৃদ্ধকে পথ দেখাইয়া চলিতে বলিলেন। তার পর বৃদ্ধের বাটীতে সেই বোঝা নামাইয়া দিয়া পুনরায় পদব্রজে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরের মোট বহিয়া লইয়া যাওয়া সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে অনেক প্রকার ঘটনার কথা শুনা যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতৃমাতৃভক্তি অতুলনীয় ছিল। মাতার একটি মাত্র কথায় তিনি প্রসন্নচিত্তে অসাধ্য সাধন করিতে পারিতেন। তাঁহার তৃতীয় সহোদরের বিবাহ উপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী পত্রযোগে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান যে, উক্ত বিবাহে তাঁহাকে আসিতে হইবে। তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয় চাকরী করিতেছিলেন। মাতার আদেশ অলঙ্ঘনীয়, তিনি মার্শেল সাহেবের নিকট ছুটীর দরখাস্ত করিলেন; কিন্তু সাহেব তাঁহার ছুটী মঞ্জুর করিতে পারিলেন না। মাতৃভক্ত তেজস্বী বিদ্যাসাগর সংকল্প করিলেন, ছুটী না পাইলে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাড়ী যাইবেন। মাতার আদেশ পালন করিতেই হইবে। পরদিবস সাহেবকে তিনি জানাইলেন যে, সাহেব তাঁহার ছুটী যদি মঞ্জুর না করেন, তবে তাঁহার কর্ম্মত্যাগ পত্র ত মঞ্জুর করিবেন! সাহেব তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "সাহেব, তোমার কাজ বড় না আমার মার আদেশ বড়?" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অচলা মাতৃভক্তি দর্শনে বিস্ময়-বিমুগ্ধ মার্শেল সাহেব অবশেষে তাঁহার ছুটি মঞ্জুর করেন। ছুটী পাইয়াই ঈশ্বরচন্দ্র বাসায় ফিরিলেন এবং অবিলম্বে শ্রীরাম নামক-ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। তখন আষাঢ় মাস; বিদ্যাসাগর মহাশয় জল ঝড় বজ্রপাত কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া—দ্রুত চলিতে লাগিলেন। মাতার আহ্বানবাণী ব্যতীত তখন তাঁহার মনে আর কোনও

বিষয়ের স্থান নাই। ক্রমে তিনি দামোদরের তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। বর্ষার স্রোতোধারায় স্ফীত দামোদর তখন প্রলয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তীরে আসিয়া দেখিলেন, খেয়ার নৌকা অপর পারে। উহা এপারে আসিবার সম্ভাবনা তখন নাই। বিদ্যাসাগর উপায়ান্তর না দেখিয়া সাঁতার দিয়া নদীপার হইবার উপক্রম করিলেন। ভৃত্য শ্রীরাম ও আরও কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে এইরূপ অসমসাহসিক কার্য্যে বাধা দিতে গেলে। মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না, মাতার আদেশ ছাড়া তখন তাঁহার হৃদয়ে অন্য কোনও চিন্তা নাই। দুরন্ত দামোদরের জলরাশি সাঁতার দিয়া পার হইয়া মাতৃভক্ত বীর দ্রুতপদে চলিলেন। পথিমধ্যে দ্বারকেশ্বর নদও তিনি সন্তরণে উত্তীর্ণ হন। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনাইয়া আসিল, সেই সময় তিনি প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী "কুড়ান" খালের নিকট পঁহুছিলেন। সেখানে সে সময় ভীষণ দস্যুর ভয় ছিল; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র মাতৃপদ স্মরণপূর্ব্বক বিপদসঙ্কুল প্রান্তর উত্তীর্ণ হইলেন। রাত্রি নয় ঘটিকার সময় বাড়ী পঁহুছিয়া দেখিলেন, বর ও বরযাত্রী সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উচ্চৈস্বরে ডাকিলেন, "মা, মা, আমি এসেছি।" মাতা দ্বার মুক্ত করিয়া বলিলেন, "কে ঈশ্বর?" "হাঁ" বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় মাতৃচরণ বন্দনা করেন।

মাতার হৃদয়ে যে বেদনা ছিল, মাতৃভক্ত পুত্রের আগমনে তাহা দূরীভূত হইল। তখন অভুক্ত পুত্রকে মাতা সযত্নে ঘরের যাহা কিছু ছিল, তাহাই আহার করিতে দিলেন। এরূপ মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের মৃত্যু হওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উক্তপদে নিযুক্ত করিবার জন্য সংস্কৃত কলেজের

সম্পাদক রসময় দত্ত মহাশয় কর্ত্তপক্ষের নিকট মন্তব্য প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় রসময় বাবুর অনুরোধে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য্যভার পরিত্যাগপূর্ব্বক সংস্কৃত কলেজের চাকরী গ্রহণ করেন।

তেজস্বী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সহিত মনোবাদ ঘটে। কোনও কার্য্যোপলক্ষে একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় কার্ সাহেবের সহিত দেখা করিতে যান। সাহেব সে সময়ে টেবিলের উপর পা তুলিয়া বসিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ ব্যাপারে নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া ফিরিয়া আসেন। কয়েকদিন পরে কার্ সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার ইতিহাস প্রসিদ্ধ চটি জুতাসমেত চরণ দুইখানি টেবিলের উপর রক্ষা করিয়া সাহেবের সম্বর্দ্ধনা করেন। সাহেব ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শিক্ষা-বিভাগের তদানীন্তন সেক্রেটারী মৌয়েট সাহেবের নিকট কার্ সাহেব এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া পত্র-ব্যবহার করেন। সেক্রেটারী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কৈফিয়ৎ চাহেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমুদয় বৃত্তান্তটি তাঁহার গোচর করেন। মৌয়েট্ সাহেব তেজস্বী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নির্ভীকতায় অসন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চতুর্থ সহোদর হরচন্দ্র বিসূচিকা রোগে অকালে পরলোক গমন করায় তিনি অত্যন্ত শোকবিমূঢ় হন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রসময় বাবুর সহিত শিক্ষাপ্রণালী-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতান্তর ঘটে। মতান্তর ক্রমে মনান্তরে পরিণত হয়। তেজস্বী বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার এরূপ অবিমৃষ্যকারিতা দর্শনে তখন তাঁহার আত্মীয়স্বজন অত্যন্ত বিস্মিত

হইয়াছিলেন। বৃহৎ সংসারের সমুদয় খরচ চালাইতে হইবে, এরূপ অবস্থায় কর্ম্মত্যাগ করিতে দেখিয়া আত্মীয় বন্ধু তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, "মুদীর দোকান করিয়া সংসার চালাইব, সেও ভাল, কিন্তু যে পদে সম্মান নাই, সে কাজ করিব না।"

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোষাধ্যক্ষের পদ খালি হয়, মার্শেল সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত পদে ৮০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। এই বৎসরের ১৪ই নবেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র নারায়ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি উক্ত কলেজের "প্রিন্সিপাল" বা অধ্যক্ষ মনোনীত হন। তখন উক্ত পদের বেতন মাসিক ১৫০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাত্রগণকে বন্ধুর মত সম্ভাষণ করিতেন। তাঁহার মুখে "তুই" ছাড়া "তুমি" শব্দ শুনিবার জন্য কোনও ছাত্রের আগ্রহ ছিল না। কোনও অধ্যাপক ছাত্রদিগকে দণ্ডদান করিলে তিনি ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইতেন। অনেক সময় অধ্যাপকদিগকে গোপনে ডাকাইয়া বালকদিগকে শাস্তিপ্রদানের জন্য তিরস্কার করিতেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে শূদ্রজাতির প্রবেশাধিকার দিবার জন্য উদ্যোগী হন। তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈদ্যজাতি ব্যতীত অন্য শ্রেণীর ছাত্র সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা-লাভের অধিকারী ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজ হইতে এই প্রথা তিরোহিত হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বগ্রাম বীরসিংহে ১২৬০ সালে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। কৃষক পুত্রগণ রাত্রিকালে এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। এই বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং বহন করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত ঘটনার দুই বৎসর পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় সহকারী স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের পদে নিযুক্ত হইলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে তিনশত এবং সহকারী স্কুল ইন্‌স্পেক্টার হিসাবে দুইশত—মোট বেতন পাঁচ শত টাকা হইল। ইন্‌স্পেক্টার হইয়া তিনি বাঙ্গালা দেশের যে অঞ্চলে পরিদর্শন করিতে যাইতেন, সেইখানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে উৎসাহিত করিতেন। পাল্কিতে আরোহণ করিয়াই তাঁহাকে পরিদর্শনে যাইতে হইত। সে সময় কোনও পীড়িত ব্যক্তিকে পথিমধ্যে দেখিলেই বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং পদব্রজে চলিতেন, আর পীড়িত ব্যক্তিকে পাল্কিতে বহন করিয়া কোনও স্থলে লইয়া গিয়া তাহার সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। অভাব পীড়িত ব্যক্তিবর্গকে সাহায্য করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বদাই টাকা, পয়সা, সিকি, দুয়ানী প্রভৃতি সঙ্গে রাখিতেন। যাহার যেরূপ প্রয়োজন, তিনি সেই ভাবে তাহাকে দান করিতেন। তাঁহার নিকট প্রার্থী হইয়া কেহ কখনও বিমুখ হয় নাই। কত বালকের পড়ার বন্দোবস্ত, আহার্য্যের সংস্থান, কত নিরন্ন দরিদ্রের প্রতিপালন ভার তিনি বহন করিতেন, তাহার সংখ্যা নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দান নীরবেই সম্পন্ন হইত। তাঁহার গুপ্তদানের ইতিহাস আজিও অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। দয়ার-সাগর কর্ম্মবীর ঈশ্বরচন্দ্র নীরবে দানকার্য্য সমাধা করিতে ভালবাসিতেন। মাতৃহীন ভিক্ষুককে

আশাতীতরূপে সাহায্য করিতেন। মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর, মাতৃহীনের অভাব প্রাণ দিয়া অনুভব করিতেন। এজন্য অনেক প্রার্থী, মাতৃহীন বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেকবার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বঞ্চনাপূর্ব্বক সাহায্য লইয়া গিয়াছে।

মাতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মাতৃমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। 'মা' নাম শুনিলে তাঁহার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইত। সঙ্গীতে তাঁহার অনুরাগ ছিল না; কিন্তু "মা" বলিয়া কেহ গান গাহিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রীতে অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনাঝঙ্কৃত হইত। তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ সে গান শ্রবণ করিতেন।

আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক দুঃস্থ পরিবারের মাসহরার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাঁহার ও তদীয় পিতৃদেবের আশ্রয়-দাতা জগদ্দুর্ল্লভ সিংহ মহাশয়ের মৃত্যুর পর তদীয় পরিবারবর্গ শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া, ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক ত্রিশ টাকা করিয়া মাসহরার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এরূপ কত দরিদ্র পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য যে তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বালবিধবার দুঃখে বিদ্যাসাগরের উদার মহৎহৃদয় ব্যথিত হইত। কোনও বালিকা বিধবা হইয়াছে শুনিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিতেন। ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই তাঁহার হৃদয়ে সংকল্প জন্মে যে, তিনি বিধবার দুঃখ মোচন করিবেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইবার কিছুকাল পরে নানা শাস্ত্র মন্থন করিয়া তিনি বিধবার পুনর্বিবাহের অনুকূলে শাস্ত্রবচন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সমাজে বিধবার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি এই বহুপরিশ্রম-সাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ১২৬২

সালে, ১৯শে আশ্বিন তারিখে বিধবাবিবাহ আইনে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে একসহস্র ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্ন ও চেষ্টায় ইহা সংঘটিত হয়। আলোচ্য বর্ষের ২রা অগ্রহায়ণ ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য গ্রাণ্ট সাহেব, ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা-বিবাহ আইনের একখানি পাণ্ডুলিপি পেশ করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের চেষ্টায় ছত্রিশ হাজার সাতশত তেষট্টি জন লোক উক্ত আইনের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেন। ভীষণ প্রতিবাদ ও আন্দোলন চলিল বটে; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। ১২৬৩ সালের ১২ই শ্রাবণ আইন পাশ হইয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অতঃপর বালবিধবাদিগের বিবাহের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি সর্ব্বসমেত প্রায় ষাটটি বালবিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন। এজন্য তিনি প্রায় বিরাশী সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। বিধবা বিবাহ আইনে পরিণত করা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে এক অতুল্য কীর্ত্তি। ঋণ করিয়াও তিনি বিধবার বিবাহ দিতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

বিধবার বিবাহ দিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ দৃঢ়সংকল্প হইবার সম্বন্ধে নানারূপ গল্প শুনা যায়। কাহারও কাহারও মতে মাতার নির্দ্দেশক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ দুরূহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কোনও বালবিধবার কষ্ট দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের জননী পুত্রকে বলেন, "হাঁরে, ঈশ্বর তোদের শাস্ত্রে কি এর কোন প্রতীকার নেই?" শুনা যায়, তদবধি ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা বিবাহের অনুকূলে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সাদা থান, মোটা চাদর ও চটিজুতা পরিয়াই ছোটলাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তিনিও সর্ব্বাগ্রে

এই মনস্বী পণ্ডিতের সহিত দেখা না করিয়া অন্যের সহিত আলাপ করিতেন না।

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার ইয়ং সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতানৈক্য অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। ইয়ং সাহেব সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবৃন্দের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। তদুপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে। ইয়ং সাহেব পদে পদে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উত্যক্ত করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোটলাট সাহেবকে এ সকল সংবাদ প্রকাশ করেন; কিন্তু তিনি ইয়ং সাহেবের সহিত সম্প্রীতি রাখিয়া কাজ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উপদেশ দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমতঃ সে চেষ্টাও করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্ষোভে, ক্রোধে, দুঃখে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও ইন্স্পেক্টারের পদ পরিত্যাগ করেন। পাঁচশত টাকা বেতনের পদ পরিত্যাগ করিতে তেজস্বী, কর্ম্মবীর ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা জন্মিল না। ছোটলাট বাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তেজস্বিতা দর্শনে প্রকৃতই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু দৃঢ়চেতা ব্রাহ্মণ, কোনও মতেই আর গোলামখানার উষ্ণীষ মাথায় ধারণ করিতে সম্মত হইলেন না।

তাঁহার এই কার্য্যে আত্মীয় স্বজন সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। পাঁচশত টাকা বেতনের সরকারী কাজ কেহ অবহেলায় এমন ভাবে ত্যাগ করিতে পারে? অনেকেই এই উপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বুদ্ধির নিন্দাও করিয়াছিলেন। চাকুরিগতপ্রাণ বাঙ্গালীর পক্ষে এরূপ দৃষ্টান্ত কল্পনারও অতীত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সকলের কথা শুনিয়া

হাসিয়াছিলেন। তুই এক জনকে উত্তরে বলিয়াছিলেন, "সংসারে সম্মানই অতি তুর্লভ বস্তু। সংসার চলা—সে একরকম চলিয়া যাইবে।"

সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগের পর বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার পথ আবিষ্কৃত করেন। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী ও নিজের লিখিত গ্রন্থাবলী হইতে তখন অর্থাগম মন্দ হইতেছিল না। বিধবা বিবাহের জন্য পূর্ব্বেই তাঁহার অনেক টাকা ঋণ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কেহ বিপদে পড়িয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলে তাঁহাকে বিমুখ করা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল, তা সে টাকার পরিমাণ যতই হউক না কেন? এই সকল কারণে ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছিল। তথাপি দয়ার-সাগর বিদ্যাসাগর কাহাকেও বঞ্চিত করিতেন না।

কবিবর মাইকেল মধুসূদনকে তিনি কত টাকার সাহায্য যে করিয়াছিলেন তাহার হিসাব নাই। বিলাতে পঠদ্দশায় এক এক বার ছয় সাত হাজার টাকা পাঠাইয়াছিলেন। মাইকেলের ঋণ শোধের জন্য অকাতরে দশ হাজার টাকা ঋণ করিয়া তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের করুণা বর্ষার বারিধারার ন্যায় নির্ব্বিচারে সর্ব্বত্রই সমানভাবে বর্ষিত হইত। বিচার করিয়া দয়া প্রকাশ করিতে তিনি জানিতেন না। একদা প্রখর পৌষের প্রবল শীতে বেপথুমানা বারবণিতার তুঃখ দর্শনে এই মহাপুরুষের, করুণাময় ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। অর্থদান করিয়া তাহাকে মাতৃ সম্বোধনে তৃপ্ত করিয়া সে রাত্রির মত গৃহে ফিরিবার পরামর্শ দিয়া বিদ্যাসাগর সার্ব্বভৌমিক দয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

কত বিপন্ন গৃহস্থের বাসভবন উত্তমর্ণের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা

নাই। নীরবে, গোপনেই অনেক সময় এই সকল মহদনুষ্ঠান সম্পন্ন হইত।

১২৭৬ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং বিদ্যালয়-পরিদর্শন করিতেন। রুগ্ন-শরীরেও তিনি কর্ত্তব্য সম্পাদনে উদাসীন ছিলেন না।

১২৭৩ সালে বাঙ্গলাদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। সে দুর্ভিক্ষের বর্ণনা পাঠ করিলে শরীর আতঙ্কে, বিভীষিকায় শিহরিয়া উঠে। বীরসিংহ গ্রামও দুর্ভিক্ষের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। করুণার অবতার বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্বগ্রামে অন্নসত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার জননী অনেককেই অন্ন বিতরণ করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরসিংহ ও সন্নিহিত দশ বারখানি গ্রামের নিরন্ন নরনারীর জন্য অন্নসত্র স্থাপন করেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধারা যখন আহারে বসিত, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে কখনও দ্বারবান ছিল না। যাহার ইচ্ছা সে গিয়া অনায়াসে তাঁহার দর্শন পাইত। একবার জনৈক ব্রাহ্মণ দ্বিপ্রহরে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তিনি চিনিতেন না। বাহিরের ঘরে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। লোকটি উত্তেজিত ও বিরক্ত ভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকিয়া দিতে বলিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আগন্তুক ব্রাহ্মণ বলিলেন, "অনেক বড়লোকের বাড়ী ঘুরিয়া আসিলাম, কাহারও

দেখা মিলিল না। একবার দেখিয়া যাই, বিদ্যাসাগরই বা কি রকম লোক।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে আহারাদি করিয়া শান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া জলস্পর্শ করিবেন না। ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইঙ্গিতে জলখাবার আসিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ব্রাহ্মণ জলযোগ করিলেন। তারপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দর্শনপ্রার্থী হইলে তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেন। ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপূর্ব্ব সৌজন্য ও মিষ্ট ব্যবহারে পরম পুলকিত-চিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে গমন করিবার সময় গাড়ী উল্‌টাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় পড়িয়া যান। তাহাতে তাঁহার যকৃতে ভীষণ আঘাত লাগে। বহুদিন চিকিৎসার পর তিনি প্রাণে বাঁচিলেন বটে; কিন্তু যকৃতের দোষ আর সারিল না। এই সময় হইতেই তাঁহার বজ্রবৎ কঠিন শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্ব্বসমেত সাতটি ভ্রাতা। তন্মধ্যে চতুর্থ, পঞ্চম ও সপ্তম ভ্রাতা ইতিপূর্ব্বেই পরলোকগমন করেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ষষ্ঠ ভ্রাতা সে সময় জীবিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভ্রাতা ও পরিবারবর্গের সকলকেই সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন। সকলের মঙ্গলোদ্দেশ্যে তিনি যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেন. কিন্তু কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে তিনি পারেন নাই।

১২৭৫ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বীরসিংহস্থ বাটী অগ্নিমুখে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন দেশে ছিলেন না। ইহার কিছুকাল পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরসিংহে আসেন। সে সময় একটি

বিধবার বিবাহ হইবার কথা ছিল। পাত্র ও পাত্রী তখন বীরসিংহ গ্রামে উপস্থিত। পাত্রটি যে পরিবারের ভিক্ষাপুত্র, তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ধরিয়া বসিলেন, "এ বিবাহ ঘটিলে সর্ব্বনাশ হইবে, অতএব রক্ষা করুন, অভয় দিন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বিদায় দেন; কিন্তু এদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা ও আরও কয়েকজন মিলিয়া রজনীযোগে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ ঘটনার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারেন নাই। পরদিন প্রভাতে ধূমপানকালে অকস্মাৎ শঙ্খধ্বনি শুনিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করেন। পরে প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় জন্মের মত বীরসিংহ গ্রাম পরিত্যাগ করেন। সত্যরক্ষায় অসমর্থ হইয়া তেজস্বী ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর নিজের গ্রাম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন।

১২৭৭ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবা বিবাহ করেন। এ বিবাহে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্নীর সম্পূর্ণ অমত ছিল মনে করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহকালে তাঁহাকে সংবাদ দেন নাই। ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার সহিত নারায়ণ বাবুর পরিণয় ক্রিয়া সমাধা হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী কাশীতেই পরলোক যাত্রা করেন। জননীর বিয়োগে ঈশ্বরচন্দ্র এক বৎসর হবিষ্যান্নাহারী ছিলেন। এ সময়ে তাঁহার আদর্শ-জীবনে যে যৎসামান্য ভোগ-বিলাস ছিল, তাহাও সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতা ও মাতার তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রত্যহ ভক্তিভরে চিত্রদ্বয় কিছুক্ষণ করিয়া দর্শন করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কাশীধামে পিতৃদর্শনে গমন করিলে স্বহস্তে পিতার জন্য অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া দিতেন।

পিতার পাতে প্রসাদ গ্রহণ করিতে ভ্রমেও কথনও তিনি দ্বিধা বোধ করিতেন না। কাশীধামে অবস্থানকালে জনৈক ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্ম্মমত জানিতে চাহিয়াছিলেন। উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, "আমার মত এ পর্য্যন্ত কাহাকেও বলি নাই, বলিবও না। তবে আপনি যদি মনে করেন, গঙ্গাস্নানে আপনার শরীর পবিত্র থাকে,শিবপূজা করিয়া মনে শান্তি ও পবিত্রতার উদয় হয়, তবে উহাই আপনার ধর্ম্ম।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কাশীধাম ও বিশ্বেশ্বরকে মানেন না শুনিয়া পাণ্ডারা একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি তবে মানেন কি?" তিনি উত্তরে বলেন, "আমার বাবা বিশ্বেশ্বর আর আমার মা বিশ্বেশ্বরী। আমি আর কিছু মানি না।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় পরমহংসদেবকে সরলস্বভাব ও সুদৃঢ় বিশ্বাসী ত্যাগী বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত প্রথম দিন দর্শনের পরই পরমহংসদেব বলেন, "আজ সাগরে আসিয়াছি কিছু রত্ন পাইব।" বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তরে বলেন, "এ সাগরে খালি শব্দের শামুক, জ্ঞানের রত্ন নাই।" এই আলাপের পর হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয় পরমহংসদেবকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।

১২৭৯ সালের পর হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুত্রের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। নানাকারণে ক্রমে পিতা ও পুত্রের মধ্যে প্রকাণ্ড ব্যবধানের সমুদ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কর্ত্তব্যানুরোধে ঈশ্বরচন্দ্র পুত্রকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার পুত্রস্নেহের ধারা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অতঃপর সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত কর্ম্মাটার নামক স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে একটি নিভৃত-নিবাস প্রস্তুত করেন। বিশ্রামের

জন্ম অধিকাংশ সময় তিনি এইখানেই থাকিতেন। সাঁওতালদিগকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, তাহাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি জানাইতেন।

১২৮২ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতৃহারা হন। সে সময় বালকের ন্যায় বিদ্যাসাগর পিতৃশোকে রোদন করিয়াছিলেন। ১২৯৫ সালে রক্তামাশয় রোগে পত্নীও ইহধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। পত্নী-বিয়োগের পর বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত শোকবিমূঢ় হইয়া পড়েন।

পত্নীবিয়োগের পর বিদ্যাসাগর মহাশয় তিন বৎসর মাত্র বাঁচিয়াছিলেন। ১২৯৮ সালের শ্রাবণ মাসে উদরাময় রোগে বিদ্যাসাগর মহাশয় শয্যাশায়ী হন। এ যাত্রা শয্যাত্যাগ করিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সহিষ্ণুতার অবতার ছিলেন। নিদারুণ রোগেও তিনি যন্ত্রণার চিহ্ন প্রকাশ করিতেন না। যতক্ষণ চৈতন্য ছিল, তিনি কাহাকেও মলমূত্র পরিষ্কার করিতে দেন নাই। যে ঘরে জননীর তৈলচিত্র ছিল, সেই কক্ষেই তিনি শায়িত ছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মাথা ঘুরাইয়া তিনি নির্ণিমেষনেত্রে জননীর তৈলচিত্রের দিকে চাহিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার নেত্রপথ বাহিয়া অজস্র অশ্রু প্রবাহিত হইয়াছিল। ১৩ই শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত্রি ২টা ১৮ মিনিটের সময় বাঙ্গালার গৌরব দয়ার-সাগর বিদ্যাসাগর ইহধাম হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

বাঙ্গালাভাষার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেই মন্দিরে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল নৈবেদ্য সাজাইয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পত্তি। সেগুলির নাম—(১) বাসুদেব চরিত, (২) বেতাল পঞ্চবিংশতি, (৩) বঙ্গদেশের ইতিহাস, (৪) বোধোদয়, (৫) উপক্রমণিকা ব্যাকরণ, (৬) ঋজুপাঠ প্রথম ভাগ, (৭) ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, (৮) ঋজুপাঠ তৃতীয়

ভাগ, (৯) ব্যাকরণ কৌমুদী ১ম ভাগ, (১০) ব্যাকরণ কৌমুদী দ্বিতীয় ভাগ, (১১) ব্যাকরণ কৌমুদী তৃতীয় ভাগ, (১২) শকুন্তলা, (১৩) জীবন-চরিত, (১৪) বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা, (১৫) বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ, (১৬) বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ, (১৭) চরিতাবলী, (১৮) সংস্কৃত-ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, (১৯) সীতার বনবাস, (২০) ব্যাকরণ কৌমুদী ৪র্থ ভাগ, (২১) আখ্যানমঞ্জরী ১ম ভাগ, (২২) আখ্যানমঞ্জরী ২য় ভাগ, (২৩) আখ্যানমঞ্জরী ৩য় ভাগ, (২৪) বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না। এতদ্ব্যতীত "বিদ্যাসাগর চরিত" নামক আত্মজীবন কাহিনীও তিনি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কর্ম্মী বিদ্যাসাগর বাঙ্গালার ক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি চিরদিন অক্ষয়, অটুট থাকিবে। মাতৃমন্ত্রের উপাসক, মাতৃভক্ত সন্তান বাঙ্গালীকে মায়ের পূজা করিবার, শ্রদ্ধা করিবার, অর্চ্চনা করিবার পদ্ধতি দেখাইয়া গিয়াছেন। করুণার অবতার, কেমন করিয়া আপন পর ভুলিয়া, আব্রাহ্মণ চণ্ডালের সেবা করিতে হয়, শুশ্রূষা করিতে হয়, দয়ার বন্যায় প্লাবিত করিয়া দিতে হয়, তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। মাতৃভাষার মন্দির গড়িয়া, সোপান হইতে মন্দিরচূড়া পর্যান্ত আপনাকে মিলাইয়া মিশাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর শুভদৃষ্টবশতঃ বাঙ্গালার মাটীতে এমন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ আসিয়াছিলেন ; দেশের কাজে, দশের কাজে, মায়ের কাজে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের গৌরবে বাঙ্গালী গৌরবান্বিত, মাতৃভূমির আনন প্রসন্নহাস্যের রক্তিম-আভায় সমুজ্জ্বল। কোন্ বাঙ্গালী বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণী নহে ? যেদিন বাঙ্গালী বিদ্যাসাগরের আদর্শে মাতৃভাষায়, দেশের ও দশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে

পারিবে, বিদ্যাসাগর! সেইদিন কি তোমার নিকট চিরঋণী বাঙ্গালী-জাতি কথঞ্চিৎ ঋণমুক্ত হইবার অধিকার পাইবে?

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিয়োগে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় যে অনুরাগ-সুরভিত ভক্তিপুষ্পাগুলি দিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই তেজোদীপ্ত মহাপুরুষের আদর্শ জীবনীর পরিসমাপ্তি করিব।

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেমকান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে সে মহাপর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ-চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদী-রূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত-ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরুদল দাসরূপ ধরি';
পরিমলে ফুল-কুল দশদিশ ভরে;
দিবসে শীতল-শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী;—
[illegible]ায় সু-শান্ত নিদ্রা-ক্লান্তি দূর করে!

হাজি মহম্মদ মহসীন

১৭৩২ খৃষ্টাব্দে হুগলী নগরীতে হাজি মহম্মদ মহসীন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হাজি ফয়জুল্লা। আগা মতাহর নামক জনৈক পারস্য দেশীয় সম্ভ্রান্ত বণিক হুগলীতে ব্যবসার উপলক্ষ্যে বসবাস করেন। তাঁহার বিধবা পত্নীকে হাজি ফয়জুল্লা বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে মহম্মদ মহসীন জন্মগ্রহণ করেন। আগা মতাহর মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র কন্যা মন্নুজানকে বিপুল আয়ের সমগ্র স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দান করিয়া যান। মন্নুজানের মাতা ধনকুবেরের পত্নী হইয়াও যখন দেখিলেন যে, তাঁহার স্বামী কপর্দ্দকমাত্র তাঁহাকে না দিয়া সর্ব্বস্বই কন্যাকে দান করিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি নিরুপায় হইয়া হাজি ফয়জুল্লাকে পুনরায় স্বামিত্বে বরণ করেন।

হাজি ফয়জুল্লাও সম্ভ্রান্ত পারস্যদেশীয় বণিক ছিলেন, তবে ব্যবসায় উপলক্ষে ক্রমে তিনি বহু ধনরত্ন হারাইয়া দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহম্মদ মহসীন যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, তখন বাঙ্গালাদেশে সম্ভ্রান্তবংশের পুত্রগণ প্রায়ই বিলাসিতায় মগ্ন থাকিতেন। নৃত্যগীত, পানভোজন যথেচ্ছ ভাবেই চলিত। সংযম শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। মহসীন এইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও বাল্যকাল হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণের পরিচয় দিয়াছিলেন।

মহসীন পিতামাতার আদরের দুলাল ছিলেন। নানাপ্রকার ভোগ-বিলাসের মধ্যেই তিনি লালিত হইয়াছিলেন; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছিল যে, তিনি আমোদপ্রমোদে উদাসীন। সর্ব্বদাই তিনি কি যেন চিন্তা করেন। নির্জ্জনতা যেন তাঁহার নিকট অধিক স্পৃহনীয়। যেখানে গোলমাল, হুড়াহুড়ি, মহসীন তাহার ত্রি-সীমায় নাই। আমোদ-প্রমোদের নাম শুনিলেই তিনি দূরে পলায়ন করেন। অথচ যেখানে ভগবানের নাম গান হয়, স্তোত্র পাঠ চলে, মহসীন সেখান হইতে নড়িতে চাহে না। নমাজের সময় বালক মহসীন, কিছু বুঝিতে না পারিলেও আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। বালককাল হইতেই তাঁহার এই বিচিত্র ব্যবহারে সকলেই বিস্ময়কর বোধ করিতে লাগিলেন।

শৈশবসুলভ কোনও প্রকার চপলতা তাঁহাতে প্রকাশ পায় নাই। বাল্যকাল হইতেই ভোগ-বিলাসে তিনি বিগতস্পৃহ ছিলেন। উৎকৃষ্ট বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া দিলেও তিনি তজ্জনিত কোনও আনন্দ প্রকাশ করিতেন না। কোনও ভিক্ষুক তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলেই, তিনি অঙ্গের বহুমূল্য বসনাদি তৎক্ষণাৎ দান করিয়া ফেলিতেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিদ্যার্জ্জনের প্রতি সমধিক অনুরাগ প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রথমতঃ, কোনও পুস্তক দেখিলেই তিনি সর্ব্ব-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, বইখানি গ্রহণ করিতেন, পাতা উল্টাইয়া যাইতেন। সে সময়ে যে কেহ লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইত, বালকের মুখখানি তখন আনন্দে কিরূপে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সিরাজী নামক জনৈক মহাপণ্ডিত মুসলমান ভদ্রলোকের উপর মহ-সীনের শিক্ষার ভার পড়িয়াছিল। তিনি আরবী ও পারসী ভাষায় সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন। নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া সাংসারিক সকল বিষয়েই তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতাও জন্মিয়াছিল। সিরাজী পরম চরিত্রবানও ছিলেন। এরূপ গুরুর নিকটে বিদ্যার্জ্জনের অবকাশ পাইয়া মহসীনের

মহৎ উপকার হইয়াছিল। সিরাজীর নিকট হইতে বিদেশ ভ্রমণের বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া শুনিয়া বাল্যকাল হইতেই মহসীনের হৃদয়ে দেশ-পর্য্যটনের ইচ্ছা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

সৎগুরুর সাহচর্য্যে মহসীনের প্রকৃতিদত্ত মহৎ অন্তঃকরণও ক্রমে বিস্তৃতিলাভ করিতে লাগিল। গুরুর ন্যায় আরবী ও পারসী ভাষায় অসামান্য অধিকার লাভের জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক ভোগতৃষ্ণায় তাঁহার বিরাগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অপরের মঙ্গলেব জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাস ও ভক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উপযুক্ত গুরুর সহায়তায় যাবতীয় মহৎগুণ মহসীনের হৃদয়ে প্রভাব-বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল।

সিরাজীর নিকট শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করিয়া মুর্শিদাবাদের মক্তবে মহসীন অধ্যয়নার্থ গমন করিলেন। মুর্শিদাবাদের মক্তবই তখন মুসলমানছাত্রগণের শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্জ্জনের স্থান ছিল। এই মক্তবে পাঠ না করিলে সে সময়ে কেহ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারিত না।

মুর্শিদাবাদাদের পাঠ সাঙ্গ হইলে তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা আরও বর্দ্ধিত হইল। অন্যান্য ছাত্রের ন্যায় পাঠ-শেষে তিনি সংসারে প্রবেশ করিলেন না। সংসার-সুখভোগে তাঁহার বিন্দুমাত্র স্পৃহা ছিল না। উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যগ্র হইয়া উঠিল। দেশ-ভ্রমণের প্রবল আগ্রহও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিল।

পিতামাতাকে কোনও রূপে বুঝাইয়া মহসীন আরব ও পারস্যদেশে গমন করিলেন। আরবী ও পারসী এই দুইটি কঠিন ভাষাতে তিনি সমধিক পারদর্শিতা লাভ করিবার প্রবল আগ্রহ তাঁহার ছিল। বিশেষ পরিশ্রম-সহকারে অধ্যয়ন করিবার পর দুইটি ভাষাতেই তাঁহার অনন্য-সাধারণ

জ্ঞান জন্মিল। মুরশিদাবাদে অবস্থানকালেই তিনি সর্ব্বদাই সাধু, দরবেশ, মৌলবী, ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের সহিত সমধিক মিশিতেন; ভিন্ন ভিন্ন দেশে পর্য্যটন উপলক্ষ্যেও তিনি বহুতর সাধু, দরবেশ ও পণ্ডিতের সংস্রবে আসিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার চরিত্রও মহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকের সাহায্যে তিনি যথার্থরূপেই বুঝিয়াছিলেন যে, সংসারের ভোগ-বিলাসে, ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যায় মানুষের প্রকৃত আনন্দলাভ ঘটিতে পারে না। এজন্য তিনি কামনাকে সর্ব্বতোভাবে জয় করিবার চেষ্টা করিয়া পরিণামে সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শারীরিক বলের চর্চ্চায় বিশেষ অবহিত ছিলেন। তাঁহার শরীরে যথেষ্ট সামর্থ্য ছিল। মল্লবিদ্যা তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অশ্বারোহণ, তরবারী ক্রীড়া, সন্তরণ—সকল বিষয়েই তাঁহার পর্য্যাপ্ত অধিকার ছিল। সুদৃঢ় দেহ, অটুট স্বাস্থ্য না থাকিলে, মনের স্বাস্থ্যও অব্যাহত থাকে না,এ তত্ত্বটি তিনি ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন। সেজন্য ব্যায়াম-পটুতার দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

মক্কা ও মদিনা তীর্থ দর্শনের পর তিনি নাজফ্ নামক স্থানে গমন করেন। সে সময়ে নাজফ্ এসিয়া মহাদেশের মধ্যে আরবী ও ফারসী ভাষা চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। এই স্থানে যাইবার সময় তিনি পথিমধ্যে দস্যুদলের দ্বারা আক্রান্ত হন। দস্যুগণ তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। বিদেশে, সহায়শূন্য স্থানে, কপর্দ্দকবিহীন অবস্থায় তাঁহাকে ঘোরতর অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু মহসীন তথাপি বিচলিত হন নাই। ভগবানে তাঁহার অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। তিনি দারুণ দুর্দ্দশায় পড়িয়া ভগবানে বিশ্বাস হারান

নাই। বরং বিপদে পড়িবার পর হইতে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

মহসীন আরব ও পারস্যদেশে অবস্থানের পর তত্রত্য রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারে পারদর্শী হইয়া তুরস্ক ও মিশরদেশ পর্য্যটনে গমন করেন। তুরস্ক ও মিশরের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, মনুষ্যচরিত্র প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার পর মহসীন মহাপণ্ডিত হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি দেশপর্য্যটন করিয়া বিভিন্ন নগরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন ও লোকচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না।

হাজি মহম্মদ মহসীনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তখন সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। তাঁহার তুল্য পণ্ডিত সে সময়ে এদেশে মুসলমান সমাজের মধ্যে অতি অল্পই পরিলক্ষিত হইত। কোরাণের ব্যাখ্যা লইয়া কোনও বিচারের প্রয়োজন হইলে মৌলবীগণ তাঁহার কৃত ব্যাখ্যাই অবিসংবাদী সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন।

মহসীনের একটি ভগিনী ছিলেন। তাঁহার জননীর পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যা মন্নুজান অগাধ পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। মন্নুজান কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহসীনকে অপরিসীম স্নেহ করিতেন। তিনি পিতার অন্তিম আদেশানুসারে তাহার মাতুলপুত্র সলাউদ্দীনের পাণিগ্রহণ করেন; কিন্তু বিবাহের অত্যল্পকাল পরেই মন্নুজানকে বৈধব্যবেশ ধারণ করিতে হইয়াছিল। পুনরায় বিবাহে মন্নুজানের স্পৃহা ছিল না। তিনি পিতৃপরিত্যক্ত অগাধ বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া তাহারই পালন ও সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সংসারে স্পৃহা না থাকায় মন্নুজান সহোদর মহসীনকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন।

মহসীনের অপেক্ষা তিনি বয়সে অনেক বড় ছিলেন। স্নেহময় ভ্রাতাটিকে কাছে আনিবার জন্ত বহুদিন হইতেই তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু মহসীন তখন সুদূর প্রবাসে প্রায় অজ্ঞাতবাসেই কাটাইতে ছিলেন।

ক্রমে মন্নুজান বার্দ্ধক্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। মহসীনকে দেশে ফিরিবার জন্ত পুনরায় পত্র লিখিলেন। মহসীন তখন মিশরদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া দেশপর্য্যটন করিতেছিলেন। ভগিনীর পত্র পাইয়া মহসীন প্রথমতঃ চুপ করিয়া রহিলেন, দেশে ফিরিলেন না। অবিরত ধর্ম্মকর্ম্ম ও সাধুসঙ্গে থাকিয়া সংসারের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল; কিন্তু শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, স্নেহময়ী ভগিনীর অনুরোধে উপেক্ষা করিবার উপায় রহিল না।

ভগিনীর মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া অগত্যা তিনি হুগলীতে ফিরিয়া আসিলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মন্নুজান ভ্রাতাকে সমস্ত বিষয়-বিভবের উত্তরাধিকার দান করিয়া পরলোকযাত্রা করিলেন।

উদাসীন মহসীন অতুল বিষয়-বিভবের অধিকারী হইলেন দেখিয়া, বহুসংখ্যক পরশ্রীকাতর ব্যক্তির হৃদয় ঈর্ষাভরে জ্বলিয়া উঠিল। বান্দা আলি খাঁ নামক একব্যক্তি আসিয়া বিষয়-সম্পত্তির অধিকার দাবী করিয়া বসিল। মহসীন বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন; কিন্তু ভগিনীর মৃত্যুকালে শপথ সহকারে যে সম্পত্তি পরিচালনের ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, একজন জুয়াচোরের হাতে তাহা সমর্পণ করিতে তাঁহার বিবেক বাধা দিল। তিনি জানিতেন, ভগিনীর সম্পত্তিতে বান্দা আলি খাঁর কোনও ন্যায়সঙ্গত অধিকার নাই।

মামলা শেষে আদালতে গড়াইল। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য মহসীন-কেও লড়িতে হইল; কিন্তু এ সকল বৈষয়িক ব্যাপারে এমন ভাবে লিপ্ত হইতে হইতেছে দেখিয়া, তিনি মনে মনে সংসারের প্রতি আরও বিরূপ হইয়া উঠিলেন। আদালতে ধর্মের জয়লাভ ঘটিল। মহসীন যে মন্নুজানের ত্যক্তসম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী, সে বিষয়ে আদালতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেল। শত্রুপক্ষ গতিক ভাল নহে দেখিয়া তাঁহার সহিত শত্রুতাচরণে বিরত হইল।

মহসীনের ঐশ্বর্য্য ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। আত্মীয়-স্বজন মহসীনকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহসীন সংসারে জড়াইয়া পড়িবার কোনও লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না। রমণীকুলের প্রতি তিনি অনাসক্ত ছিলেন। সংসারের কোনও প্রলোভন তাঁহাকে অভীষ্ট সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না।

আর্ত্তপীড়িত, দরিদ্র, নিরন্নের সেবার জন্য মহসীন তাঁহার ধনভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ফকীর মহসীন জ্ঞান ও অর্থ বিতরণের কোনও দিন কৃপণতা করেন নাই।

তাঁহার হস্তাক্ষর অত্যন্ত চমৎকার ছিল। কোরাণের উৎকৃষ্ট 'বয়েৎ' গুলি স্বহস্তে লিখিয়া তিনি ভিক্ষুকবর্গকে বিলাইতেন। তাহারা উহা বাড়ী বাড়ী বেচিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। বাস্তবিক সে সময়ে ভিক্ষুকের সংখ্যা সেখানে অনেক কমিয়া গিয়াছিল।

মহসীন অনেক সময় রাত্রিকালে নগর ও গ্রামবাসিগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেন। সে সময়ে কাহারও কোনও অভাব দেখিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সে অভাব পূর্ণ করিতেন।

এক মুহূর্ত্তও মহসীন বৃথাকার্য্যে যাপন করিতেন না। সর্ব্বক্ষণই হয় তিনি অধ্যয়ন, নয়ত ধর্ম্মালোচনা, অথবা কোনও প্রকার লোকহিতকর অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন।

মহসীনের দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি গুণে সকলেই তাঁহার পরম অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। লোকশিক্ষার জন্য তিনি হুগলীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সাধারণের বিদ্যালাভের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। সে বিদ্যালয়ে জাতিবিচার ছিল না। শুধু তাহাই নহে, যশোহর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের মাদ্রাসাগুলির ক্রমোন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য প্রদান করিতেন।

দানবীর মহসীনের কীর্ত্তিকলাপ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার কাছে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না। তিনি সকলকেই সমান চক্ষে দর্শন করিতেন। আচার-ব্যবহারে তিনি কোনও প্রকার গোঁড়ামীর পরিচয় কোনও দিন দেন নাই। গুম্ফ শ্মশ্রু রাখার দিকে তাঁহার আদৌ বাসনা ছিল না। হিন্দু কর্ম্মচারিবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া মুণ্ডিত শীর্ষ, গুম্ফ-শ্মশ্রুহীন মহসীন যখন বসিয়া থাকিতেন, তখন প্রকৃতই কেহ তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া বুঝিতে পারিত না।

মহসীন সঙ্গীতের প্রিয় ছিলেন; কিন্তু ধর্ম্ম বা ঈশ্বরবিষয়ক গান ব্যতীত, টপ্পা, খেয়াল অথবা বৈঠকী গানের পক্ষপাতী ছিলেন না। ভগবানের নাম গান যে ভাবেই হউক না কেন, শ্রবণমাত্রই তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িত। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন।

কিছুকাল পরে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে ধর্ম্মবীর, দানবীর, কর্ম্মবীর মহসীন উইলদ্বারা ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকার আয়ের বিপুল সম্পত্তির সমুদয়ই দীনদরিদ্র, অভাব পীড়িতের সেবার জন্য উৎসর্গ

করিয়া যান। এ দান যথার্থই সকলকে সে সময়ে বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়াছিল। ধর্ম্মকার্য্যে ও পরসেবায় সমুদয় সম্পত্তি উৎসর্গ করিবার পর ছয় বৎসর মাত্র মহসীন জীবিত ছিলেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে দয়া ও করুণার অবতার, ধর্ম্মপ্রাণ মহসীন চিরদিনের জন্য ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

সন্ন্যাসী মহসীনের আদর্শ জীবনের কথা স্বল্পে শেষ করা যায় না—এক গুণের কথা বলিতে শত গুণের কিরণসম্পাত চক্ষে প্রতিফলিত হয়। মোসলেম-ধর্ম্মনিষ্ঠগণ প্রায়ই হিন্দুবিদ্বেষী হন—এমন কি, বিধর্ম্মীকে তাঁহারা কাফের আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত হন না—হাজি সাহেব নিষ্ঠাবান 'মিয়া' ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা একেবারেই ছিল না, তাঁহার জমিদারীতে হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বী অনেক কর্ম্মচারী ছিল; কতকগুলি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ মৌলভী হিন্দু-কর্ম্মচারীনিয়োগে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন। মহসীন বিনীতভাবে তাঁহাদের নিবেদন করেন যে, "আমার জমিদারীতে হিন্দু প্রজাই বেশী, হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী ও অল্প বেতনে তাঁহাদের দ্বারা ভাল ও বেশী কাজ পাওয়া যায়, আমি এ সম্বন্ধে আকবরের নীতিই উৎকৃষ্ট মনে করি। তিনি রাজস্ববিভাগে সমস্তই হিন্দুকর্ম্মচারী নিয়োজিত করিয়া হিন্দু মুসলমানের ভেদনীতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। মহসীন সম্পত্তির বিপুল বিত্ত হইতে নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ না করিয়া সামান্য দর্জ্জির কার্য্যে জীবিকা অর্জ্জন করিতেন—তরবারী চালনায়ও তাঁহার দক্ষতা ছিল, নিজের সামান্য খাদ্য স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিতেন। মহসীন-ফণ্ডের অর্থে হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহীর মাদ্রাসা কলেজগুলি চলিতেছে, এতদ্ভিন্ন সমগ্র বঙ্গের মুসলমান ছাত্রগণ এই ফণ্ড হইতে নানাপ্রকার সাহায্য লাভ করিতেছে।

বিচারপতি আমীর আলি এই ফণ্ডের অর্থসাহায্যে বিলাত যাইয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। হুগলীর ইমামবাড়ী মহসীনের অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তি।

হাজি মহম্মদ মহসীন, সমগ্রবঙ্গের হৃদয়োত্থিত পূজার অর্ঘ্য পাইয়াছেন। তিনি মুসলমান সমাজের অলঙ্কার সমগ্র বঙ্গের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। হিন্দু মুসলমান এই মহাপ্রাণ সন্ন্যাসীর পবিত্র চরিত্র-গাথা গাহিয়া স্বয়ং ধন্য হয় এবং অপরকে ধন্য করে। মহসীনের ন্যায় উদার-প্রাণ, মহৎ-হৃদয়, করুণাময় সন্ন্যাসী---বাঙ্গালায় বড় অধিক সংখ্যক জন্মগ্রহণ করেন নাই। বিস্তীর্ণ জমীদারীর মালিক, প্রভূত অর্থের ঈশ্বর হইয়াও এই ভোগস্পৃহা-হীন উদাসীন যেরূপ কর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা স্বর্ণাক্ষরে বাঙ্গালার ইতিহাসে---বাঙ্গালীর হৃদয়-মন্দিরে চিরদিন সমুজ্জ্বল থাকিবে। হুগলীর প্রসিদ্ধ ইমামবাড়ীর নামের সঙ্গে মহসীনের চিরস্মরণীয় নাম বিজড়িত। হিন্দু মুসলমানে ভেদ-জ্ঞান কোনও দিন তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই, তাঁহার কোনও কার্য্যে কখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই। বিশ্ব-মানবতার আদর্শস্বরূপ মহসীন, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বজনের চির-আদরের পাত্র। তাঁহার হৃদয় যে উচ্চতম আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল, তাহা দুর্লভ। নীচ স্বার্থপরতা, হীন জাতিগত বিদ্বেষ এই মহাপ্রাণ ফকিরের উদার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই। হাজি মহম্মদ মহসীনের পবিত্র নাম স্মরণ করিলে হৃদয় পবিত্র হয়, তাঁহার করুণার পরিচয় পাইলে মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। বহু দিন মহসীন পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার কথা মনে করিতেও এখন বাঙ্গালীর হৃদয় গর্ব্ব, আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

রামতনু লাহিড়ী

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর, সোমবার রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় মাতুলালয় বারুইহুদা গ্রামে রামতনু জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগরে লাহিড়ী পরিবার সুপ্রসিদ্ধ। রামতনুর পিতার নাম রামকৃষ্ণ। জননীর নাম জগদ্ধাত্রী। রামকৃষ্ণের সর্ব্বসমেত দশটী সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে—রামতনু সপ্তম। রামকৃষ্ণের তিনটী পুত্র ও একটি কন্যা অতি অল্প বয়সেই পরলোক যাত্রা করেন। রামতনু জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তদীয় জোষ্ঠাগ্রজ কেশবচন্দ্র ও ভগিনী ভবসুন্দরী বিদ্যমান ছিলেন। পরে তাঁহার আরও তিনটি কনিষ্ঠ সহোদর লাভ ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের নাম রাধাবিলাস, শ্রীপ্রসাদ ও কালীচরণ।

রামতনুর পিতা রামকৃষ্ণ সামান্য পৈত্রিক সম্পত্তির আয় ও লালাবাবু-দিগের জমীদারীর তত্ত্বাবধান করিয়া যে যৎসামান্য উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। রামকৃষ্ণ অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু ছিলেন, তাঁহার পদের বেতনও সামান্য ছিল। অসৎ উপায়ে তিনি কপর্দ্দকমাত্রও গ্রহণ করিতেন না, কাজেই স্বল্প আয়ে বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণ অতি কষ্টেই নির্ব্বাহিত হইত। রামকৃষ্ণ সন্তানবর্গের চরিত্র গঠনের জন্য সর্ব্বদাই অবহিত ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে কুসঙ্গে মিশিতে দিতেন না। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর সন্তানগণকে কাছে বসাইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন।

পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে রামতনুর হাতেখড়ি হয়। সে সময় পাঠশালা-তেই বিদ্যারম্ভের সূচনা হইত। রামতনু পাঠশালায় পড়িতে আরম্ভ করেন।

গুরুমহাশয়ের প্রহারের ভয়ে পাঠশালায় ছাত্রগণ সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিত। অনেকে চুরি করিতেও শিখিত। পরিণত বয়সে আত্মজীবন কাহিনী রচনাকালে রামতনু বাবু লিখিয়াছিলেন যে, তিনিও অন্য বালকের প্ররোচনায় বাল্যকালে চুরি করিতে শিখিয়াছিলেন।

বাল্যকালে রামতনুর ঘোড়ায় চড়িবার প্রবল আগ্রহ ছিল। সমবয়স্ক বালকবৃন্দের সহায়তায় গ্রামে ভারবাহী ঘোড়াগুলি ধরিয়া রামতনু ঘোড়ায় চড়ার সখ মিটাইতেন। শুধু তাহাই নহে, কৃষ্ণনগরের চতুর্দ্দিকেই তখন অসংখ্য মনোরম উদ্যান ছিল, সেই সকল উদ্যান তাঁহাদের বিহারভূমি হইয়াছিল।

কুসঙ্গে মিশিয়া রামতনুর ভবিষ্যৎ অন্ধকারজনক হইবে এই আশঙ্কায় তদীয় জনক জননীর হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তাঁহারা রামতনুকে কৃষ্ণনগর হইতে অন্যত্র রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রামকৃষ্ণও নিজে সাধুস্বভাব ছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে সাধু-রামকৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করিত। তিনি সন্তানদিগকে সর্ব্বদাই চক্ষে চক্ষে রাখিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু দিবারাত্র কি চোখে চোখে রাখা সম্ভবপর? রামতনুর পিতামাতা দেখিলেন যে, দ্বাদশবর্ষীয় বালক, সেই বয়সেই অকালপক্কতার পথে অগ্রসর হইয়াছেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর কেশবচন্দ্র তখন আলিপুরে কার্য্য করিতেন। তাঁহার বাসা কালীঘাটের পরপারবর্ত্তী —চেতলা গ্রামে ছিল। পরামর্শের পর স্থির হইল, রামতনু কেশবচন্দ্রের চেতলার বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিবেন, নহিলে কৃষ্ণনগরে থাকিলে তাঁহার পরিণাম শুভজনক হইবে না।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রামতনু জ্যেষ্ঠের চেতলাস্থিত বাসায় আসিলেন। কেশবচন্দ্র তখন মাসে ত্রিশ টাকা বেতন পাইতেন।

এতদ্ব্যতীত দেশীয় ও ভিন্ন দেশীয় ভদ্রলোকদিগের মামলা মোকদ্দমার তদ্বির করিয়া কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতেন। সেই আয়ে কৃষ্ণনগর ও চেতলা উভয়স্থলের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া বিশেষ কিছু সঞ্চয়ের সম্ভাবনা ছিল না।

কেশবচন্দ্র ভ্রাতাকে কলিকাতায় আনাইয়া তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার জন্য চিন্তিত হইলেন। তখন চেতলার সন্নিকটে কোনও ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না। তিনি ভ্রাতাকে ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শী করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু সুকুমারমতি বালককে ঠিক কলিকাতায় রাখিতে না পারিলে, ইংরাজী বিদ্যা অধ্যয়নের সুবিধা হইবে না, অথচ কাহার আশ্রয়েই বা রাখিয়া দেন, এইরূপ দুশ্চিন্তায় কেশবচন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিলেন।

রামতনু কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে পারস্যভাষা ও যৎসামান্য ইংরাজী শিখিয়া আসিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র স্বয়ং প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যায় ভ্রাতাকে এই দুই বিষয়ে পাঠ বলিয়া দিতেন। এইরূপে কিছুদিন পরে অনেক কষ্টে তিনি রামতনুকে হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে ভর্ত্তি করিয়া দেন। রামতনু সহজে হেয়ার সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। তিনি যে সময় স্কুল সোসাইটী স্কুলে পাঠ করিতে গিয়াছিলেন, তখন হেয়ার সাহেব বিনা বেতনে ছাত্র গ্রহণ করা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। যে কয়জনকে বিনা বেতনে গ্রহণ করা নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন, সে সংখ্যাও পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু রামতনু তথাপি হতাশ হইলেন না। তিনি প্রত্যহ হেয়ার সাহেবের পাল্কীর সহিত ছুটিতেন। যেখানেই তাঁহার পাল্কী যাইত, রামতনু সেইখানেই উপস্থিত থাকিতেন। হেয়ার সাহেব বালকের এইরূপ অসাধারণ আগ্রহ দেখিয়া অবশেষে তাঁহাকে বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে গ্রহণ করিলেন।

কেশবচন্দ্রের অনুরোধে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাঁহার কলিকাতাস্থিত বাসায় রামতনুকে স্থান দিলেন। বাসায় স্ত্রীলোকের সংস্রব ছিল না। পুরুষগণ পালাক্রমে রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম করিতেন। বাসায় লোকেরা বালক রামতনুর দ্বারা রন্ধনের কার্য্য করাইয়া লইতেন। এজন্য তাঁহার পাঠের বড়ই অসুবিধা হইত; কিন্তু উপায় ছিল না।

ক্রমে কেশবচন্দ্র ভ্রাতার কষ্টের কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় পিতার মাতুলপুত্র রামকান্ত খাঁ মহাশয়ের শ্যামপুকুরস্থিত ভবনে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এখানে আসিবার পর রামতনুর অনেক বিষয়ে সুবিধা হইল। খাঁ মহাশয় সপরিবারে কলিকাতায় থাকিতেন। তদীয় পত্নী বালক রামতনুকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এতদ্ব্যতীত এখানে আসিয়া রামতনুর আর একটি লাভ হইল। তাঁহার সহপাঠী দিগম্বর মিত্র সে সময় শ্যামবাজারে মাতুলালয়ে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছিলেন। রামতনু, দিগম্বরের সহিত প্রায় দেখা করিতে যাইতেন। সেখানে তাঁহার মাতা বালক রামতনুকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, তাঁহার সকল বিষয়ে সর্ব্বদা সংবাদও গ্রহণ করিতেন। বিদেশে রামতনু দিগম্বরের জননীর নিকট হইতে মাতৃস্নেহের অধিকারী হইয়াছিলেন। রামতনুর যখন যে বিষয়ের অভাব হইত, এই অশেষ স্নেহশালিনী মহিলা তখনই তাঁহার সে অভাব মোচন করিতেন। কলিকাতার মত প্রলোভনপূর্ণ স্থানে রামতনু যে সুকুমার বয়সে পাপ প্রলোভনকে দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার প্রধান হেতু রামকান্ত খাঁ মহোদয়ের পত্নী ও দিগম্বর মিত্রের জননীর স্নেহের প্রভাব।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রামতনু স্কুল সোসাইটীর বিদ্যালয় হইতে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তিলাভ করেন ও তৎপরে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। সে সময়ে

এইরূপ নিয়ম ছিল যে, স্কুল সোসাইটির শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণ হিন্দু কলেজে আসিত। তন্মধ্যে যাহাদের অবস্থা মন্দ, তাহাদের কলেজের বেতন স্কুল সোসাইটি প্রদান করিতেন। রামতনু অবৈতনিক ছাত্ররূপে কলেজে পড়িতে লাগিলেন। সে সময়ে হেনরী ভিভিয়ান্ ডিরোজিও নামক জনৈক ফিরিঙ্গীযুবক অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। ডিরোজিওর অসাধারণ প্রতিভা তখন চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। রামতনু এই ডিরোজিওর অন্যতম মন্ত্রশিষ্য। ডিরোজিও ছাত্রবৃন্দের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাশক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন। অবসরকালে বালকের দল ডিরোজিওর ভবনে সমবেত হইয়া নানাপ্রকার বিষয়ের আলোচনা করিত। একবার রামতনু কয়েকজন বন্ধুর সহিত ডিরোজিওর বাটীতে গিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার জন্মগত সংস্কার শিথিল হয় নাই। কাজেই সেখানে চা-পান করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি সে সময়ে কোনও ক্রমেই ফিরিঙ্গীর বাড়ীতে চা-পান করিতে পারেন নাই। ডিরোজিওর বাড়ীতে হিন্দু কলেজের অধিকাংশ ছাত্র তখন নিষিদ্ধ পানভোজনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

চতুর্থ শ্রেণী হইতে রামতনু যখন তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন, সেই সময় ডিরোজিও শিষ্যবর্গ "Atheniun" নামক একখানি মাসিক পত্রের প্রচার করেন। হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করাই সেই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। বাস্তবিক তখনকার অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছিল যে, ডিরোজিওর শিষ্যগণের অনেকেই হিন্দুধর্ম্মকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতেন। উক্ত মাসিক পত্রিকাখানি দুই মাস বাহির হইবার পর বন্ধ হইয়া যায়। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ উহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেন।

ক্রমে রামতনু প্রথম শ্রেণীতে উঠিলেন। ইদানীং তিনি জ্যেষ্ঠতাত ঠাকুরদাস লাহিড়ীর বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতেছিলেন। পরীক্ষা

দিয়া রামতনু মাসিক ১৬৲ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। বৃত্তি পাইবার পর যুগল কনিষ্ঠ সহোদর, রাধাবিলাস ও কালীচরণকে রামতনু কলিকাতায় আনিয়া লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সে সময় কলিকাতা থাকার ব্যয় বর্ত্তমানের মত অসম্ভবরূপ অধিক ছিল না বটে; কিন্তু তথাপি মাসিক ষোল মুদ্রায় তিনজনের ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া দুর্ঘট ছিল। যাহা হউক, রামতনু নিরুৎসাহ হইলেন না। সেই স্বল্প আয়ের দ্বারাই তিনজনের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। রন্ধনের জন্য পাচক, অথবা অন্যান্য কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত ভৃত্য অবশ্যই তাঁহাদের রাখিবার সামর্থ্য ছিল না। তিন ভ্রাতাই রন্ধনাদি যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বাসনমাজা, ঘরঝাঁট দেওয়া, বাজার করা প্রভৃতি সকল কার্য্যই তাঁহাদিগকে করিতে হইত। দুইবেলা অন্ন পাক করিয়া আহার করিতেন। জলযোগের অর্থ জুটিত না। অধিকাংশকালই নগ্নপদে স্কুলে যাইতে হইত। বর্ষাকালে ছাতি পর্য্যন্ত সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা কেশবচন্দ্র ইদানীং কনিষ্ঠদিগের কোনও প্রকার সাহায্য করিতে পারিতেন না। টাকায় কুলাইত না বলিয়াই পারিতেন না। রামতনু যে কিরূপ কষ্টে ছোট দুইটি ভাইকে লইয়া কলিকাতার খরচ নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা বর্ণনাতীত। একবার তিনি তাঁহার সহৃদয় বন্ধু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট কিছু অর্থ ঋণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ারের নিকটও তাঁহাকে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। হেয়ার সাহেব অতি সংগোপনে তাঁহাকে টাকা দিয়াছিলেন; কিন্তু এ কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। সাহেব যতদিন জীবিত ছিলেন, রামতনু ঘুণাক্ষরেও সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই।

হেয়ার সাহেব বালকদিগের বন্ধু ছিলেন। রামতনুকে তিনি অত্যন্ত স্নেহও করিতেন। একবার রামতনু বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন। হেয়ার সাহেব সংবাদ পাইবামাত্র স্বয়ং আসিয়া তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার চিকিৎসাগুণে অল্পকালমধ্যেই রামতনুবাবু নিরাময় হন।

১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশে নানা ভাবের প্রবাহ বহিয়াছিল। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্মনীতি, শিক্ষাপদ্ধতি সমুদয় বিষয়েরই পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন অথবা বিপ্লব ঘটিয়াছিল। হিন্দুকলেজে ডিরোজিও স্বাধীন চিন্তার ধারা ছাত্রবর্গের হৃদয়ে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন। 'Academic association' নামক একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া ডিরোজিও স্বয়ং তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সভায় বক্তৃতা করিতেন। রামতনু, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্রপ্রমুখ উৎসাহী সভা শ্রোতারূপে সভায় যোগদান করিতেন। সভার অধিবেশনে সামাজিক ও নৈতিক বিষয়সমূহের স্বাধীন সমালোচনা হইত। ডিরোজিওর প্রভাবে বালকবৃন্দের চিত্তে এমনই বিক্ষোভ জন্মিল যে, ক্রমে তাহারা প্রচলিত ধর্ম্মমত, অথবা আচার ব্যবহারের ঘোরতর বিরোধী হইয়া উঠিল। উপবীত ত্যাগ করা, শিখাধারী ব্রাহ্মণদিগকে বিরক্ত করা প্রভৃতি কার্য্যেও যুবকবৃন্দের অসীম উৎসাহ দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমে ডিরোজিওর উপর দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি পড়িল। সকল অনিষ্টের মূল হেতু মনে করিয়া, ডিরোজিওকে শিক্ষকের পদ হইতে অপসৃত করিবার প্রস্তাব হইল। ডিরোজিও স্বয়ং পদত্যাগ করিলেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রামতনু কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হিন্দুকলেজেই শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইলেন। ডিরোজিও পদ ত্যাগ করার পরও যুবকবৃন্দ তাঁহার ভবনে সমবেত হইতে লাগিলেন। রামতনুও তাঁহাদের অন্যতম। বিদ্যাবুদ্ধিতে অথবা প্রতিভায় রামতনু সতীর্থ কৃষ্ণমোহন, রসিককৃষ্ণ অথবা রামগোপালের সমকক্ষ ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য বশতঃ তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

হিন্দুকলেজের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রামতনু মাত্র ত্রিশটাকা বেতন পাইতেন, সেই সামান্য অর্থের দ্বারা তিনি নিজের ও ভ্রাতৃযুগলের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি উপার্জ্জন ক্ষম হইয়াছেন দেখিয়া অনেকেই তাঁহার বাসায় আসিয়া আহার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। উদারহৃদয় রামতনু কাহারও আবেদনে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। যাহাদের বিদ্যার্জ্জন করিবার কোনও সুবিধা ছিল না, রামতনু সাধ্যমত তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন। তাঁহার বাসায় সর্ব্বদাই দুই চারিজন অতিরিক্ত অতিথি থাকিত।

রামতনু সকলকেই আন্তরিক যত্ন করিতেন। তবে রন্ধন ও গৃহকার্য্য বাসার সকলকেই পালাক্রমে করিতে হইত। পাচক অথবা ভৃত্য রাখিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। সহোদরদিগের লেখাপড়ার দিকেও তাঁহার অপরিসীম যত্ন ছিল। একবার তাঁহার কনিষ্ঠ কালীচরণের চক্ষুপীড়া হয়। তিনি তখন মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। পরীক্ষা আসন্ন অথচ চক্ষুর পীড়া; ডাক্তার সর্ব্বদা চক্ষু ঢাকিয়া রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। রামতনু ভ্রাতার সঙ্কট বুঝিয়া প্রত্যহ কলেজ হইতে আসিয়া স্বয়ং পাঠ্য পুস্তক পড়িয়া ভ্রাতাকে শুনাইতেন। কালীচরণ এইরূপে স্নেহময় ভ্রাতার সাহায্যে সে যাত্রা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

হিন্দুকলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষিত ছাত্রবৃন্দ ডিরোজিওর প্রভাবে ইতিপূর্ব্বেই স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছিলেন। এই সময়ে মেকলে সাহেব শিক্ষাবিভাগের সভাপতি ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যের সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রাচ্যদেশের জ্ঞানভাণ্ডার যে যৎসামান্য, য়ুরোপের তুলনায় নগণ্য, এই মত প্রচারিত হইবার পর কৃষ্ণমোহন, রসিকচন্দ্র, রামগোপাল, শিবচন্দ্র, প্যারীচাঁদ, রামতনু প্রভৃতি ইংরাজী শিক্ষিত নবীন সম্প্রদায় মেকলের শিষ্যত্বকে বরণ করিয়া লইলেন। দেশের অপরিমেয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দিকে তাহাদের দৃষ্টি ফিরিল না, রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, ভবভূতি ইহাদের সংবাদ লয় কে? শুধু সেক্ষপীয়ার, মিল্‌টন প্রভৃতি তাঁহাদের উপাস্য হইল। মেকলের চর্ব্বিত চর্ব্বণ তাঁহারা উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব তাহাদিগকে এমনই অভিভূত করিয়াছিল যে, তাঁহারা বেদ-বেদান্তের ধর্ম্ম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া বাইবেল-কেই মাথার মণি করিয়া লইয়াছিলেন। গীতা সেখানে আমল পাইল না। এই সময়ে রামতনু প্রায়ই তদীয় সুহৃদ রামগোপাল ঘোষের ভবনে যাতায়াত করিতেন। সেইখানে বোতল-বাহিনীর প্রভূত প্রভাবও ছিল, তবে রামতনু উহার সদ্ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ সৎগ্রন্থপাঠ ও সাধু আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মহামতি, ভারতবন্ধু হেয়ার ইহলোক হইতে অপসৃত হওয়ায় রামতনু হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার বিপদে হেয়ার তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। তদীয় ভ্রাতাদিগকেও হেয়ার সাহেব শিক্ষা দিয়াছিলেন। পরম বন্ধু হেয়ারের বিয়োগে রামতনু অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন, তবে হৃদয়ের অন্তর নিহিত শোকাবেগ বাহিরে

প্রকাশ পাইত না। চিরদিনই রামতনু সংযতচেতা ছিলেন। উত্তরকালে তাঁহার শরীরে যত দিন সামর্থ্য ছিল, তিনি প্রতিবৎসর ১লা জুন তারিখে হেয়ার সাহেবের সমাধিক্ষেত্রে গিয়া তাঁহার স্মরণার্থ সভা করিতেন।

রামতনু শোকের পর শোকের আঘাত পাইলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া সহোদর রাধাবিলাস মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠসহোদর কেশবচন্দ্রও বহুদিবস ম্যালেরিয়ায় কষ্ট পাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রামতনু আঘাতের পর আঘাত, অসীম ধৈর্য্যবলে সহ্য করিলেন। জ্যেষ্ঠের বিয়োগের পর সংসারের সমুদয় ভার তাঁহারই স্কন্ধে নিপতিত হইল। তিনি তাহাতে পশ্চাৎপদ হইলেন না। ইতিমধ্যে তাঁহার তৃতীয় বার বিবাহ ঘটে। হিন্দুকলেজে পাঠকালে রামতনু বিবাহিত হন; কিন্তু বিবাহের চারি পাঁচ বৎসর পরে সেই পত্নীর দেহান্ত ঘটিলে, রামতনু পাবনাজেলার অন্তর্গত মথুরা নামক গ্রামের কোনও ব্রাহ্মণের কন্যাকে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। এই পত্নী নাকি কখনও শ্বশুর বাড়ী আসেন নাই। রামতনু এই পত্নীর ব্যবহারে বিশেষ সুখী হইতে পারেন নাই। বিবাহের তিন চারি বৎসর পরেই দ্বিতীয়া পত্নীও গত হন। রামতনু, সাঁতরাগাছি গ্রামের কৃষ্ণকিশোর চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যার সহিত পরিণীত হন। এই তৃতীয়া পত্নী হইতেই তাঁহার সন্তানবর্গ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে এক কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। রামতনু এই কলেজে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তথায় গমন করেন। তাঁহার বেতন হইল একশত টাকা। শিক্ষকতা কার্য্যে রামতনুর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি ছাত্রবর্গকে পড়াইবার সময় পৃথিবীর সকল বিষয় বিস্মিত হইতেন। সমগ্র মন দিয়া পাঠ্যবিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেন। পাঠ্য-বিষয়ের প্রসঙ্গে তিনি তৎসংক্রান্ত অবশ্য জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই বালকদিগকে

বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার অধ্যাপনা-প্রণালী দর্শনে কলেজের অধ্যক্ষ অনেক সময় বিস্ময় বিমুগ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তাঁহার পড়াইবার প্রণালীতে ছাত্রবৃন্দের হৃদয়ে জ্ঞানান্বেষণ-স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিত। বিদ্যালয়ের ছুটির পরও তিনি ডিরোজিওর আদর্শে বালকদিগের সহিত নানা প্রকার বিষয়ের আলোচনা করিতেন। কলেজের প্রাঙ্গণে খেলার সময় বালকদিগের সহিত ক্রীড়ায়ও যোগ দিতেন।

এই সময়ে কৃষ্ণনগরে ধর্ম্ম ও সমাজসম্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ নিজেদের অবলম্বিত ধর্ম্মকে বেদান্তধর্ম্ম ও বেদ অভ্রান্ত, ঈশ্বরের বাণী বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। খৃষ্টানের ধর্ম্মের প্রতি তাঁহারা অপ্রীতিকর মন্তব্যও প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ডিরোজিওর শিষ্যবর্গ এই দুই প্রকার কার্য্যকেই সমর্থনের অযোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। রামতনুও তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ব্রাহ্মসমাজের এই ব্যবহার অত্যন্ত অনুদারতার পরিচায়ক মনে করিয়া, উহার সহিত সংস্রব রাখিলেন না। এমন কি "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকা পর্য্যন্ত গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ কাজে ও কথায় এক হইতে পারেন নাই বলিয়া প্রথমতঃ তিনি তাঁহাদের সহিত মিশিতে পারেন নাই। যখন "উন্নতিশীল" ব্রাহ্মসংঘ, সমাজ ও ধর্ম্মের সকল প্রকার বন্ধনমুক্ত হইয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই সময়ে রামতনু সেই দলে মিশিয়া গিয়াছিলেন। রামতনুর মধ্যে কপটতা ছিল না। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যাইতেন। তাঁহার মন্ত্র ছিল, চিন্তা ও কার্য্যে মানুষ স্বাধীন ভাবেই থাকিবে। এই মন্ত্রের সার্থকতা সাধন করিবার জন্য তিনি কার্য্য করিতেন। মনের বিশ্বাসের বিরোধী কোনও কার্য্য তিনি জীবনে কখনও করেন নাই।

বিনয় রামতনুর অলঙ্কারস্বরূপ ছিল। কায়মনোবাক্যে তিনি বিনয়ী ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, বালকের নিকট হইতেও শিক্ষণীয় অনেক বিষয় আছে। বংশমর্য্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। শ্রেষ্ঠবংশে জন্মিলে বংশধরগণের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠত্বের—মহত্ত্বের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে গোহত্যার আন্দোলন এবং বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গ প্রবলতর হওয়ায় রামতনুর পক্ষে কৃষ্ণনগরে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। কয়েকটি বন্ধুর আগমনে রামতনু, কৃষ্ণনগরস্থ কয়েকজন আত্মীয় স্বজনসহ আনন্দবাস নামক স্থানে গিয়া বনভোজন উৎসব করেন। তদুপলক্ষে একটি খাসী মারা হয়; কিন্তু জনরব ক্রমে প্রচার করে যে, উক্ত ব্যাপারে গোহত্যা হইয়াছিল। কৃষ্ণনগরের সমাজ বদ্ধপরিকর হইয়া এই সকল যুবককে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। রামতনু উদ্বিগ্নচিত্তে অবশেষে স্থানান্তরিত হইবার জন্য আবেদন করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি দেড় শত টাকা বেতনে বর্দ্ধমানের প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া তথায় চলিয়া যান।

বর্দ্ধমানে আসিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। উপবীত-ত্যাগ ব্যাপার লইয়া তাঁহার সম্বন্ধে বর্দ্ধমানে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। রামতনু এ সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়াও উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের হিন্দুগণ সমবেত হইয়া তাঁহার ধোপা নাপিত বন্ধ করিল। তাঁহাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিল। দাসদাসী কেহই তাঁহার গৃহে কাজ করিতে সম্মত হইল না। এক বৎসরের পুত্র নবকুমারকে লইয়া তাঁহার পত্নী অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। সংসারের যাবতীয় কার্য্য বালিকা পত্নীকেই সম্পন্ন করিতে হইল। পত্নীর ক্লেশ দেখিয়া তিনি

অস্থির হইয়া উঠিলেন, কিন্তু ধৈর্য্য হারাইলেন না। সংসারের অন্যান্য কার্য্য তিনি স্বয়ং করিতে লাগিলেন। জলতোলা, কাঠ বহিয়া আনা, বাজার করা প্রভৃতি কার্য্য তিনি হাস্যমুখে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। পত্নীর জন্যই তাঁহার মনে কষ্ট বেশী হইত, কারণ পল্লীর রমণীগণ তাঁহার প্রতি অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করিতেন।

বর্দ্ধমানে একবৎসর কাল শিক্ষকতার পর তিনি বালি উত্তরপাড়ায় ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে বদ্‌লি হইয়া আসিলেন। এখানে তিনি প্রায় পাঁচ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা লীলাবতী ও ইন্দুমতী এইখানেই জন্মগ্রহণ করে। সামাজিক নির্য্যাতনের ক্লেশ উত্তরপাড়ায় অবস্থান কালে অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল। কারণ তাঁহার কলিকাতাস্থিত বহু বন্ধু তাঁহাকে নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন। অশেষ-গুণালঙ্কৃত, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ ভাবেই তাঁহার সহায়তা করিতেন। পাচক, ভৃত্য প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতা হইতে তিনি রামতনুর সাহায্যার্থ পাঠাইতেন। তাহারা পলায়ন করিলে আবার সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নানা প্রকার তৈজসপত্র, গৃহীর ব্যবহারের উপযোগী দ্রব্যসম্ভার নৌকাযোগে উত্তরপাড়াতে পাঠাইয়া দিতেন। বন্ধুবর্গের নিকট হইতে এবম্প্রকার সাহায্য পাইয়া লাহিড়ী মহাশয় অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বিগ্নচিত্তে উত্তরপাড়ায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। উপবীত পরিত্যাগের পর তিনি শিক্ষিত বন্ধুবর্গের অনেকের দ্বারা পুনরায় উহা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু রামতনু তাঁহাদের কাহারও বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া উপবীত গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষার ফলে তখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, সামাজিক কোনও প্রকার

শাসন অথবা নির্য্যাতন তাঁহাকে সে সংকল্প হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। লাহিড়ী মহাশয় উত্তরপাড়া স্কুলে কায়মনোবাক্যে শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষাদান প্রণালীর গুণে বালকগণ অধীত বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করিত। সমগ্র পুস্তক হয় ত তিনি পড়াইয়া উঠিতে পারিতেন না; কিন্তু যতদূর পড়াইতেন, তাহাতে ছাত্রগণ অপর্য্যাপ্ত জ্ঞানলাভ করিত এবং দক্ষতার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত।

রামতনুর চরিত্রের একটি প্রধান গুণ এই ছিল যে, তিনি ছাত্রবর্গকে শিক্ষা দিবার সময় কোনও বিষয়ে নিজের অজ্ঞতাকে গোপন করিতেন না। তিনি নিজে যে বিষয় জানিতেন না, অসঙ্কোচে বালকদিগের নিকট তাহা স্বীকার করিতেন, এবং পরে জানিয়া শুনিয়া তাহাদিগকে সে সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। ছাত্রগণের সহিত বঞ্চনা করা অথবা যে কোনও প্রকারে সেই বিষয়টি বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা, তিনি কখনও করিতেন না। প্রবঞ্চনা করাকে তিনি অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে করিতেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের পর তিনি বারাসত বিদ্যালয়ে বদলি হইয়া যান। সিপাহী-বিদ্রোহের ঘোরতর দুর্দ্দিনে রামতনু বারাসতেই থাকিতেন। তৎপরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় কৃষ্ণনগর কলেজে প্রেরিত হন। অল্পকাল সেখানে অবস্থানের পর কলিকাতার সন্নিহিত রসাপাগলাস্থিত (বর্ত্তমান টালীগঞ্জ) ইংরাজী বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। এখানে অবস্থান কালে কলিকাতাস্থিত বন্ধুবর্গের সহিত তাঁহার সর্ব্বদাই দেখা সাক্ষাৎ হইত। রামগোপাল ঘোষের বাটীতে অবসরকাল তিনি প্রায়ই যাপন করিতেন। সেখানে সুরাপান প্রবলভাবেই চলিত; তবে রামতনুর জন্য অন্যান্য বন্ধুকে অনেকটা সংযত হইয়া চলিতে হইত। একবার রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের কোনও

আত্মীয় যুবককে সুরাপান নিবন্ধন অভদ্র আচরণে লিপ্ত দেখিয়া রামতনুর মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। এই ঘটনার পর দীর্ঘকাল তিনি সুরাপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তৎপরে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ায় চিকিৎসক ও বন্ধুবর্গের পরামর্শে পুনরায় তিনি সুরা ব্যবহার করিতেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রামতনু বরিশাল জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া তথায় গমন করেন। বেশী দিন তিনি সেখানে ছিলেন না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি পুনরায় কৃষ্ণনগর কলেজে ফিরিয়া আসেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তথায় অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার পর তিনি শিক্ষকতা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে লাহিড়ী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী অন্নদায়িনীর বিবাহ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে নিষ্পন্ন হয়। রামতনু স্বয়ং কন্যাকর্ত্তা হইয়া বিবাহ দেন। তদবধি ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হয়।

ভগবানের নাম যখন তখন বৃথা উচ্চারণের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। যখন তখন, যেমন তেমন অবস্থাতে ভগবানের গুণকীর্ত্তন শুনিতে তিনি নারাজ ছিলেন। একবার ব্রহ্মসঙ্গীতে অভিজ্ঞ কোনও গায়ককে তাঁহার বাড়ীতে কোনও বন্ধু লইয়া আসিয়াছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় তখন চা-পান করিতেছিলেন। বন্ধুটি অনুরোধ করিবামাত্র গায়ক তখনই সুর ভাঁজিতে লাগিলেন। রামতনু কিন্তু এই ব্যাপারে অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। গায়ককে স্পষ্টই বলিলেন যে, তিনি এখন ঠিক ভগবানের নাম গান শুনিবার অবস্থাতে নাই। একটু বিলম্ব করিতে হইবে। তাঁহার আদেশে চায়ের সরঞ্জামগুলি অপসৃত হইলে তিনি গলবস্ত্র হইয়া প্রস্তুত হইলেন। ঈশ্বরের গুণগানের সময়, অর্চ্চনার কালে তিনি কায়মনোবাক্যে সে জন্য প্রস্তুত হইতেন।

রামতনু কখনও অপরের হৃদয়ে ব্যথা দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। যে ব্যক্তির সম্বন্ধে কোনও অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইত, কখনও তাহার অসাক্ষাতে তাহা বলিতেন না। তাহার সমক্ষেই যাহা কিছু বক্তব্য থাকিত বলিতেন। তখন অপ্রিয় সত্য কথা বলার ফলাফল তিনি বিবেচনা করিতেন না।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মদলে যখন স্ত্রী-স্বাধীনতার তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, সে সময়ে রামতনু সবিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রকৃতই তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, "না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না!" স্ত্রী-স্বাধীনতা মতাবলম্বিগণের তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। টাউনহলে কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়া প্রকাশ্য স্থলে তাহাদিগকে বসাইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। "বঙ্গ-মহিলা" নামক বিদ্যালয়ে তিনি তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা ইন্দুমতীকে পড়িতে দিয়াছিলেন। নারীজাতির প্রতি লাহিড়ী মহাশয়ের শ্রদ্ধা প্রগাঢ় ছিল। শিক্ষা-বিস্তারের ফলে যাহাতে ভারতীয় নারীজাতির উৎকর্ষ ঘটে, সে দিকে তাঁহার প্রবল আগ্রহও দৃষ্ট হইত। কলিকাতায় আসিয়া তিনি যখনই যে পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন, তাঁহাকে পাইয়া সেই বাটীর রমণী-বৃন্দের আনন্দের সীমা থাকিত না। দ্বি-প্রহরের, আহার শেষে তিনি পরিবারস্থ নারীগণকে একস্থলে ডাকাইয়া তাঁহাদের সহিত নানা প্রকার সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা করিতেন। এজন্য সকলেই তাঁহার সঙ্গ প্রার্থনীয় মনে করিত।

রামতনুকে আত্মীয়-বিয়োগের যন্ত্রণা বহুবার সহ্য করিতে হইয়াছিল। সহোদরগণ একে একে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। পিতা-মাতাও চলিয়া গিয়াছিলেন। শেষে সন্তানবর্গের মধ্যেও ভাঙ্গন

ধরিয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নবকুমার মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নকালে যক্ষ্মারোগে পীড়িত হন। তাঁহার সেবা করিয়া দ্বিতীয় কন্যা ইন্দুমতীও উক্তরোগে আক্রান্ত হন। লাহিড়ী মহাশয় চিকিৎসার ত্রুটী করেন নাই; কিন্তু ভবিতব্যতা অলঙ্ঘ্যনীয়। কিছু দিন পরে পরম স্নেহাস্পদা কন্যা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। রামতনু এত বড় শোকের আঘাত কিরূপ ধীরতার সহিত সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা অনুকরণের যোগ্য। বাহিরে তাঁহার চক্ষে এক বিন্দু শোকাশ্রু কেহ দেখে নাই বা একটা হা-হুতাশ করিতে কেহ শুনে নাই। পার্শ্বের কক্ষে জ্যেষ্ঠপুত্র নবকুমার রোগশয্যায় রহিয়াছে, পাছে শোক করিলে তাহার প্রাণে অধিকতর বিষাদের ছায়া পড়ে, তাহার সেবায় ত্রুটী ঘটে, এজন্য পত্নীকে আত্ম-সংযম করিতে বলিয়া স্বয়ং অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত কন্যাবিয়োগের তীব্র যন্ত্রণাকে জয় করিয়াছিলেন।

ভগবানের উপর রামতনুর কি অগাধ বিশ্বাসই ছিল! তাঁহার সকল কার্য্যই মঙ্গলজনক বলিয়া লাহিড়ী মহাশয় দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করিতেন। সেই জন্য কিছুকাল পরেই যখন নবকুমারও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন কি অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা ভরেই তিনি সে নিদারুণ আঘাতকে সহ্য করিয়াছিলেন। যে দিন নবকুমারের মৃত্যু হয়, সেই দিন লাহিড়ী মহাশয়ের ভবনে সাপ্তাহিক ধর্ম্মালোচনা সভার অধিবেশন ছিল। যুবকবৃন্দের কেহই নবকুমারের মৃত্যুর কথা অবগত ছিলেন না। পার্শ্বস্থ কক্ষে তখনও শব রহিয়াছে, সৎকারের আয়োজন তখনও হয় নাই। নির্দ্দিষ্ট কক্ষে যুবকেরা প্রবেশ করিতে যাইতেছেন দেখিয়া, বৃদ্ধ রামতনু তাহাদিগকে আসিয়া প্রশান্ত ভাবে বলিলেন, "বড় ভুল হয়ে গেছে। তোমাদের সংবাদ দেওয়া হয় নাই, আজ ত এখানে সভার অধিবেশন

হইবে না। নবকুমারের মৃত্যু হইয়াছে। তোমাদের দেখিলে কষ্ট হইবে।" উপযুক্ত পুত্র-কন্যার বিয়োগের পর কৃষ্ণনগরে বাস করা অত্যন্ত কঠিন হইল। শোক জয় করিলেও তাঁহার জীবনের সকল সাধ আহ্লাদ লুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং লাহিড়ী মহাশয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের সেখানকার বসবাস তুলিয়া পরিজনবর্গ সহ কলিকাতায় আসিলেন। মাসে মাত্র ৭৫৲ টাকা পেন্সনের আয়ে কলিকাতায় খরচ নির্ব্বাহ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার পুত্রাধিক প্রিয়শিষ্য কালীচরণ ঘোষ তাঁহাব বাসের নিমিত্ত একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া দিয়াছিলেন, ভাড়ার টাকা তিনি নিজেই সরবরাহ করিতেন, অন্যান্য অনেক বিষয়েও তিনি তাঁহাকে অনেক প্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন। করুণার অবতার বিদ্যাসাগব মহাশয়ও লাহিড়ী মহাশয়কে অনেক বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। তদীয় মধ্যমপুত্র শরৎকুমার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে মেট্রপলিটান কলেজের লাইব্রেরীয়ান্ পদে নিযুক্ত করিয়া দেন।

রামতনু বাক্যে ও আচরণে সর্ব্বদাই সত্য পথে চলিতেন। মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়াকে তিনি গুরুতর অপরাধ মনে করিতেন। তিনি যখন উত্তর-পাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সেই সময় একদিন তাঁহার পরিচারিকা রোরুদ্যমান নবকুমারকে সান্ত্বনা করিবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছিল, "খোকা তুমি কেঁদ না,তোমায় মিঠাই এনে দেব!" লাহিড়ী মহাশয় সে কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ পরিচারিকার দ্বারা মিঠাই আনাইয়া পুত্রকে দিয়াছিলেন।

আর একবার কৃষ্ণনগরে থাকিবার সময় তাঁহার দেরাজ হইতে একটি জিনিস অপহৃত হয়। জনৈক ভৃত্যের প্রতি তাঁহার সন্দেহ হয়। কিয়দ্দিবস পরে অপহৃত দ্রব্যটি পাওয়া গেলে, লাহিড়ী মহাশয় উক্ত ভৃত্যের নিকট

নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া বলেন যে, তিনি তাহার উপর সন্দেহ করিয়াছিলেন। এই অন্যায় সন্দেহের জন্য সে যেন তাঁহাকে মার্জ্জনা করে। এরূপ সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত রামতনুর জীবনে একাধিকবার দেখা যায়। এরূপ সত্যবাদিতা মানবজীবনের আদর্শ।

মধ্যম পুত্র শরৎকুমার পুস্তকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বৈষয়িক বিষয়ে ক্রমোন্নতি করিতেছিলেন বটে; কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের পরিবারে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল, তাহাতে পরিবারে সুখ-শান্তি ছিল না। কনিষ্ঠ পুত্র বিনয়কুমার ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া শেষে ইহলোক হইতে অপসৃত হইল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পত্নী গঙ্গামণি দেবীও স্বর্গারোহণ করিলেন। শরৎকুমার ইতিপূর্ব্বেই বিবাহ করিয়াছিলেন। হ্যারিসন রোডে অর্জ্জিত অর্থের দ্বারা বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া বৃদ্ধ রামতনুকে তথায় যথাসম্ভব সুখে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন. কিন্তু রামতনু তখন পরলোক যাত্রার জন্য উৎকণ্ঠিত—মন সর্ব্বদাই ঈশ্বরাভিমুখী।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে একদিন তিনি খাট হইতে পড়িয়া গিয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উত্থানশক্তি হীন হন। ক্রমে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন তাঁহার স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়। তারপর সাধু রামতনু ১৩ই আগষ্ট তারিখে অনন্ত পথের যাত্রী হইলেন।

রামতনু কোনও সাহিত্যিক নহেন; ধর্ম্মোপদেষ্টার আসনও তিনি কোনদিন অধিকার করেন নাই। মহাকর্ম্মী পুরুষ বলিয়াও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। চিরজীবন তিনি মৌনভাবে সকল প্রকার আন্দোলনের পশ্চাতে থাকিয়া নীরবে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। রাজনীতিক, সামাজিক অথবা ধর্ম্মসংক্রান্ত কোনও বিষয়ে তিনি কোনও দিন নেতার আসন গ্রহণ করেন নাই। অথচ তিনি তাঁহার চরিত্রের

মাধুর্য্য, মহত্ত্ব এবং অমায়িক ব্যবহারের জন্ত আদর্শচরিত্র মহাত্মার আসন অনায়াসে অধিকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাব চরিত্রের দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা ও ভগবানে বিশ্বাস ও প্রেম অতুলনীয়। রামতনুর মত মহৎ ও সাধুচরিত্র ব্যক্তি সকল দেশে, সকল সময়ে, ঘরে ঘরে পাওয়া যায় না; অনেক সাধনায় এমন রত্ন বাঙ্গালা দেশের উর্ব্বরা ভূমি প্রসব করিয়াছিল। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহ" এই মহাবাণীব মূল্য রামতনু না বুঝিলেও সেজন্ত তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। বাঙ্গালার আকাশ তখন ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, ঘোরতর দুর্য্যোগে বাঙ্গালার নগর ও পল্লী তখন মৃত্যুর পথে, ধ্বংসের পথে চলিতেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকসম্পাতে বাঙ্গালীর চক্ষু তখন ঝলসিয়া গিয়াছে, দেশের মহামূল্য রত্নসম্ভার আবর্জ্জনার স্তূপে অন্তর্হিত। কাজেই সে সময়ে প্রতীচ্য শিক্ষাব মোহে মানুষমাত্রেরই কোন কোন বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদ ঘটা অসম্ভব ছিল না; কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তলে তিনি যে সততা ও সত্যনিষ্ঠাকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যাহাকে ধ্রুব বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহাকে জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। রামতনুর জীবন হইতে ইহাই শিক্ষনীয়, গ্রহণীয়। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতা মানবের আদর্শ। যুগসন্ধিক্ষণে রামতনুর মত পুত্র পাইয়া বঙ্গজননী কৃতার্থ হইয়াছিলেন, বাঙ্গালীও ধন্য হইয়াছে। তাৎকালিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার চরিত্রের অসাধারণ প্রভাব ছিল। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার "সুরধুনী" কাব্যে রামতনু সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"এক দিন তাঁর সনে করিলে যাপন।
দশ দিন থাকে ভাল দুর্ব্বিনীত মন॥"

রাজা রাধাকান্ত দেব।

ইংরাজী ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ ১১ই মার্চ্চ, ১৭০৫ শকের ১লা চৈত্র তারিখে শোভাবাজার রাজপ্রাসাদে রাধাকান্ত দেব ভূমিষ্ঠ হন। ইনি মহারাজ নবকৃষ্ণের পৌত্র, তদীয় পোষ্যপুত্র রাজা গোপীমোহনের একমাত্র পুত্র। রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াও বাল্যকাল হইতেই রাধাকান্ত দেবের অধ্যয়নানুরাগ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। শৈশবকালে বাড়ীতে পণ্ডিত আসিয়া তাঁহাকে পড়াইয়া যাইতেন। পণ্ডিতের নিকট হইতেই তিনি সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। তদ্ব্যতীত আরবী ও পারস্য ভাষাতেও তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল।

রাধাকান্ত কলিকাতায় মিঃ কামিঙ্গের ইংলিশ একাডেমিতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। অতি অল্প বয়সেই, মেধাবলে তিনি এতগুলি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সংস্কৃত শিক্ষা যাহাতে দেশবাসীর মধ্যে পুনরায় প্রচলিত হয় এবং ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া দেশবাসী যাহাতে জ্ঞানলাভ করিতে পারে, এই উভয় বিষয়ে রাধাকান্ত দেবের প্রাণপণ চেষ্টা ছিল। আজীবন তিনি সেজন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন।

বাল্যকাল হইতেই রাধাকান্ত দেবের হৃদয় স্বধর্ম্মে অনুরক্ত ছিল। বৈদেশিক নানাভাষা শিক্ষা করিয়া হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার শ্রদ্ধা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধানিবন্ধন, উক্ত ধর্ম্মের

আলোচনা করিতে তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিত। তিনি সকল বিষয়েই তদানীন্তন হিন্দুসমাজের অগ্রণী ছিলেন।

রাধাকান্ত স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। অজ্ঞানতা-নিবন্ধন দেশের মাতৃকুলের আধ্যাত্মিক অনুন্নত অবস্থা দেখিয়া শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা তাঁহাদের জ্ঞানের বিকাশপথ বিঘ্নমুক্ত করিবার জন্য তিনি চেষ্টাও করিয়াছিলেন। তবে শিক্ষাটা বাহিরে না আনিয়া অন্তঃপুর-সীমায় আবদ্ধ রাখিবার জন্য তিনি মত প্রচার করিয়াছিলেন।

মহামতি ডেভিড হেয়ার সাহেব বাঙ্গালা দেশে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যখন চেষ্টা করিতেছিলেন। রাধাকান্ত দেব সে সময়ে তাঁহার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহাকে উৎসাহ দানেও কৃপণতা করেন নাই।

কলিকাতায় যখন হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সময় রাধাকান্ত যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তৎপরে কিছুকাল তিনি উক্ত কলেজের অন্যতম পরিচালকস্বরূপ কার্য্যও করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজেও রাধাকান্ত দেব দীর্ঘকাল সম্পাদকরূপে বিরাজিত ছিলেন।

মহারাজ নবকৃষ্ণ গোষ্ঠীপতিবংশীয় গোপীকান্ত সিংহ চৌধুরীর কন্যার সহিত স্বীয় পৌত্র রাধাকান্তের বিবাহ দেন। এই বিবাহের ফলে রাধাকান্ত দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ সমাজের গোষ্ঠীপতির সম্মানজনক আসন লাভ করেন।

"স্কুলবুক সোসাইটি" প্রতিষ্ঠিত হইলে রাধাকান্ত, মহামতি হেয়ার সাহেবের সহযোগিতায় সম্পাদকের কার্য্য করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় নীতিকথা ও ইংরাজীর অনুকরণে বানান বহির প্রচার করেন। এই গ্রন্থ প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ উপযোগী ছিল।

সাধারণকে সহজে শিক্ষা দিবার উপযোগী করিয়াই রাধাকান্ত এই গ্রন্থের প্রণয়ন করেন।

দেশের লোক যাহাতে শিক্ষিত হইয়া উঠে, সহজে যাহাতে সকলে জ্ঞানলাভ করিতে পারে, এ বিষয়ে রাধাকান্তের যেরূপ উৎসাহ, মনোযোগ ও প্রবল আগ্রহ ছিল, রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার তদ্রূপ অনুরাগ দৃষ্ট হইত। রাজনীতিঘটিত দেশের মঙ্গলজনক অনুষ্ঠানে তিনি কখনই আপনাকে নির্লিপ্ত রাখিতেন না। রাজনীতিক সংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠানে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দিতেন, প্রত্যেক সমিতির অধিবেশনে অধ্যক্ষতা করিতেন। মনের বল তাঁহার যথেষ্ট ছিল, আত্মসম্মানজ্ঞান, দেশাত্মবোধ তাঁহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই দেখা যাইত। স্বাধীনমত ও সৎসাহস প্রকাশ করিতে তিনি কোনও দিনই কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রাধাকান্ত কলিকাতায় অবৈতনিক হাকিম, (অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট) ও জষ্টিস্ অব্ দি পিসের কার্য্য করিয়াছিলেন। সে সময়ে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার যোগ্যতা সহকারে কার্য্য-সম্পাদনের জন্য তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা কীর্ত্তনও করিয়াছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এ্যাসোসিয়েসনের" সভাপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন।

রাধাকান্তের জীবনের শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি তাঁহার সঙ্কলিত "শব্দকল্পদ্রুম্।" এই সুবৃহৎ সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করিয়াই তিনি বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। সমগ্র শিক্ষিত সমাজ তাঁহার প্রণীত এই উপাদেয় অভিধান পাইয়া পরম উপকৃত হইয়াছেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত অমর গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সমাপ্ত হয়। দীর্ঘকাল অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া

রাধাকান্ত সাহিত্য-সমাজে যে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, কাল তাহা কখনও কোনও ক্রমেই মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। রাধাকান্ত এই অভিধান গ্রন্থ মুদ্রিত করিবার জন্ত একটি স্বতন্ত্র ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেন, স্বতন্ত্র শ্রেণীর অক্ষর প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই শ্রেণীর 'হরপ' "রাজার টাইপ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

৪৬ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রাধাকান্ত এই বিরাট অভিধান গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে ভারতবর্ষ, য়ুরোপ ও আমেরিকার সাহিত্যানুরাগী সুধীবর্গকে এই মহামূল্য গ্রন্থ উপহার প্রদান করেন। এই সংস্কৃত মহাকোষ বিলাতে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। য়ুরোপের নানা সভাসমিতি হইতে রাধাকান্ত বিশেষ সম্মান পাইয়াছিলেন। ডেন্‌মার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডারিক তাঁহাকে কারুকার্য্যখচিত, একটি সুদৃশ্য হারযুক্ত স্বর্ণপদক উপহার পাঠাইয়াছিলেন। চেনের প্রত্যেক আঁকড়িতে F VII ক্ষোদিত ছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়াও পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটি স্বর্ণপদক প্রদান করেন। পদকের এক পৃষ্ঠে মহারাণীর উত্তমাঙ্গ ও অপর পৃষ্ঠে রাজা রাধাকান্ত দেবের নাম ক্ষোদিত ছিল। মহারাণীর নির্দ্দেশক্রমে তদানীন্তন ভারতসচিব স্যার চার্লস্ উড্‌ও পদকের সহিত রাধাকান্তকে সম্মানসূচক একখানি পত্রও লিখিয়াছিলেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে রাধাকান্ত দেব সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে "রাজাবাহাদুর" উপাধি এবং খেলাত পাইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট স্বাধীন-চেতা দেশহিতৈষী, পরম পণ্ডিত রাধাকান্তকে প্রভূত সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতেন। সেজন্ত অবকাশ পাইলেই তাঁহার প্রতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সম্মান প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে "সিপাহী-বিদ্রোহের" অবসানে মহারাণী ভিক্টোরিয়া

ঘোষণা লিপির দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যখন ভারতবর্ষের শাসনভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করেন, সেই সময় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর শোভাবাজার রাজপ্রাসাদে একটি সম্মেলনী আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে রাজ-প্রতিনিধি, ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীরা ও দেশের সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। এরূপ বিরাট অনুষ্ঠান বাঙ্গালায় পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখে নাই। শুনা যায়, সেরূপ বৃহৎ ব্যাপার পরেও কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রাজাবাহাদুরের প্রযত্নে অনুরূপ আর একটি সম্মেলনী আহূত হয়। সিপাহী-বিদ্রোহ দমন উপলক্ষে যে শান্তি সংস্থাপিত হয়, তাহার স্মরণার্থ তিনি উক্ত সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সর্ব্বজাতীয় অধিবাসিগণ মিলিত হইয়া রাধাকান্ত দেবের পাণ্ডিত্য-গৌরবের প্রতি সম্মান প্রকাশার্থ তাঁহাকে এক খানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। সংগৃহীত অর্থ দ্বারা তাঁহারা রাজা বাহাদুরের একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া উহা "এসিয়াটিক্ সোসাইটির" একটি ঘরে রক্ষা করেন।

হিন্দুধর্ম্মে, হিন্দুশাস্ত্রে এবং প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানে রাজাবাহাদুরের অটল নিষ্ঠা ও অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। যে অনুষ্ঠানকে তিনি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন, আচারধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তিনি কখনই তাহার সমর্থন করিতেন না। যে নূতন বিধিব্যবস্থা বা প্রথা হিন্দুসমাজের পক্ষে অহিতকর বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিত, সে প্রথার উচ্ছেদ সাধন অথবা উহার প্রবর্ত্তন পথে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বপ্রযত্নে বাধা জন্মাইতেন। আইনের দ্বারা, বিধর্ম্মী রাজার দ্বারা সমাজ-সংস্কারের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। যাঁহারা এবম্প্রকার ব্যবস্থার দ্বারা সংস্কারের প্রার্থী রাধাকান্ত তাঁহাদিগকে সমাজহিতৈষী

বলিয়া মনে করিতেন না। এই জন্যই সহমরণ-প্রথার উচ্ছেদ ও বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তনে তিনি ঘোরতর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে ঐ দুইটি আইনের প্রবর্ত্তনে বাধা দিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য প্রথার প্রবল প্রভাবের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর প্রাচীনের সহিত নবীনের সামঞ্জস্য সাধন অসম্ভব দেখিয়া ও অবসন্ন হইয়া সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া—১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্ম-সাধনোদ্দেশে কলিকাতা নগরী ত্যাগ করিয়া রাধাকান্ত বৃন্দাবনে গমন করেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উচ্চতর সম্মানে বিভূষিত করেন। তাঁহার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কোনও বাঙ্গালীকে কে সি এস আই উপাধি দান করেন নাই। শুনা যায়, এই উপাধির ভূষণ (Star) লইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অনুরোধ করেন, কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া উহা গ্রহণ করিতে রাধাকান্ত দেব অসম্মত হওয়ায় তদানীন্তন বড়লাট সাহেব স্যার জন লরেন্স আগ্রা নগরে দরবার করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

রাধাকান্ত দেব অনুসন্ধানে জানিয়াছিলেন, আগ্রা বা অগ্রবন বৃন্দাবনেরই অন্তর্গত। পণ্ডিতগণও তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন, আগ্রায় গমন করিলে বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে হইবে না। সুতরাং তথায় যাওয়া দোষাবহ নহে। তিনি যে সংকল্প করিয়াছিলেন, "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং নগচ্ছামি" সে সংকল্প আগ্রায় গমন করিলে টুটিয়া যাইবার আশঙ্কা নাই। কাজেই রাজা রাধাকান্ত দেব ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নবেম্বর তারিখে আগ্রার দরবারে গমন করেন। দরবারমণ্ডপে প্রবেশ করিলে, লাটসাহেব এবং সমবেত রাজন্যবৃন্দ রাজা রাধাকান্ত দেবকে আসন ত্যাগ-পূর্ব্বক সাদরে অভ্যর্থনা করেন।

রাধাকান্ত দেব সে সময়ে হিন্দুসমাজের অগ্রণী ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের

কোনও অনুষ্ঠানে কেহ বাধা দিতে গেলে, তিনি তাঁহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। বৃন্দাবনে ময়ূরের প্রাচুর্য্য-নিবন্ধন ইংরাজ শিকারীরা প্রায়ই ময়ূর শিকার করিতে বৃন্দাবনে যাইতেন। রাধাকান্ত দেব মধুর বৃন্দাবনে জীবহত্যা দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিতচিত্ত হন। তাঁহারই সমধিক চেষ্টায় বৃন্দাবনে কোনও প্রকার পশুপক্ষী শিকার বন্ধ হইয়া যায়। রাজা রাধাকান্ত দেবের চরিত্র-মাধুর্য্য, পাণ্ডিত্য ও স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা ও প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া কি ইংরাজ, কি দেশীয় সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি অর্ঘ্য দিত। তাঁহার মত অত্যুন্নত হৃদয়,নিষ্কলঙ্ক চরিত্র,মহৎ হৃদয় পুরুষ সে সময় বাঙ্গালা দেশে অতি অল্পসংখ্যকই বিদ্যমান ছিলেন।

রাধাকান্ত দেব পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুকাল আসন্ন। দেহাবসানের তিন দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি সর্দ্দিতে কষ্ট পাইতে-ছিলেন। মৃত্যুর দিবস প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধ পান করিয়া তিনি প্রিয় ভৃত্যকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুকাল সমাগত। কিরূপে তাঁহার সৎকার করিতে হইবে, পুরোহিত মহাশয়কে তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, সুতরাং মৃত্যুর পর তুলসী ও চন্দন কাষ্ঠে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত করিবার ব্যবস্থা তিনি নিজেই করিয়াছিলেন। ভৃত্যকে সেই সকল কথা পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি আত্মীয়স্বজনগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিম্নতলে অবতরণ করেন। তৎপরে তুলসীতলায় শয়ন করিয়া মস্তকের দিকে শালগ্রাম শিলা রাখাইয়া অন্তিমশয্যা গ্রহণ করেন। দুইঘণ্টা ধরিয়া মালা জপ করিবার পর রাজা রাধাকান্ত দেব অনন্ত পথে যাত্রা করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল ধর্ম্মাত্মা রাজার প্রাণবিয়োগ ঘটে। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় চুরাশী বৎসর হইয়াছিল।

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বাঙ্গালার অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, হিন্দুর গৌরবস্তম্ভ ছিলেন। তাঁহাকে হারাইয়া বাঙ্গালীজাতির যে ক্ষতি হইয়াছিল, সে ক্ষতি, সে অভাব, আজিও কাহারও দ্বারা দূরীভূত হয় নাই। যেমনটি যায় তেমনটি আর হয় না। ইহা বাঙ্গালীর একটা মহা দুঃখ। বাঙ্গালার অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব আদর্শস্বরূপ ছিলেন। সমাজ,ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনে তিনি যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুকরণীয়। নীচতা স্বার্থপরতা কোনও দিন তাহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকে মলিন করিতে পারে নাই। তাঁহার অমর কীর্ত্তি "শব্দকল্পদ্রুম" চিরদিন বাঙ্গালী জাতির মহাগৌরবের দ্যোতক হইয়া থাকিবে। যতদিন পৃথিবীতে সাহিত্যের আদর থাকিবে, সভ্যতার গৌরব থাকিবে, ততকাল বিশ্ববাসী তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থের মহিমা কীর্ত্তন করিবে ও ঐতিহাসিক স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠে, আভিজাত্য সম্প্রদায়ের এই কীর্ত্তিমান পুরুষের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৭৬১ শকাব্দা, ১৩ই আষাঢ়, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় চব্বিশ পরগণা জেলায়, নৈহাটীর সন্নিহিত কাঁটালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র পিতার তৃতীয় সন্তান। তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ, মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র। চারি ভ্রাতাই ডেপুটী হইয়াছিলেন। সাহিত্যরচনায় সকলেরই অনুরাগ ছিল।

পিতা যাদবচন্দ্র যখন মেদিনীপুরের ডেপুটী ছিলেন, সেই সময় পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমকালে বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। ইহার অত্যল্পকাল পরেই মেদিনীপুর হইতে জন্মভূমি কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র জননী সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গ্রাম্য পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইবার পরই বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় আত্মীয়স্বজনগণ পাইয়াছিলেন। শুনা যায়, এক দিনেই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পাঠশালায় কয়েক মাস অধ্যয়নের পরই তিনি পুনরায় মেদিনীপুরে পিতার নিকট গমন করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি তত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তার পর একাদিক্রমে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মেদিনীপুরেই পাঠাভ্যাস করিয়াছিলেন। পিতা যাদবচন্দ্র কার্য্যোপলক্ষে মেদিনীপুর হইতে চব্বিশ পরগণা, পুনরায় তথা হইতে

বৰ্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে বদলী হওয়ায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে কাঁটালপাড়ায় রাখিয়া দেন। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যহ কাঁটালপাড়া হইতে যাতায়াত করিতেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে একাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বিবাহ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের পত্নীর বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র।

সে সময়ে ইংরাজী বিস্তালয়সমূহে "Junior Senior Scholarship" পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ৯ বৎসর বয়সে হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হন। বালক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশ দেখিয়া বিস্তালয়ের শিক্ষকবর্গ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এমনই প্রখরা ছিল যে, যাহা একবার পাঠ করিতেন বা শুনিতেন, তাহা কদাপি বিস্মৃত হইতেন না। সাহিত্য, ইতিহাস, গণিতশাস্ত্র সকল বিভাগেই তাঁহার কৃতিত্বের বিকাশ ঘটিতেছিল। বিস্তালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়াই তিনি নিরস্ত থাকিতেন না; বৎসরের অধিকাংশ ভাগ তিনি কলেজের পুস্তকাগারে বসিয়া বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন। বিস্তালয়ের নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থনিচয়ের সহিত সে সময় কোন সম্বন্ধই থাকিত না। পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইলে সেই সময় পাঠ্য পুস্তকের খোঁজ পড়িত; কিন্তু পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে সকলেই দেখিতে পাইত, বঙ্কিমচন্দ্র সতীর্থগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন।

খেলা-ধুলা বালক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রীতিপ্রদ ছিল না। তিনি বিস্তালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া অন্যান্য বালকের মত খেলা-ধুলা করিতেন না। শুনা যায়, মাঝে মাঝে সহপাঠীদিগের সহিত শুধু তাসক্রীড়া করিতেন। অবকাশকাল তাঁহার অধ্যয়নেই অতিবাহিত হইত। পুস্তকপাঠেই

তাঁহার সমধিক আনন্দ, তৃপ্তি ও অনুরাগ ছিল। ব্যায়ামে বিগতস্পৃহ বঙ্কিমচন্দ্র অপরাহ্লকালে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেন। ইহা তাঁহার একটি সখ ছিল। মাঝে মাঝে নদীর তীরে, বা খালের ধারেও পদচারণা করিতেন। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্যরাশি বালককাল হইতেই সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার উন্মেষণে সাহায্য করিয়াছিল।

শারীরিক ব্যায়ামে অনুরাগ না থাকায় বঙ্কিমচন্দ্রের দেহ বাল্য, কৈশোর অথবা প্রথম-যৌবনে পরিপুষ্ট হয় নাই। তাঁহার দৈহিক শক্তি পর্য্যাপ্ত না থাকিলেও সাহস এবং মানসিক শক্তি অপর্য্যাপ্তরূপে ছিল। জীবনে অনেকবার তিনি সাহস ও তেজস্বিতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

বাল্যকাল হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালের কবিতানিচয় "প্রভাকর" নামক সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইত। বাঙ্গালার শেষ খাঁটি বাঙ্গালী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনার কোন কোন স্থলে মহাকবি কালিদাসের প্রভাব পরিদৃষ্ট হইলেও ভাবসম্পদে সেগুলি দরিদ্র নহে। অনুকরণস্পৃহা বাল্যকাল হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের নিকট কাব্য রচনা করিতে শিখিয়াও তিনি ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিয়া স্বতন্ত্রভাবে কবিতা রচনা করিতেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিবার পর, সেখানকার পরীক্ষা দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন।

Senior Scholarship পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি আইন অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশে বি, এ পরীক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বি, এ পরীক্ষা দিবেন বলিয়া কৃতসংকল্প হইলেন। তখন পরীক্ষার অধিক বিলম্ব ছিল না; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে পশ্চাৎপদ হইলেন না। দুই মাস সময়ের মধ্যেই পাঠ্যপুস্তকসমূহ আয়ত্ত করিয়া তিনি পরীক্ষা দিলেন। দুই জন মাত্র ছাত্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তন্মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি, এ উপাধিধারী বঙ্কিমচন্দ্রের যশঃ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। তদানীন্তন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হ্যালিডে সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমতঃ উক্ত পদ-গ্রহণে সম্মত হন নাই। পিতার আদেশ ব্যতীত তিনি উহা গ্রহণ করিতে পারিবেন না বলিয়াছিলেন। অবশেষে পিতার নির্দ্দেশানুসারে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত পদ গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বিংশ-বর্ষীয় যুবক মাত্র।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই যশোহরে গমন করেন। তখন পূর্ব্ববঙ্গ-রেলপথ যশোহর অভিমুখে প্রস্তুত হয় নাই। জলপথে নৌকায় এবং স্থলপথে পাল্কীতে দুর্গম পথ অতিবাহন করিতে হইত। দস্যুভীতিও তখন বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ভীষণভাবে অনুভূত হইত। জনকজননী, আত্মীয়স্বজন এবং চতুর্দ্দশবর্ষীয়া পত্নীকে ছাড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে দূরদেশে যাত্রা করিতে হইল। ইহার এক বৎসর পরে

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা প্রথমা পত্নী জ্বররোগে প্রাণত্যাগ করিলেন।

যশোহরে আসিয়া দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আলাপ ঘটে। উভয়েই পরস্পর পরস্পরের পরিচয় জানিতেন। "প্রভাকরে" উভয়েরই রচনা প্রকাশিত হইত। প্রথম আলাপের পরই উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ জন্মে। দীনবন্ধুবাবু বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা আট নয় বৎসরের বড় ছিলেন বটে; কিন্তু তাহাতে উভয়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হইতে কোনও প্রতিবন্ধক ঘটে নাই।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পৌষমাসে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুর জেলার নাগোয়াতে বদলী হন। নাগোয়া সমুদ্রের অনতিদূরেই অবস্থিত। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীকে হারাইয়া অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। এদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজযুগল কনিষ্ঠকে পুনরায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র আট মাস কাল তাঁহাদিগের অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই; কিন্তু তাঁহার পিতা-মাতা যে দিন তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে, তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে হইবে, পিতৃমাতৃ-ভক্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে নতশিরে সে আদেশ প্রতিপালন করিতে হইয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। এই অশেষগুণশালিনী পত্নী তাঁহার জীবনাকাশে ধ্রুবতারাস্বরূপ সমুদিত ছিলেন।

নাগোয়া হইতে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় বদলী হন। সে সময়ে খুলনা জেলায় দস্যুতস্করের ভীষণ উপদ্রব, নীলকরদিগের অমানুষিক অত্যাচার। সেই ঘোরতর অরাজকতার মধ্যে আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত বিব্রত

হইতে হইল। নীলকর সাহেবেরাও সে সময় ঘোরতর অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের অত্যাচার ও পীড়নে দরিদ্র প্রজাবর্গ নিষ্পিষ্ট হইতেছিল। মাঠের ধান, রমণীর মান, কৃষকের প্রাণ নির্ব্বিঘ্ন ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র পুলিসের সাহায্যে এই সকল অত্যাচারের প্রতী-কারের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টায় খুলনা জেলায় নীলকরের অত্যাচার প্রশমিত হইয়াছিল ; জলদস্যু ও তস্করদিগকেও তিনি দমন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টও তাঁহার কার্য্যতৎপরতায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহার বেতনবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" রচনা করেন। নীলকরদিগের প্রতাপ ক্ষুণ্ণ করা এবং দস্যু-তস্করদিগকে দমন করা—এই দুই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসরচনার জন্য অবকাশ করিয়া লইয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে, চৈত্রমাসে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনা জেলা হইতে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরে বদ্‌লী হইয়া যান। কয়েক মাস এখানে কার্য্য করিবার পর তিনি ডায়মণ্ডহারবারে ডেপুটীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাহার পর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণার সদরে হাকিম হইয়া আসিলেন।

আলিপুরে বদ্‌লী হইবার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী" ও "কপালকুণ্ডলা" পাঠকবর্গের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে উপন্যাস সৃষ্টি করিয়া তিনি বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। "কপালকুণ্ডলা" রচিত হইবার পর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে চমকিত করিয়া তুলিল। অবশ্য, তাঁহার রচনার বিরোধী সম্প্রদায় তাঁহাকে নানাপ্রকারে বিদ্রূপ করিতে বিরত

হন নাই বটে, তথাপি সকলেই এই নবীন ঔপন্যাসিকের রচনাভঙ্গী, ভাবের বৈচিত্র্য এবং কল্পনার অবাধ সঞ্চরণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বাঙ্গালা ভাষাকে তরঙ্গমালিনী স্রোতস্বিনীতে পরিণত করিবার জন্য সাধনা করিতেছিলেন।

আলিপুরে বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘকাল ছিলেন না। তথায় অবস্থিতির নয় দশ মাসের মধ্যেই তিনি তাঁহার তৃতীয় উপন্যাস "মৃণালিনী" সমাপ্ত করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি দীর্ঘ অবকাশ গ্রহণ করিয়া আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তার পর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের শেষ-ভাগে তিনি কার্য্যভার পুনর্গ্রহণ পূর্ব্বক বহরমপুরে প্রস্থান করিলেন। তথায় যাইবার পূর্ব্বে তিনি বি, এল পরীক্ষা প্রদান করেন। বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। তাঁহার কার্য্যতৎপরতা ও দক্ষতা দেখিয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাকে অত্যল্পকালের মধ্যেই দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটীর পদে উন্নতী করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র সাত শত টাকা বেতন পাইতেন।

বহরমপুরে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃবিয়োগ হয়। সে সময় তিনি উত্তরীয়মাত্র দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া নগ্নপদে আদালতে আসি-তেন; কিন্তু এ ভাবে দীর্ঘকাল কায করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, তিনি দুই দিন পরেই অবকাশ লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। পথিমধ্যে রেলগাড়ীতে তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন, দুইটি সাহেব সুরা

পান করিতেছে। তাঁহাকে নগ্নদেহে, নগ্নপদে কামরায় উঠিতে দেখিয়া, সাহেবেরা সামান্য লোকজ্ঞানে তাঁহাকে নামিয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহস চিরদিনই সমভাবে প্রবল ছিল। ক্ষীণকায় হইলেও তিনি অন্যায় বা অত্যাচারকে ডরাইতেন না। নির্ভীকভাবে তিনি তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সাহেবেরা নগ্নদেহ বাঙ্গালীর মুখে এরূপ চমৎকার ইংরাজী এবং তীব্র মন্তব্য শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠিলেন।

বহরমপুরে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে বাঙ্গালা রচনায় অবহিত হইবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বারাসতে বদলী হন। এ দিকে তখন "বঙ্গদর্শন" বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদক, সঞ্জীবচন্দ্র মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্য-পরিদর্শক এবং তাঁহাদের জনক যাদবচন্দ্র হিসাবপরীক্ষক।* বারাসতে অত্যল্পকাল অবস্থানের পর বঙ্কিমচন্দ্র মালদহ

* "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ করা সম্বন্ধে একটা ইতিহাস আছে। ১২৭৭ সাল হইতে একখানি মাসিকপত্র বাহির করিবার সংকল্প বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে সমুদিত হয়। বাঙ্গালা ভাষার দিকে যাহাতে বাঙ্গালীর অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়, সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভূত যত্ন ছিল; সে সময়ে কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর ধারণা ছিল, বাঙ্গালা ভাষায় পাঠের যোগ্য কিছুই লিখিত হইতে পারে না। সেই ভ্রমাত্মক ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শনের" প্রচার নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন। বিশেষ আয়োজন করিয়া ১২৭৮ সালের শেষভাগে তিনি "বঙ্গদর্শন" বাহির করিবার জন্য এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম সংখ্যা "বঙ্গদর্শন" বাহির হয়। নবযুগের অভিনব, অপূর্ব্ব বঙ্গসাহিত্যের ভিত্তি এই "বঙ্গদর্শনেই" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভবানীপুরের কোনও মুদ্রাযন্ত্র হইতে বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্রজমাধব বসু উহার প্রকাশক ছিলেন। প্রথমতঃ বঙ্গদর্শনের অধিকাংশ প্রবন্ধই বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী

জেলায় বদলী হন। ম্যালেরিয়া রোগের প্রভাবে সে স্থান হইতে ছুটী লইয়া তাঁহার গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। কাঁটালপাড়ায় অবকাশ-কালে তিনি "রাধারাণী" ও "কৃষ্ণকান্তের উইল" রচনা করিতে লাগিলেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে ডেপুটী নিযুক্ত হন। এখানে তিনি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাপন করিয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া সমগ্র জেলার ভারই তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গসাহিত্যের সাধনা নানা প্রকার উপাদেয় রত্ন প্রসব করিতে লাগিল। ভারতীয় ভাণ্ডার বহুবিধ

হইতে নিঃসৃত। বাঙ্গালা সাহিত্যের খাতে প্রবল জলোচ্ছ্বাস দেখা দিল। উত্তরকালে যাঁহাদের মধুময়ী লেখনী হইতে অপূর্ব্ব রচনামাধুর্য্য উৎসারিত হইয়াছিল, সেই সকল স্বনামধন্য বঙ্গসাহিত্যিক প্রাণমন ঢালিয়া মাতৃভাষার সেবায় অবহিত হইলেন। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদাস সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি দেশবিশ্রুত লেখকগণ নবোৎসাহে বঙ্কিমচন্দ্রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জননীর পূজার অর্ঘ্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে লাগি-লেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত বঙ্গসাহিত্য তুষারকিরীটী হিমাচলের ন্যায় আজ যে অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শনে" তাহার প্রথম সূত্রপাত ও ক্রমপরিণতি। "বঙ্গদর্শনই" বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর ঘটাইয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যের তুষারকিরীটী শৈলসম্রাট স্বয়ং "বঙ্গদর্শন।" প্রথম বৎসর "বঙ্গদর্শনের" গ্রাহকসংখ্যা প্রায় দেড় হাজার হইয়াছিল। ১২৮১ সালে উহার গ্রাহকসংখ্যা দুই সহস্র হয়। পরে উহা কমিয়া গিয়া যোল শত গ্রাহকে দাঁড়া-ইয়াছিল। সে সময়ে বাঙ্গালা মাসিকের এরূপ সমাদর নিশ্চয়ই গৌরবের বিষয়। "বঙ্গ-দর্শন" চারি বৎসরকাল সম্পাদনের পর বঙ্কিমচন্দ্র উহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ১২৮৪ সালে সঞ্জীবচন্দ্র উহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। ১২৯০ সালে তিনিও উহার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করেন। এমন উৎকৃষ্ট মাসিকখানি বন্ধ হইবার কতকগুলি কারণ ঘটিয়াছিল। শুনা যায়, "বঙ্গদর্শন" পরিচালনাব্যাপারে আত্মীয়বিরোধ ঘটিয়াছিল, আরও একটা কারণ ছিল, প্রবন্ধলেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রবন্ধের মূল্যও দাবী করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ ক্রয় করিতে সম্মত ছিলেন না।

মহামূল্য রত্নসম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী হইতে প্রচুর অর্থও তাঁহার ধনভাণ্ডারকে স্ফীত করিয়া তুলিল। এই সময়টা বঙ্কিমচন্দ্রের সকল প্রকার সাধনার চরম অবস্থা। এই সময়েই তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়া উঠে।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র হাবড়ায় বদ্‌লী হইয়া আসেন। কিছুকাল পরে তত্রত্য তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট বক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাদ বাধিতে লাগিল। পুলিসের পক্ষ হইতে যে সকল মোকদ্দমা বিচারের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে আসিত, বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়ই সে সকল মোকদ্দমার আসামীকে মুক্তিদান করিতেন। এ জন্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বক্‌ল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না, তৎপরে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী সংক্রান্ত একটি ঘটনা উপলক্ষ করিয়া বক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাদ আরও প্রচণ্ড হইয়া উঠে। মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ ইংরাজীতে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন যে, দহ্যমান আচ্ছাদন দ্বারা কেহ গৃহ-নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। বাঙ্গালাতেও উহার অনুবাদ প্রচারিত হয়; কিন্তু তদানীন্তন মিউনিসিপ্যালিটীর সম্পাদক জনৈক সাহেব উহার এমন বঙ্গানুবাদ করেন যে, তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। জনৈক বৃদ্ধা গোলপাতার ঘর নির্ম্মাণ করায় মিউনিসিপ্যালিটী সেই বৃদ্ধার নামে নোটিশ জারি করিলেন। মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান সাহেব বৃদ্ধাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করায়, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারার্থ উক্ত বৃদ্ধাকে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র মিউনিসিপ্যালিটীর অপূর্ব্ব বাঙ্গালাভাষা-জ্ঞান দেখিয়া বৃদ্ধাকে মুক্তি প্রদান করিলেন। সে দুর্ব্বোধ ভাষার

অর্থ বিজ্ঞের বুদ্ধিরই অগোচর, সুতরাং একটা অক্ষরজ্ঞানহীনা বৃদ্ধা তাহার অর্থ অবধারণ করিবে কিরূপে?

বৃদ্ধা মুক্তি পাইল বটে, কিন্তু জেলার হাকিম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের রায়ের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া লিখিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় আপনাকে দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন, সেই জন্যই তিনি এই মোকদ্দমার বিচারে ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তেজস্বী বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবের এইরূপ মন্তব্য দর্শনে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে তীব্রভাবে লিখিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার রায়ের উপর সাহেবের মন্তব্য প্রকাশ করিবার আইনসঙ্গত কোন অধিকার নাই। এরূপ সমালোচনা অনধিকারচর্চ্চা। শুধু এইটুকু লিখিয়াই তিনি নিরস্ত হইলেন না; সাহেব এক মাসের মধ্যে তাঁহার নিকট ক্ষমা না চাহিলে তিনি কমিশনার সাহেবের নিকট এ বিষয়ের জন্য আবেদন করিবেন।

বক্‌ল্যাণ্ড সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা দূরে থাকুক, কাগজপত্রাদিও তাঁহার নিকট পাঠাইলেন না। তদানীন্তন কমিশনার সাহেব কার্য্যোপলক্ষে হাওড়ায় আসিলে একদিন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিকট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অসঙ্গত ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটও সংবাদটা পৌঁছিল। তিনি জানিতেন, রায়ের উপর মন্তব্য প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে বে-আইনী কায হইয়াছে, কাযেই তিনি একটু ভীত হইলেন এবং আপোষে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কার্য্যশেষে বঙ্কিমচন্দ্র যখন

বাড়ী যাইতেছিলেন, সেই সময় বক্ল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আপোষে ব্যাপারটা মিটাইয়া লইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। পরিশেষে স্থির হইল, সাহেব তাঁহার মন্তব্যের প্রত্যাহার করিবেন, বঙ্কিমচন্দ্রও স্বীয় পত্রের প্রত্যাহার করিবেন। সেই কথামত কার্য্য হইল। তদবধি বঙ্কিমচন্দ্রকে বক্ল্যাণ্ড সাহেব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, উভয়ের মধ্যে একটা সৌহৃদ্যও জন্মিয়াছিল।

পৃথিবীতে যাঁহারা অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই পিতৃমাতৃভক্তি অতুলনীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃমাতৃভক্তিও অসাধারণ ছিল। পিতাকে তিনি দেবতাজ্ঞানে এমনই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন যে, তিনি যে কক্ষে থাকিতেন, তথায় পাদুকা লইয়া প্রবেশ করিতেন না। যে শয্যায় তাঁহার পিতৃদেব শয়ন করিতেন, যে আসনে উপবেশন করিতেন, কদাপি সে শয্যা, সে আসন অথবা তাঁহার ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন না। সে সকল পদার্থ তাঁহার নিকট অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া বোধ হইত। পিতা কোনও কার্যে ব্যস্ত থাকিলে, বড় গলা করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারিতেন না। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া সর্ব্বপ্রথম যখন তিনি কর্ম্মস্থল যশোহরে গমন করেন, সেই সময় গঙ্গাজলে মাতার ও পিতার পাদোদক শিশি ভরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীর পুত্রগণ বঙ্কিমচন্দ্রের এই অপূর্ব্ব পিতৃমাতৃভক্তি স্মরণ রাখিলে ধন্য হইতে পারেন। বঙ্কিম-জীবনী-লেখক এই ঘটনার বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, জননী বলিলেন, 'করলি কি! গঙ্গাজল আমার পায়ে ঠেকালি?' বঙ্কিমচন্দ্র ছল ছল নয়নে বলিলেন, "মা, তোমার চেয়ে কি গঙ্গা বড়?" এক দিন দয়ার সাগর,

করুণার প্রতিমূর্ত্তি, আদর্শ মাতৃভক্ত সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এইরূপ ভাবের কথা বলিয়াছিলেন। বঙ্গজননী, উনবিংশ শতাব্দীতেও এইরূপ পিতৃমাতৃভক্ত আদর্শ সন্তান বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, বাঙ্গালী জাতির ললাটে গৌরবের দীপ্ত তিলক পরাইয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে, পিতৃবিয়োগের কিছুকাল পরে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা সরকারের সহকারী সম্পাদক (Assistant Sceretary) পদে নিযুক্ত হন। এই পদে নিযুক্ত হইবার পর তদানীন্তন সেক্রেটারী মেকলে সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সামান্য মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। পরিণামে উক্ত পদ উঠিয়া যাওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে আলিপুরে বদ্‌লী হন। তথা হইতে কয়েক মাসের জন্য বারাসতে গিয়া তিনি যাজপুরে গমন করেন। যাজপুরে ছয় মাস কার্য্য করার পর তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে হেষ্টি সাহেবের মসী-যুদ্ধের সূচনা হয়। এই যুদ্ধের কাহিনী বাঙ্গালী সাহিত্যসেবিমাত্রেই অবগত আছেন। শোভাবাজার রাজবাটীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে হেষ্টি সাহেব হিন্দু-ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া "ষ্টেট্‌সম্যান" সংবাদপত্রে এক প্রবন্ধ লেখেন। বঙ্কিমচন্দ্র একজন খৃষ্টানের এরূপ ঔদ্ধত্যকে মার্জ্জনা করিতে পারিলেন না। হেষ্টি সাহেবের গালাগালির উত্তরে ছদ্মনামে তিনি উক্ত পত্রে প্রত্যুত্তর দিলেন। দীর্ঘকাল মসী-যুদ্ধের পর বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পত্রে আপনার নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যাজপুর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় হাওড়ায় বদ্‌লী হইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে অবস্থানকালে হাওড়ার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্ট

মেকট্ সাহেবের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে। কোনও মোকদ্দমার বিচারে বঙ্কিম বাবু আসামীকে খালাস দিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সেজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে প্রবেশ পূর্ব্বক বঙ্কিমচন্দ্রের কার্য্যের সমালোচনা করেন। ইহাতে আদালতের অবমাননা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে "প্রসিডিংস" লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সাহেব আইনজ্ঞ; তিনি নিজের ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহাকে রেহাই দেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সরকারের সেবা করিয়াও কোনও দিন মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব হইতে দেন নাই। স্বাধীনভাবে তেজের সহিত তিনি গবর্ণমেণ্টের কাজ করিতেন। কাহারও রক্তচক্ষু দর্শনে তিনি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের কার্য্যকালের ইতিহাসে এমন বহু ঘটনার সমাবেশ আছে যে, তাহার উল্লেখ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। মোটের উপর এই বলা যায় যে, তাঁহার মত কর্ত্তব্যপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভীক ও তেজস্বী বাঙ্গালী কর্ম্মচারী সে সময় রাজসরকারে অতি অল্পসংখ্যকই ছিলেন। কিন্তু দক্ষতার সহিত কাজ করা সত্ত্বেও ইংরাজ হাকিমদিগের সহিত কোনও দিন তিনি ঐক্য স্থাপন করিয়া চলিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিলেন, এরূপভাবে কলহ করিয়া কাজ করা চলে না। সুতরাং তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার জন্য আবেদন করিলেন। সরকার তাঁহাকে রেহাই দিলেন না। তখনও তাঁহার পঞ্চান্ন বৎসর বয়স হইতে দুই বৎসর বাকী। রোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া না পড়িলে গবর্ণমেণ্ট পূরা পেন্সনে কাহাকেও অবসরগ্রহণের অনুমতি দেন না; সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের আবেদন ব্যর্থ হইল। বঙ্কিমচন্দ্র নিরুৎসাহ হইলেন না।

তিনি তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর ইলিয়ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রোগের অভিনয় করিয়া, মিথ্যাবাক্যের সাহায্যে তিনি কার্য্যোদ্ধারের পক্ষপাতী ত ছিলেনই না ; অধিকন্তু মিথ্যাকে তিনি অন্তরের সহিত অশ্রদ্ধা করিতেন। ছোটলাট বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্রের গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে স্পষ্টভাবে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, ইলিয়ট সাহেব তাঁহার সত্যবাদিতা এবং নির্ভীকতায় সন্তুষ্ট হইয়া তিপ্পান্ন বৎসর বয়সেই পুরা পেন্সনে তাঁহাকে অবসর দিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে বঙ্কিমচন্দ্র রাজকার্য্য হইতে চারি শত টাকা পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সংকল্প ছিল যে, অবসরগ্রহণের পর তিনি নবোৎসাহে নূতন নূতন গ্রন্থ রচনা করিবেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহার সে সংকল্প যথার্থরূপে সিদ্ধ হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার দেশবিশ্রুত উপন্যাসরাজি ও অন্যান্য গ্রন্থনিচয় মুদ্রিত হইয়া তাঁহাকে প্রচুর অর্থ ও যশের ডালি আনিয়া দিয়াছিল। পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিতান্ত কম ছিল না। তখন তাঁহার আয় বাৎসরিক ছয় সহস্র মুদ্রা দাঁড়াইছিল।

অবসরগ্রহণের পর বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকখানি উপন্যাসের নূতন সংস্করণ করিয়াছিলেন। আর "রাজসিংহ" ও "ইন্দিরা"কে পরিবর্দ্ধিত আকারে বাহির করিয়াছিলেন। "রাজসিংহ" পরিবর্দ্ধিত আকারে মুদ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব রসমাধুর্য্যপূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাসে বঙ্গ-সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বক্তৃতা করিতে ভালবাসিতেন না, তথাপি তিনি

"Society for the higher training of youngmen" নামক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এই সভায় তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

প্রথম-যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন ছিলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইহার ক্রমপরিণতি বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিছু কালের জন্য মৎস্যমাংসাশী বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সকল খাদ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি নামাবলী গায় দিয়া, বিশুদ্ধ আচারপ্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক সাত্বিক জীবন যাপন করিতেন। অধিকাংশ কাল তিনি গীতা পাঠ ও আবৃত্তি করিতেন; কিন্তু অর্দ্ধশত বৎসর যিনি মৎস্য ও মাংসে দেহ পুষ্ট করিয়া আসিয়াছিলেন, পূর্ণ সাত্বিক আহার তাঁহার সহ্য হইল না। অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পুনরায় মৎস্যমাংস ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে সন্ন্যাসীর প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়; তাঁহার জীবনেও সন্ন্যাসীর প্রভাব ঘটিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃদেব যাদবচন্দ্র সন্ন্যাসীর দ্বারা প্রথম-যৌবনে মৃত্যুদ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সন্ন্যাসীর দেখা পাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনেও তিনি অযাচিতভাবে সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ লাভ করেন। সন্ন্যাসীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাভাবিক একটা শ্রদ্ধা ছিল।

গুরুতর পরিশ্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের শরীরে বহুমূত্র রোগ দেখা দিয়াছিল। রাজকার্য্য হইতে অবসরগ্রহণের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই এই রোগের সূত্রপাত হয়; কিন্তু সে সময়ে বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নাই।

বিচার-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-সাধনায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। দিবসের অধিকাংশ সময় শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতেন। এই সাধনার ফলে তাঁহার অমর অবদান কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হয়। এই সময় তিনি ছোট ইন্দিরাকে বড় করেন। ইহার পর তিনি শ্রীমদ্ভাগবত গীতার অভিনব ব্যাখ্যা প্রচারে প্রবৃত্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্র ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া স্রোতের মত অনর্গলভাবে কৃষ্ণচরিত্র বলিয়া যাইতেন, অধিকাংশ সময়েই কবিবর নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি দ্রুতবেগে লিখিয়া যাইতেন। নবকৃষ্ণ বলেন, বঙ্কিমবাবু শাস্ত্র-রহস্য মীমাংসার এই সকল জটিল তত্ত্ব এত দ্রুত বলিয়া যাইতেন যে, তাঁহার অনুসরণ করা নবকৃষ্ণ বাবুর মত দ্রুত লেখকের পক্ষেও অসম্ভব হইত।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সম্যক্ পরিচয়ের—বৈচিত্র্যময় জীবনের সকল কথা সবিস্তারে বলিবার স্থান নাই। তাঁহার বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে কত কাহিনীই না প্রবাদবাক্যের মত প্রচলিত রহিয়াছে! কত জটিল মোকদ্দমা, বাঙ্গালার অসাধারণ প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিকের উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে সুমীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। মানবমনোবৃত্তির সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কিরূপ গভীর জ্ঞান ছিল, তাঁহার উপন্যাসনিচয়ে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে এ বিষয়ে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার বিকাশ দেখিয়া আরও বিস্মিত হইতে হয়। ক্ষুদ্র একটি শব্দ, সামান্য একটি ইঙ্গিতের সাহায্যে তিনি অনেক জটিল বিষয়কে সরল করিয়া আনিতে পারিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চিকিৎসাশাস্ত্র যত্ন পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আলিপুরে যখন তিনি ডেপুটী ছিলেন, সেই সময় কলিকাতার মেডিকেল কলেজে

তিনি শারীরতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক চিকিৎসাসংক্রান্ত মূল্যবান্ গ্রন্থ ক্রয় করিয়া স্বয়ং বিশেষভাবে সে সকল বিষয় পাঠ করিয়াছিলেন। অসাধারণ প্রতিভার সাহায্যে অতি সহজেই তিনি কঠিন বিষয় সমূহ আয়ত্ত করিতে পারিতেন।

সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধেও তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহার কণ্ঠস্বর তত ভাল ছিল না বটে, কিন্তু তানলয়বোধ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। যদুভট্ট তানরাজ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ গায়ককে মাসিক বেতন দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাহার নিকট হইতে গীতবাদ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান ছিল। জনৈক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীর নিকট তিনি কিছুকাল জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। "সীতারামে" তাঁহার জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞানের অনেক পরিচয় আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। বন্ধুপ্রীতির নিদর্শন স্বরূপ কয়েকখানি গ্রন্থ তিনি বন্ধুগণকে উৎসর্গ করিয়াছেন। দীনবন্ধু মিত্র ও জগদীশনাথ রায় তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। দীনবন্ধু সম্মিলনে রসরঙ্গের উচ্ছ্বাস বহিত। বঙ্কিমচন্দ্র জগদীশনাথকে সোদরোপম স্নেহ করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুবাৎসল্য অসাধারণ ছিল। যাহাকে তিনি ভালবাসিতেন, তাহার জন্য তিনি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ একাগ্র সাধনার প্রভাবে বঙ্গসাহিত্যের খাতে পুণ্যতোয়া তরঙ্গমালিনী জাহ্নবী বহাইয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস সাধারণের অগোচর। এজন্য তাঁহাকে কিরূপ কঠোর তপস্যা করিতে হইয়াছিল, তাহার কোন সন্ধান বাঙ্গালী এ পর্য্যন্ত পায় নাই। যদি তাঁহার লিখিত আত্মচরিত প্রকাশিত হইত, তবে বাঙ্গালী পাঠক তাহা পাঠে কৌতূহল

চরিতার্থ করিতে পারিতেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সে গ্রন্থ প্রকাশিত না হওয়ায় তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধ কত গভীর ও দূরব্যাপী ছিল, তাহা তাঁহার রচনায় পরিস্ফুট। বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতা কোথায়, বাঙ্গালীর সাধনা কোন্ প্রলোভনে ব্যর্থ হইয়া যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের মত এ পর্য্যন্ত আর কেহ তেমন সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইতে পারেন নাই। বাঙ্গালা-দেশকে তিনি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন, পূজার অর্ঘ্য দান করিতেন, বাঙ্গালীও তাঁহার পরম প্রীতির পাত্র ছিল। তিনি খাঁটি স্বদেশভক্ত ও স্বজাতিবৎসল মহাপুরুষ ছিলেন। বাঙ্গালীর কলঙ্ক-ক্ষালনের জন্য তিনি ইতিহাস ঘাঁটিয়া বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন; ইতিহাস রচনার স্পৃহা বাঙ্গালীর হৃদয়ে জাগাইয়া কি করিয়া ইতিহাস রচনা করিতে হইবে, তাহার পন্থা পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মুক্তকণ্ঠে তিনিই সীতারামে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে আর কে রাখিবে?"

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে তিনি সি, আই, ই উপাধি ভূষণে মণ্ডিত হন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এ উপাধি-লাভে আপনাকে ধন্য মনে করেন নাই।

বহুমূত্র রোগ ১৩০০ সালের শীতের সময় সহসা এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, বঙ্কিমচন্দ্রকে শয্যা গ্রহণ করিতে হইল। চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কিন্তু রোগের উপশম হইল না। রোগ বৃদ্ধি পাইয়া ২৬শে চৈত্র অপরাহ্ণকালে বঙ্গ-জননীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান, সাহিত্য-সম্রাট

বঙ্কিমচন্দ্রকে ইহলোক হইতে টানিয়া লইয়া গেল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসর ৯ মাস হইয়াছিল। তিনটি মাত্র কন্যা রাখিয়া বঙ্কিম-চন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলীর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) দুর্গেশনন্দিনী, (২) কপালকুণ্ডলা, (৩) মৃণালিনী, (৪) বিষবৃক্ষ, (৫) লোকরহস্য, (৬) বিজ্ঞান-রহস্য, (৭) ইন্দিরা, (৮) যুগলাঙ্গুরীয়, (৯) রাধারাণী, (১০) চন্দ্রশেখর, (১১) কমলা-কান্তের দপ্তর, (১২) বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ, (১৩) রজনী, (১৪) সাম্য (১৫) গদ্য পদ্য, (১৬) কৃষ্ণকান্তের উইল, (১৭) শ্রীমদ্ভাগবত, (১৮) রাজ-সিংহ, (১৯) আনন্দমঠ, (২০) দেবী চৌধুরাণী, (২১) মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, (২২) কৃষ্ণচরিত্র, (২৩) সীতারাম, (২৪) বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ, (২৫) ধর্ম্মতত্ত্ব, (২৬) Bengali selections for Entrance Examination. 1895, (২৭) ললিতা ও মানস।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনেকগুলি ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও বিষবৃক্ষ, দেবী চৌধুরাণীর ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু ছাপান নাই।

বাঙ্গালীর জন্য, দেশের কল্যাণের নিমিত্ত বঙ্কিমচন্দ্র যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অমূল্য, অতুলনীয়। ভাষা-জননীর বরদেহে তিনি যে রত্নাঞ্চল দুলাইয়া দিয়াছেন, যে মহামূল্য রত্নালঙ্কার পরাইয়া দিয়াছেন, তাহার প্রভাবে জননীর মহিমান্বিত রূপমাধুর্য্য নিখিলবিশ্বে অপূর্ব্ব দীপ্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি যে ভাবগঙ্গার পুণ্য-প্রবাহ বাঙ্গালীর হৃদয়ে বহাইয়া গিয়াছেন, তাহার স্নিগ্ধ-সলিলে অবগাহন করিয়া শুধু বাঙ্গালী

নহে, বিশ্ববাসী মাত্রেই পবিত্র ও ধন্য হইতে পারেন। "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রস্রষ্টা ঋষিবর বঙ্কিমচন্দ্র, পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যজাতির বিস্ময় উদ্রিক্ত করিয়া বাঙ্গালীজাতিকে বরেণ্য করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গজননীর সাধক, ভক্তসন্তান, বাঙ্গালীর মুকুট-মণি বঙ্কিম আজ লোকাতীত রাজ্যে অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু তিনি বাঙ্গালীর হৃদয়ে হৃদয়ে দেশভক্তির মন্দাকিনী-ধারা বহাইয়া, তাহাদের কার্য্যে, সাধনায় এবং সিদ্ধিতে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। বঙ্কিমচন্দ্রের মহামন্ত্রের উদাত্ত-ধ্বনি বাঙ্গালীর হৃদয়-মন্দিরে নিয়তই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বাঙ্গালীকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে, আত্মস্থ করিতে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আত্মবিস্মৃত জাতিকে আপনার পূর্ব্ব-গৌরব, পূর্ব্ব-সমৃদ্ধি, পূর্ব্ব-প্রতিপত্তির সংবাদ তিনিই প্রথম সাহিত্যের মধ্য দিয়া নানা প্রকারে জানাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে, বাঙ্গালীর সম্মান বাঙ্গালী না রাখিলে, আর কে রাখিবে, এই মহাবাণী তিনিই এই জাতির কর্ণ-রন্ধ্রে ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যেব হেমকিরীটী মন্দিরে বহুরত্নালঙ্কার-ভূষিতা বিগ্রহ স্থাপনের পর তিনিই দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। আজ চারিদিক্ হইতে শত শত ভক্ত দিব্য পূজার অর্ঘ্য আনিয়া সেই সজীব বিগ্রহের বেদীমূলে উৎসর্গ করিতেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রই তাহার পথপ্রদর্শক। বঙ্কিমকে বক্ষে ধারণ করিয়া বঙ্গজননী আনন্দবিহ্বল,—বাঙ্গালীও তাঁহার পুণ্য-স্মৃতির আলোচনা করিয়া ধন্য—কৃতার্থ।

বঙ্কিমচন্দ্র! মহাপুণ্যমুহূর্ত্তে তুমি লেখনী ধারণ করিয়াছিলে, বাঙ্গালীর বহু ভাগ্যফলে তুমি বাঙ্গালায় জন্মিয়াছিলে! একনিষ্ঠ সাধনার ফলে আজ তুমি বিশ্বসাহিত্যের কতখানি অংশ অধিকার করিয়াছ—

সাহিত্য-সাম্রাজ্যের কোন্ অত্যুচ্চ রত্ন-সিংহাসন তোমার জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, হে সাহিত্য-সম্রাট! আজও কি কেহ তাহা নির্ণয় করিবার ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে? সাহিত্যের তপোবন তোমার পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে চির-মুখরিত। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যজ্ঞ-প্রাঙ্গণে যে সকল যাজ্ঞিক সমবেত হইয়া বিশ্ব-সাহিত্যের মহাযজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়াছেন, তোমার পট্টাম্বরপরিহিত, বিশিষ্ট-ধ্যানস্তিমিত, প্রতিভা-প্রদীপ্ত-মূর্ত্তি তাঁহাদের গৌরবমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।

সাহিত্যের মহারথি! তোমার প্রবর্ত্তিত পথে আজ শত শত কৃতী সন্তান, পূজোপকরণসহ মাতৃভাষার চরণে অর্ঘ্যভার বহিয়া আনিতেছেন। জননীর মর্ম্মর-বেদী প্রতিভা-সুরভিত পুষ্পভারে ভরিয়া উঠিয়াছে। শোভা ও সৌরভে মন্দিরতল আলোকিত—পরিপূর্ণ। কিন্তু হে বিশ্বকবি! তোমার সাহিত্য-মন্দারমালার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে নয়ন ঝলসিয়া যাইতেছে, স্বর্গীয় সৌরভে পূজার্থীর চিত্ত পুলকভরে নৃত্য করিয়া উঠিতেছে; শুধু তাহাই নহে, তোমার প্রতিভা, মণীষা, বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য স্মরণ করিয়া হৃদয় শ্রদ্ধাভরে তোমার চরণ-প্রান্তে নত হইয়া পড়িতে চাহিতেছে। আবার এস বঙ্কিমচন্দ্র, আবার বাঙ্গালীর কর্ণরন্ধ্রে নূতন মহামন্ত্র ঢালিয়া দিয়া বাঙ্গালীকে সঞ্জীবিত কর। নূতন আদর্শ-চিত্র প্রসারিত করিয়া জাতিকে নবভাবে উদ্দীপিত—অণুপ্রাণিত কর। তোমার প্রতিভাদীপ্ত পথে বিভ্রান্ত বাঙ্গালীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বাঙ্গালীর জীবন-সাধনা সফল কর।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ১২১৮ সালের ২৫শে ফাল্গুন শুক্রবার ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। জননীর নাম শ্রীমতী। ঈশ্বরচন্দ্র পিতার দ্বিতীয় পুত্র। শৈশবে ইনি অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। কেহ ঈশ্বরচন্দ্রকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। পিতামাতা বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে লইয়া সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন। লেখা-পড়ায় প্রথমতঃ ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ মনোযোগ ছিল না। গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন বটে; কিন্তু বীণাপাণির আরাধনা করা অপেক্ষা দুষ্টামিতেই তিনি বিশেষ পরিপক হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মেধা ও স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখরা ছিল, যাহা একবার শুনিতেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না।

দশ বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র মাতৃহীন হন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে হরিনারায়ণ পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিমাতার আবির্ভাব ব্যাপারটিকে আদৌ প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন নাই। কথিত আছে, বিবাহের পরেই হরিনারায়ণ শিয়ালডাঙ্গার নীলকুঠীতে স্বীয় কর্ম্মস্থলে চলিয়া যান। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহী নববধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিবার সময় ঈশ্বরচন্দ্র সক্রোধে নবাগতা বিমাতার প্রতি একখানি রুল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। নববধূর সৌভাগ্যবশতঃ উহা তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করে নাই। ঈশ্বরচন্দ্রের এইরূপ বিসদৃশ আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তদীয় জ্যেষ্ঠ

জাত ভ্রাতুষ্পুত্রকে রীতিমত প্রহার করেন। অভিমানী বালক এ ঘটনার কথা বিস্মৃত হইলেন না। বিমাতাকে মাতৃসম্বোধন করিতে তাঁহার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি যোড়াসাঁকোতে আসিয়া মাতামহের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন।

বাল্যকালে পাঠে অমনোযোগসত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা-রচনার শক্তি দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই বিকশিত হইয়াছিল। পাঠশালার ছাত্রগণ পারস্যভাষার অর্থ করিয়া পাঠ করিত। ঈশ্বরচন্দ্র তাহা শুনিয়া বাঙ্গালাভাষায় কবিতা লিখিতেন। মুখে মুখে কবিতা-রচনার শক্তিও তাঁহার জন্মিয়াছিল। একবার কোনও আত্মীয় কলিকাতায় আসিয়া বালক ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করেন, কলিকাতায় কেমনভাবে দিন কাটিতেছে? উত্তরে মুখে মুখে ঈশ্বরচন্দ্র কবিতায় তাহার উত্তর প্রদান করেন—

"রেতে মশা দিনে মাছি,
এই নিয়ে কল্‌কাতায় আছি।"

তখন কলিকাতায় মাছি ও মশার ভীষণ উপদ্রব ছিল।

কলিকাতায় আসিবার পর ঈশ্বরচন্দ্র ইংরাজীভাষা শিক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু নিয়মিতভাবে পাঠাভ্যাসের অনুরাগ তাঁহার ছিল না। সে জন্য ইংরাজীভাষাতেও তিনি বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়ঃক্রম যখন পঞ্চদশ, সেই সময় গুপ্তিপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণির সহিত তাঁহার পরিণয় ঘটে। দুর্গামণির বাহিরের রূপ-লাবণ্য তেমন ছিল না; বুদ্ধি-বিবেচনারও অভাব ছিল; এ জন্য

ঈশ্বরচন্দ্র বড়ই অসুখী হইয়াছিলেন। শুনা যায়, তিনি বিবাহের পর স্ত্রীর সহিত তেমন ঘনিষ্ঠতা রাখেন নাই।

বিদ্যার্জ্জনের দিকে অনুরাগ না থাকিলেও সপ্তদশ কি অষ্টাদশবর্ষ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র দেড় মাসকালের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের মিশ্র পর্য্যন্ত অর্থসহ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অনন্তসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির সহায়তাতেই তিনি দুঃসাধ্য ব্যাপার সংসাধন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র অধিকাংশকাল কবিতা-রচনাতেই অতিবাহিত করিতেন। তিনি জন্ম-কবি। কবিতা রচনাতেই তাঁহার সমধিক আনন্দ ছিল। বাল্যকালে জ্যেষ্ঠতাতপুত্র মহেশচন্দ্রের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার লড়াই হইত। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির সহায়তায় দুর্ব্বোধ সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা একবার-মাত্র শুনিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র তাহা বাঙ্গালা কবিতায় রচনা করিতে পারিতেন।

কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবংশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহ রামমোহন গুপ্তের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ৺নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের আনুকূল্য ও উদ্যোগে ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ হইতে ঈশ্বরচন্দ্র "সংবাদ প্রভাকর" নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। যোগেন্দ্রমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বিশেষ হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র অবসরকালের অধিকাংশই যোগেন্দ্রমোহনের ভবনে যাপন করিতেন। তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহাদের উৎসাহেই ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বশক্তির সমধিক প্রকাশ ঘটিয়াছিল। সখের কবির দলে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত গান রচনা করিয়া দিতেন; কোনও বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হইলে তাহা

অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা করিতেন এবং সকলকে শুনাইতেন। "সংবাদ প্রভাকর", ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পাদকতায় বাহির হইতে লাগিল। অধিকাংশ প্রবন্ধ কবিতায় লিখিত হইত। পাঠকবর্গ সরস বর্ণনাব গুণে ইহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যেই উক্ত সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের লেখক ও পাঠকসংখ্যা সমধিক বর্দ্ধিত হইল। অচিরকালমধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভা সমাদৃত হইল। দেশের ও দশের নিকট তিনি সুপরিচিত হইলেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয় কুমার দত্তকে তিনি নানা প্রকারে উৎসাহ দিতেন। অক্ষয় বাবুও ইংরাজী পত্রিকাদি হইতে তাঁহার জন্য সংবাদাদি সংগ্রহ করিয়া দিতেন। ঈশ্বর-চন্দ্রের প্ররোচনাবশতঃই অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যপদে নিযুক্ত হইবার বাসনা করেন। তাঁহার দ্বারাই অক্ষয় বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত হন। মোট কথা, উত্তরকালে অক্ষয়কুমার দত্ত সাহিত্য-জগতে যে প্রতিষ্ঠালাভ করেন, তাহার মূলে ঈশ্বরচন্দ্রের যথেষ্ট আনুকূল্য ছিল। শুধু তত্ত্ববোধিনীর নহে, সে সময়ে বহুসংখ্যক সভা-সমিতির সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি সভাস্থলে বক্তৃতা করিয়া অন্যকে উৎসাহ প্রদান করিতেন।

১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর পরলোকগমন করেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে "প্রভাকর"ও কিছুদিনের জন্য মেঘান্তরালস্থিত সূর্য্যের ন্যায় লোকলোচনের বহির্ভূত হইয়াছিল। "প্রভাকর" বিলুপ্ত হইবার পর আন্দুলের জমীদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহোদয়ের উদ্যোগে "রত্নাবলী" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উহার সম্পাদক ছিলেন, মহেশচন্দ্র পাল। কিন্তু সংবাদপত্রপরিচালনকার্য্যে যে

লিপিকুশলতার প্রয়োজন, তাঁহার তাহা ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তই প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পাদকের যাবতীয় কার্য্য করিতেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি "রত্নাবলীর" সংস্রবে থাকিতে পারেন নাই। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন, সকল কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি কটকে গিয়া কিছুদিন তদীয় পিতৃব্য শ্যামামোহন রায় মহাশয়ের ভবনে আতিথ্যগ্রহণ করেন। সেখানে অবস্থানকালে ঈশ্বরচন্দ্র কোনও দণ্ডীর নিকট তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে বাঙ্গালা কবিতায় তিনি উহা অনূদিত করিতে থাকেন।

কটক হইতে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর ১২৪৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ বুধবার হইতে তিনি "সংবাদ প্রভাকরকে" পুনর্জ্জীবন দান করেন। কানাইলাল ঠাকুর এ বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। এই সময়ে "প্রভাকর" সপ্তাহে তিনবার করিয়া বাহির হইত। ১২৪৫ সালের ১লা আষাঢ় হইতে উহা দৈনিকে পরিণত হয়। ইহাই বাঙ্গালাভাষার প্রথম দৈনিক পত্র। সে সময়ে দৈনিক পত্র বাঙ্গালায় প্রকাশ করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র এই সময়ে বহুসংখ্যক সুপণ্ডিত ও রচনাকুশল ব্যক্তিকে দৈনিক "প্রভাকরে"র লেখকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সকল পণ্ডিত সে সময় তাঁহার সহায়তায় ব্রতী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চব্বিশ পরগণার চাঙ্গড়িপোতা গ্রামের হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় অন্যতম। ইনি "সোমপ্রকাশে"র জন্মদাতা দেশবিশ্রুত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জনক।

"প্রভাকরের" রচনানৈপুণ্যে দেশের লোক আকৃষ্ট হইল। প্রভাকরের কবিতা পড়িবার জন্য দেশের জনসাধারণ উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল। "প্রভাকর" ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত হইয়া বাহিরে আসিবামাত্র পথচারী

লোক উহা ক্রয় করিত। ফেরিওয়ালারা পথের মোড়ে মোড়ে কাগজ লইয়া যখন উহার দুই চারিটি কবিতার অংশমাত্র আবৃত্তি করিত, অমনই বহুসংখ্যক কাগজ বিক্রয় হইয়া যাইত। ঈশ্বরচন্দ্রের কবি-প্রতিভা ক্রমে সমগ্র বাঙ্গালাদেশে ছড়াইয়া পড়িল। ঈশ্বরচন্দ্রের অনুকরণে অনেকেই কবিতা রচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। সে সময়টিকে ঠিক ঈশ্বরচন্দ্রী যুগ বলা যাইতে পারে। যিনি লেখনী ধারণ করিতেন, জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, তাঁহার রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব অনুভূত হইত। অচিরকালমধ্যেই চারিদিকে ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্যসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ অধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র, হরিমোহন সেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উত্তরকালে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রঙ্গলাল কবিতায় গুরুর রচনা হইতে অনেকটা আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। রঙ্গলালের কবিতায় অনেক স্থলেই মৌলিকতা দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহের বৈধতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য পুস্তিকাদি প্রচার করেন, সেই সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত তাহার প্রতিবাদস্বরূপ ব্যঙ্গকবিতানিচয় "প্রভাকরে" মুদ্রিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা ঈশ্বর গুপ্তের সে রসরচনা পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন।

১২৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র "পাষণ্ড-পীড়ন" নামে আর একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন। এই সময়ে "ভাস্কর" পত্রের সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ—ইঁহার ডাক নাম গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য—"রসরাজ" নামক আর

একখানি সংবাদপত্রের প্রচার করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কবিতায় প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহিতে জানিতেন না। তিনি "রসরাজ"কে অপদস্থ করিবার জন্য —"পাষণ্ড-পীড়ন" পত্রে কবিতায় উত্তর দিতেন। ক্রমে উক্ত পত্রে গালাগালিই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। তখন বাঙ্গালার আসরে যে কবির লড়াই চলিত, সাহিত্যক্ষেত্রে উক্ত দুইখানি পত্র তাঁহারই অবতারণা করিতেন। "পাষণ্ড-পীড়ন" দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে নাই। ১২৫৪ সালের মধ্যেই উহার অস্তিত্ব লোপ পায়। সম্ভবতঃ পাঠক-বর্গ উহার প্রতি তাদৃশ আনুরক্তি প্রকাশ না করাই তাহার প্রধান কারণ। সঙ্গে সঙ্গে "রসরাজ"ও উঠিয়া যায়।

১২৫৪ সালেই ঈশ্বরচন্দ্র "সাধুরঞ্জন" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রে তদীয় শিষ্যমণ্ডলীর প্রবন্ধ ও কবিতা প্রভৃতি মুদ্রিত হইত। "সাধুরঞ্জন" অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিল।

১২৬০ সালে হইতে তিনি "প্রভাকরের" একটা স্থূল সংস্করণ মাসে মাসে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র দশ বৎসরকাল নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া প্রভূত পরিশ্রম সহকারে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন, রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের অনেক লুপ্ত কবিতা ও তাঁহাদের জীবন-চরিত সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করেন। ১২৬২ সালের আষাঢ়মাসে ভারতচন্দ্রের জীবনী-সংবলিত গ্রন্থাবলী তিনিই প্রথম মুদ্রিত করেন। প্রতি মাসের "প্রভাকরে" তিনি

রামনিধি, হরু ঠাকুর, নিতাই দাস বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতনামা প্রাচীন কবির জীবন-চরিত, গীত ও পদাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে সেগুলি মুদ্রিত করিবার তাঁহার সংকল্প ছিল; কিন্তু সে সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার অবসর তিনি পরে পান নাই। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন বঙ্গীয় কবিদিগের জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখ প্রভাকরে ঈশ্বর গুপ্ত "প্রবোধ প্রভাকর" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১লা ভাদ্র উক্ত গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। পরে "হিতপ্রভাকর" ও "বোধেন্দুবিকাশ" নামক অপর দুইখানি গ্রন্থও মাসে মাসে "প্রভাকরে" মুদ্রিত করিয়া সমাপ্ত করেন।

"শ্রীমদ্ভাগবত" গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করিবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের বহুদিন হইতে আগ্রহ ছিল। ক্রমে তিনি উহা অনূদিত করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু মঙ্গলাচরণ ও কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ ছাড়া অধিক দূর তিনি অগ্রসর হইতে পারেন নাই। রোগের প্রবল আক্রমণে বাধ্য হইয়া তিনি শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কালরোগেই তাঁহার দেহান্ত ঘটে, কাজেই এ কার্য্যও তিনি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন। ১২৬৫ সালের মাঘমাসের মাসিক "প্রভাকর" প্রকাশিত হইবার পরই তিনি কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হন। ১০ই মাঘ রাত্রি দুই প্রহরের সময় ঈশ্বরচন্দ্র সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন।

বাঙ্গালী সাহিত্যিকবর্গের মধ্যে কবি ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম স্বীয় লেখনীর সাহায্যে জীবনোপায় সংগ্রহ করেন। সাহিত্যচর্চ্চার দ্বারা

ইনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন, সমাজে মান, সম্ভ্রম, প্রতিপত্তিও প্রভূত ছিল। উপার্জ্জিত অর্থ তিনি শুধু সঞ্চয় করিতেন না; অনেক সৎকার্য্যে তিনি অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। বাড়ীতে সদাব্রত ছিল। বহু অতিথি-অভ্যাগত নিত্য তাঁহার ভবনে আশ্রয় লাভ করিতেন। তাঁহার গৃহ হইতে অনাহারে কখনও কাহাকেও ফিরিতে হয় নাই।

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বশক্তি অসাধারণ না হইলেও তিনি খাঁটি বাঙ্গালী কবি। তাঁহার কবিতায় উচ্চশ্রেণীর আদর্শ ও কমনীয়তা লক্ষিত হয় না বটে; কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষ, তিনি নিপুণ তুলিকার আঘাতে তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন-চরিত লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, "ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি।" প্রকৃতই ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙ্গালী কবি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব তাঁহার কাব্যে কোনও ছাপ অঙ্কিত করিতে পারে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য-প্রভাব-বিমুক্ত যে বাঙ্গালী সমাজ বিদ্যমান ছিল, ঈশ্বর গুপ্ত সেই সমাজের প্রত্যক্ষদর্শী কবি ছিলেন। হাস্যরসে তাঁহার তুল্য ক্ষমতাশালী কবি বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করেন নাই। কাব্যরসের উৎস স্বতই ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় উচ্ছ্বসিত হইতে দেখা যায়। তিনি স্বভাবকবি ছিলেন। তাঁহার তীব্র বিদ্রূপ-কশাঘাতে সে সময় অনেকেই জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন। কাহারও কোনও ত্রুটি পাইলে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে মার্জ্জনা করিতেন না। তদানীন্তন বাঙ্গালী সমাজ তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন।

ঈশ্বর গুপ্তের মত প্রত্যক্ষদর্শী, পরিহাস-রসিক খাঁটি বাঙ্গালী কবি বঙ্গদেশে কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে এ বিষয়ে তিনি একচ্ছত্র সম্রাট। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণীর কবি বাঙ্গালা দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। তাঁহার রচনা প্রাঞ্জল, রসমাধুর্য্যে অনুপ্রাস লালিত্যে কল্পনার চাতুর্য্যে অতুলনীয়।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত অনেক লিখিয়াছিলেন, বহু ছড়া বাঁধিয়াছিলেন। কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া সকল কবিতাই অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে, ইহা সম্ভবপর নহে, এ পর্য্যন্ত কাহারও রচনার সে সৌভাগ্য ঘটে নাই। তবে তাঁহার রচিত অনেক কবিতা বাঙ্গালা সাহিত্যে চির-দিনের জন্য অত্যুজ্জ্বল,অপরিম্লান দীপ্তি দান করিবে। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার প্রাণের কবি—বাঙ্গালীর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের কবি। কবি নিজেই বলিয়াছিলেন :—

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,
যাঁহার প্রভায় প্রভা, পায় প্রভাকর।"

বাঙ্গালা সাহিত্যে, বাঙ্গালীর কাব্য-কুসুমোগ্যানে, ঈশ্বরচন্দ্র কোনও দিন গুপ্ত থাকিবেন না। তাঁহার যশঃসৌরভ চিরদিনই সাহিত্যাকাশকে আলোকিত করিবে।

রসরাজ অমৃতলাল সত্যই লিখিয়াছেন :—

"গুপ্ত কবি(র) লুপ্ত প্রায় রস-ভরা ছড়া।
চিনিমাখা বাণী যেন ননী দিয়ে গড়া॥"

প্যারীচাঁদ মিত্র।

বঙ্গাব্দ ১২২১, ইংরাজী ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই শ্রাবণ প্যারীচাঁদ কলিকাতায় নিমতলায় মিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ মিত্র। ইনি রাজা রামমোহন রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ইঁহাদের আদি নিবাস হুগলী জেলার পানি-সেহালা গ্রামে। প্যারীচাঁদের পিতা রামনারায়ণ সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। বাল্যকালে তদানীন্তন প্রথা অনুসারে প্যারীচাঁদ পাঠশালায় অক্ষর-পরিচয় লাভ করেন। তৎপরে পিতার আগ্রহাতিশয়ে তিনি পারস্য-ভাষা শিক্ষা করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে এই ব্যবস্থা রহিত করিয়া তাঁহাকে অধ্যয়নার্থ হিন্দু কলেজে প্রেরণ করা হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি হিন্দু কলেজে প্রবেশলাভ করেন; সেখানে প্রশংসাসহকারে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন।

পাঠ্যাবস্থায় প্যারীচাঁদ নিজের বাড়ীতে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং পল্লীর বালকগণকে তিনি নিজেই ইংরাজী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও প্রায়ই এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যাইতেন।

গণিত শাস্ত্রের প্রতি প্যারীচাঁদের মোটেই আগ্রহ ছিল না। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। সুপ্রিম কোর্টের জজ

গ্রাণ্ট সাহেব একবার একটি প্রবন্ধ রচনা করিতে দেন। প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাজা দিগম্বর মিত্রও প্রবন্ধ রচনা করেন; কিন্তু প্যারীচাঁদের রচনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় তিনিই সে পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

কলেজের পাঠ শেষ করিয়া প্যারীচাঁদ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা পব্লিক লাইব্রেরীর ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যভার পাইয়া তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। চিরদিনই তিনি পাঠানুরাগী। এক্ষণে সরকারী পুস্তকাগারের সহকারী পুস্তকাধ্যক্ষ হওয়ায় তাঁহার গ্রন্থপাঠের অবকাশ ও সুবিধা বর্দ্ধিত হইল। আপিসের নিয়মিত কার্য্যাদির পর তিনি প্রাণ ভরিয়া নানা প্রকার গ্রন্থ পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা গুণে পরিতুষ্ট হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ একাদিক্রমে তাঁহাকে সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিয়ানের পদ প্রদান করেন। এই পদেই কার্য্য করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

শৈশব হইতেই প্যারীচাঁদের মাতৃভক্তির বিকাশলাভ ঘটে। জননীর প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা ছিল যে, তাঁহাকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিতেন। প্রত্যহ মাতার পাদোদক পান না করিয়া তিনি কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। পৃথিবীতে যাঁহারা যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, সকলেরই মাতৃভক্তি অপরিসীম, ইতিহাস ইহাই প্রমাণিত করিতেছে।

জ্ঞানান্বেষণ-প্রবৃত্তি প্যারীচাঁদের প্রকৃতিদত্ত। সরকারী পুস্তকাগার হাতে পাইয়া তিনি জ্ঞান সঞ্চয় করিতে লাগিলেন; শুধু তাহাই নহে, জ্ঞান-বিতরণের স্পৃহাও তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। সংবাদপত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি জ্ঞান বিলাইতে লাগিলেন।

সতীর্থ ও বন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিকের সহিত তিনি একযোগে "জ্ঞানান্বেষণ" নামক পত্রিকা সম্পাদন করিয়া তাহাতে গবেষণা-মূলক প্রবন্ধাদি লিখিতেন। রামগোপাল ঘোষ "বেঙ্গল স্পেক্টেটার" নামক সংবাদপত্রের প্রচার করিলে প্যারীচাঁদ তাহাতেও প্রবন্ধ লিখিতেন। এই পত্রে তিনি নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ রচনা করিতেন। অন্যান্য সংবাদপত্রেও তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইত।

"কলিকাতা রিভিউ" নামক ইংরাজী পত্রে একবার প্যারীচাঁদ জমিদার ও প্রজা সম্বন্ধে একটি গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বিলাতে এই প্রবন্ধ লইয়া বিশেষ আলোচনা ঘটে। পার্লামেণ্টে কমন্স মহাসভায় এই প্রবন্ধের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

ইংরাজী সাহিত্যে প্যারীচাঁদের প্রভূত অধিকার ছিল সন্দেহ নাই। এজন্য যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। মাতৃভাষার সেবায় তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। মাতৃভাষায় প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনা করিয়া তিনি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় যখন সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শে নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য গঠিত করিয়া এক নবযুগ আনয়ন করিলেন, সে সময়ের বঙ্গ-সাহিত্য সংস্কৃতবহুল ছিল। ভাষা তাহাতে মনোজ্ঞ ও শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল বটে; কিন্তু অলঙ্কারাধিক্য উহা সাধারণ পাঠকের পক্ষে, বিশেষতঃ সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের নিকট অত্যন্ত দুর্ব্বোধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

প্যারীচাঁদ লোক-প্রচলিত সহজ কথ্য-ভাষায় "মাসিক পত্রিকা" নামক একখানি ক্ষুদ্রকায় পত্রিকা বাহির করিয়া সাধারণ পাঠকগণকে

বাঙ্গালা-সাহিত্যপাঠের রস-গ্রহণের সুবিধা করিয়া দিলেন। রমণী ও বালক যাহাতে পড়িবামাত্র বুঝিতে পারে, এমনই ভাষায় এই পত্রিকার প্রবন্ধাদি রচিত হইতে লাগিল। রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ উভয়ে এই পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। এই মাসিক পত্রিকার পাঠকবর্গ সাগ্রহে প্রতি মাসে উহার আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতেন। উহার সরল, সরস রচনা পাঠে সকলেই তৃপ্তি অনুভব করিতেন।

কিছু দিন পরে টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশিত হইল। প্যারীচাঁদ টেকচাঁদ নাম দিয়া উক্ত উপন্যাস রচনা করেন। সেইজন্য এখনও উহা টেকচাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল" নামে প্রসিদ্ধ। প্যারীচাঁদ এই উপাদেয় উপন্যাস রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। টেকচাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল" ও কুমারখালীর হরিনাথ মজুমদারের রচিত "বিজয়-বসন্ত" বাঙ্গালায় প্রথম উপন্যাস। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে কোনও উপন্যাস রচিত হয় নাই। "আলালের ঘরের দুলাল" অত্যন্ত সহজ, সরল কথ্য-ভাষায় রচিত। ইহাতে বঙ্গসাহিত্যে একটা নূতন যুগের সৃষ্টি হইয়াছিল। কোনও গ্রন্থের ভাষা যদি গাম্ভীর্য্যহীন হইত, তবে সে সময়ে সেই গ্রন্থের ভাষাকে "আলালী ভাষা" আখ্যা প্রদান করা হইত। প্রকৃতপক্ষে এই "আলালী ভাষা" হইতেই বঙ্গসাহিত্যের গতি ভিন্নপথে পরিচালিত হইয়াছিল। কিছু-কাল পরে এ ভাষার প্রভাব রহিল না বটে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রের ভাষারও পরিবর্ত্তন ঘটিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে দুই শ্রেণীর ভাষা ভাঙ্গিয়া অপূর্ব্ব বেগশালিনী, কলনাদিনী উচ্ছ্বাসময়ী ভাষা-ভাগীরথী বঙ্গ-সাহিত্যের মাঠ-প্রান্তর, পল্লী-নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে প্যারীচাঁদ, "অভেদী", "যৎকিঞ্চিৎ", "বামাতোষিণী", "রামারঞ্জিকা"," আধ্যাত্মিকা", "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়" ও "গীতাঙ্কুর" প্রভৃতি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থে কিন্তু তিনি "আলালী ভাষার" ব্যবহার করেন নাই। বরং এ সকল গ্রন্থে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাই ব্যবহার করিয়াছিলেন। গ্রন্থগুলি সর্ব্বপ্রকারে সুখপাঠ্য ও গবেষণামূলক। প্যারীচাঁদ "রস্তমজী কাওয়াসজীর জীবন-চরিত" ও আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পাদরী লং সাহেব প্যারীচাঁদকে "বাঙ্গালার ডিকেন্স" আখ্যা দিয়াছিলেন।

প্যারীচাঁদ খড়দহনিবাসী প্রসিদ্ধ প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী বামাকালীও সুশিক্ষিতা ছিলেন। অধ্যয়নে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। শুনা যায় যে, পত্নীর আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় প্যারীচাঁদ "আলালের ঘরের দুলাল" রচনা করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ এই অশেষ গুণবতী পত্নীর বিয়োগ-যন্ত্রণা অনুভব করেন। পত্নী-বিয়োগে তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তিনি প্রেততত্ত্বের আলোচনায় অবহিত হন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রেততত্ত্বসংক্রান্ত বহু দীর্ঘ প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছিলেন। আমেরিকার বোষ্টন নগরের থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ের তিনি একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হন। প্রেততত্ত্ব আলোচনায় তিনি দুর্ব্বিষহ পত্নীশোক কতকটা বিস্মৃত হইতে পারিয়াছিলেন।

প্যারীচাঁদ শুধু সাহিত্যসাধনা লইয়াই ছিলেন না; সরকারী কার্য্য করিতে করিতেই তিনি তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও কালাচাঁদ

শেঠের সহিত ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি উক্ত ব্যবসায়ের অংশী ছিলেন। চাকরী পরিত্যাগের পর তিনি ব্যবসায়ে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করেন। তাহার ফলে লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে অচলা হইলেন। চারিদিক্ হইতে প্রভূত ধনাগম হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি স্বয়ং স্বতন্ত্র ব্যবসায় খুলিয়া দিলেন; কালাচাঁদ ও তারাচাঁদের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া নিজের ব্যবসায়ের উন্নতি-চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাঁহার যশোরাশি চারিদিকে বিস্তৃত হইল। প্যারীচাঁদ বহুসংখ্যক চা-কোম্পানীর ও যৌথ-কারবারের ডিরেক্টার হইয়াছিলেন। লর্ড ডালহউসীর শাসনকালে পুলিশ-সংস্কার উদ্দেশ্যে বড়লাট একটি কমিশন বসান। বহু সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তি এই কমিশনে সাক্ষ্য প্রদান করেন। প্যারীচাঁদও সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তিনি পুলিশের নানাপ্রকার গুরুতর দোষের কথা নির্ভীকভাবে কমিশনের গোচর করেন। ইহার ফলে বহুসংখ্যক পুলিশ-কর্ম্মচারী অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় তাঁহাদের কর্ম্ম যায়। প্যারীচাঁদের এই নির্ভীকতা দর্শনে সকলেই তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

সে সময়ে কলিকাতায় যতগুলি সভা-সমিতি ছিল, প্যারীচাঁদ প্রত্যেকটির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিনি বেঙ্গল কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই সময়ে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় জীবক্লেশ-নিবারণের জন্য দুইখানি বিল পেশ করেন। প্যারীচাঁদ অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, জষ্টিস্ অব্ দি পীস ও সিনেটের সদস্যও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি যাবতীয় সভা-সমিতির সভ্য, সম্পাদক অথবা সভাপতি হইয়াও কোনটির

কার্য্যে অমনোযোগী ছিলেন না। তাঁহার পরিশ্রম করিবার অসাধারণ সামর্থ্য এবং ইচ্ছা ছিল। প্রত্যেক সভা-সমিতির নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে কোনও দিন তিনি শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই।

পত্নীবিয়োগের পর হইতেই প্যারীচাঁদ কিছু বিমনা হইয়া পড়েন। প্রেততত্ত্ব আলোচনায় কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিয়া তিনি উক্ত বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রেততত্ত্বসম্বন্ধে তিনি যে কত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা হয় না। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ম্যাদাম ব্লাডাভস্কি ও কর্ণেল অল্‌কট্‌ এ দেশে আসিলে তিনি তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত থিওসফিক্যাল সোসাইটীতে যোগদান করেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনায় তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না।

দীর্ঘকাল পরিশ্রমের পর পত্নীবিয়োগবিধুর প্যারীচাঁদ উদরী রোগে আক্রান্ত হইলেন। কিছুদিন রোগভোগ করিবার পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২৩শে নবেম্বর তিনি পত্নীর সহিত মিলিত হইবার জন্য পরপারে যাত্রা করিলেন।

মেটকাফ্‌ হলে তাঁহার তৈল-চিত্র সংরক্ষিত হইয়াছে। টাউনহলে প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি বিরাজিত। বন্ধুবর্গের বাহ্য শ্রদ্ধার ও প্রীতির নিদর্শন এইরূপে প্রদর্শিত হইয়া প্যারীচাঁদকে প্রত্যক্ষীভূত করা হইয়াছে। বাঙ্গালী যে কৃতজ্ঞ, ইহা তাহারই অভিব্যক্তি। বাঙ্গালী যে সাহিত্য-সেবীর প্রতি এরূপ সম্মান দেখাইতে শিখিয়াছে, ইহা আনন্দের কথা, আশার কথা। প্যারীচাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গালীর বড় সাধের, বড় গৌরবের সামগ্রী। বাঙ্গালা উপন্যাসের ইতিহাস লিখিতে গেলেই প্যারীচাঁদের নাম ও তাঁহার অমর কীর্ত্তিস্তম্ভ "আলালের ঘরের

দুলালের” উল্লেখ শ্রদ্ধা-সহকারে করিতে হইবে। বাঙ্গালার প্রথম ঔপন্যাসিকের লেখনী হইতে যে অমৃত-উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, তাহার স্নিগ্ধ ধারা চিরদিনই বাঙ্গালীর হৃদয়কে সরস করিয়া রাখিবে। কে বলে মানুষের মৃত্যু হয়? এমন কীর্ত্তি যিনি রাখিয়া যাইতে পারেন, তিনি ত অবিনশ্বর, অনাদিকালস্থায়ী। যিনি সর্ব্বক্ষণ লোকের “মনের মন্দিরে নিত্য পূজা” পাইয়া থাকেন, তাঁহার পবিত্র নাম স্মরণ করিলেও পুণ্য জন্মে। ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। এই শতাব্দীতে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষসিংহ ছিলেন। বাঙ্গালার ইতিহাসের ধারা তাঁহাদের দ্বারাই নূতন খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। এই সকল মহাপুরুষের মধ্যে—প্যারীচাঁদের আসন বড় গৌরবের, বড় আদরের। সহজ সরল কথায় কেমন করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হয়, তাহা প্যারীচাঁদই প্রথম বাঙ্গালীকে শিখাইয়াছিলেন। “আলালী ভাষা” বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ ব্যঙ্গোক্তি প্রকাশ করিলেও সে ভাষা উপেক্ষণীয় নহে। যদিও প্যারীচাঁদ পরিণামে সে ভাষা পরিণত বয়সের রচনা-সম্ভারে ব্যবহার করেন নাই, তথাপি সে ভাষাকে বাঙ্গালী শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। কারণ, উহাই বাঙ্গালায় প্রথম উপন্যাসের রসমাধুর্য্যপূর্ণ সহজবোধ্য ও সর্ব্বজনসেব্য বাঙ্গালা ভাষা।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

১২৩০ সালের ১২ই মাঘ, ইংরাজী ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী শনিবার যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন। পূত-সলিল কপোতাক্ষ নদ এই গ্রামের তিনদিক্ বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত। উত্তরকালে যিনি বাঙ্গালার মহাকবির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার শৈশবের লীলাভূমিও তেমনই প্রকৃতির মধুর সৌন্দর্য্যে বিভূষিতা ছিল। যশোহর নগর হইতে সাগরদাঁড়ি চতুর্দ্দশ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত।

মধুসূদনের পিতার নাম রাজনারায়ণ, জননীর নাম জাহ্নবী। রাজনারায়ণ ধনী পিতার কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। মান, সম্ভ্রম ও অর্থবলে সাগরদাঁড়ির দত্তপরিবার প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের জনক কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। তিনি নিজে ঘোরতর বিলাসী, দাতা ও অমিতব্যয়ী ছিলেন। সাগরদাঁড়ির দত্তবংশের সকলেই বিলাসী ও বাবু ছিলেন। উত্তরকালে পিতৃবংশের দোষগুণগুলি মধুসূদনে সংক্রামিত হইয়াছিল।

মধুসূদনের তিনটি বিমাতা ছিলেন;—শিবসুন্দরী, প্রমথময়ী এবং হরকামিনী। চারিটি পত্নী সত্ত্বেও রাজনারায়ণের প্রথমা পত্নী জাহ্নবী দাসী ব্যতীত আর কেহ সন্তানের জননী হইতে পান নাই। মধুসূদনের আরও দুইটি ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু কেহই জীবিত ছিল

না। মধুস্থদনই জননীর কোল আলো করিয়া দত্তগৃহের আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

জাহ্নবী-ঠাকুরাণী আধুনিক ভাবে শিক্ষিতা না হইলেও লেখাপড়া জানিতেন। পিতামাতার সুশিক্ষায় তিনি আদর্শ-রমণীর আসন অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত কোমল-হৃদয়া, সরলা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। পতিভক্তি, ধর্ম্মবিশ্বাস ও দানশীলতা তাঁহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। অবসরকালে তিনি রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করিতেন, মধুস্থদন মাতার কাছে বসিয়া সে সমুদয় অমৃত-কাহিনী আগ্রহভরে শ্রবণ করিতেন। নানাপ্রকার পৌরাণিক গল্পও মাতার নিকট হইতে শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে সে সকল বিষয় মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল।

প্রথমতঃ গ্রাম্য পাঠশালাতেই মধুস্থদনের বিদ্যারম্ভ হয়। গুরুমহাশয় পারস্তভাষা ভালরূপ জানিতেন। তিনি পাঠশালার পড়ুয়াদিগের নিকট নানাপ্রকার মধুর পারস্থ কবিতা স্থর সহকারে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। সেই মধুর ও সুন্দর কবিতার ঝঙ্কার শিশু মধুস্থদনের কল্পনা-রাজ্যে একটা বিচিত্র রাগিণীর সৃষ্টি করিত। তিনি সে কবিতা-গুলি কণ্ঠস্থ করিয়া স্থর-সংযোগে গান করিতেন। তাঁহার মিষ্টকণ্ঠের সে গান শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইত।

মধুস্থদন যখন আট নয় বৎসরের বালক, সে সময় তিনি স্বয়ং রামায়ণ ও মহাভারত পড়িয়া জননীকে শুনাইতেন। মাতার ন্যায় এই দুই মহাকাব্যের অধিকাংশ স্থল তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। এ সময়ে হিন্দুর দেব-দেবীর প্রতি তাঁহার একান্ত ভক্তি ছিল।

পিতার ন্যায় মধুস্থদনও বাল্যকাল হইতে কাব্য, সঙ্গীত ও আমোদ-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতের গান যখন হইত, বালক কবি বিভোর-চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন। "আগমনী" ও "বিজয়ার গান" শুনিলে তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরতধারে অশ্রুধারা নির্গত হইত। শুধু তাহাই নহে, কল্পনাশক্তি শৈশব হইতেই মধুস্থদনের মস্তিষ্কে আসন গ্রহণ করিয়াছিল। পাঠশালার সহপাঠী-দিগকে তিনি রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির গল্পাংশ শুনাইতেন; অনেক সময় নিজে রচনা করিয়া গল্পও তাহাদিগকে বলিতেন। উদ্ভাবনীশক্তি বাল্যকাল হইতেই তাঁহাতে বিকসিত হইয়া উঠিতেছিল।

অধ্যয়নে প্রগাঢ় অনুরাগ হেতু পাঠশালায় সকল ছাত্রের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া মধুস্থদন সকলকেই বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়া ফেলিয়া-ছিলেন; তাঁহার ন্যায় দুরন্ত, উচ্ছৃঙ্খল, আমোদপ্রিয়, আদরের দুলাল লেখা-পড়ায় সকলকে কি করিয়া হারাইয়া দিত, কেহ তাহা অনুমানও করিতে পারিত না।

দেশে থাকিলে পুত্রের উচ্চশিক্ষার সুবিধা হইবে না ভাবিয়া রাজনারায়ণ পুত্রকে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় লইয়া আসেন। রাজনারায়ণ তখন খিদিরপুরে বাড়ী তৈয়ার করিয়াছিলেন। সেইখান হইতেই তিনি মধুস্থদনকে হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কলেজে প্রবিষ্ট হইবার পরই বালকের অপূর্ব্ব ধীশক্তির প্রভাব সকলেই বুঝিতে পারিলেন। হিন্দুকলেজে তখন কাপ্তেন রিচার্ডস্ অধ্যাপক ছিলেন। ডিরোজিওর প্রভাব কলেজে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে তখন বিশেষরূপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। সেই আব্‌হাওয়ার মধ্যে বিলাসী,

উচ্ছৃঙ্খল, বাণীর বরপুত্র মধুসূদন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বয়স দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বৎসর হইবে।

ক্লাসের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে মধুসূদন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত হইবার পর ভূদেববাবুর সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। উভয়েই এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। সাহিত্য ও ইতিহাসে মধুসূদন অগ্রগণ্য ছিলেন; কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল না। মধুসূদন ভূদেববাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি প্রায়ই ভূদেববাবুর বাড়ী গিয়া সেখানে আহারাদি করিতেন।

অধ্যয়নে প্রবল স্পৃহা ও জ্ঞানতৃষ্ণাবশতঃ মধুসূদন সতীর্থগণের অপেক্ষা সাহিত্যে অনেক অগ্রসর হইয়া গেলেন। পঞ্চম শ্রেণী হইতে ভূদেব, গৌরদাস বসাক, শ্যামাচরণ লাহা, বঙ্কুবিহারী দত্ত ও মধুসূদন একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। এই কয়টি ছাত্রের প্রতিভায় প্রকৃতপক্ষে তখন সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

ক্লাসে ভূদেব ও মধুসূদন পাশাপাশি বসিতেন। অঙ্কশাস্ত্র মধুসূদনের নিকট বিষবৎ তিক্ত বোধ হইত। গণিতশাস্ত্র শিক্ষার সময় তিনি ক্লাসে বসিয়া ইংরাজী কবিতাপুস্তক পাঠ করিতেন, অথবা কবিতা-রচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। ভূদেব, বন্ধুর অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি অবহেলা দেখিয়া প্রায়ই তাঁহাকে উহা শিখিবার জন্য উৎসাহিত করিতেন। একদিন তিনি বলেন, "নিউটন ইচ্ছা করিলে সেক্সপীয়র হইতে পারিতেন; কিন্তু সেক্‌সপীয়র ইচ্ছা করিলে নিউটন হইতে পারিতেন না।" সেক্‌সপীয়রের নিন্দায় মধুসূদনের চিত্তে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, সেক্‌সপীয়রকে এই অপমান হইতে রক্ষা

করিবেন। তিনি গোপনে অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়নে মনোযোগী হইলেন। একদিন ক্লাসে অধ্যাপক রিজ সাহেব একটি দুরূহ অঙ্ক দিলেন। ক্লাসের কোনও ছাত্রই, এমন কি, ভূদেব পর্য্যন্ত উহা কষিতে পারিলেন না। মধুসূদন তখন শিক্ষকের অনুমতি লইয়া বোর্ডে গিয়া অবলীলাক্রমে, সহজ পদ্ধতিতে অঙ্কটি কসিয়া দিলেন। অধ্যাপক পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন। মধুসূদন বন্ধুবরকে অন্যের অশ্রাব্যস্বরে তখন বলিলেন, "কেমন, সেক্স্পীয়র ইচ্ছা করিলে নিউটন হইতে পারিতেন কি না দেখিলে! কিন্তু গণিতশাস্ত্রের সঙ্গে এই আমার শেষ সম্বন্ধ।"

আপনার শক্তিসম্বন্ধে মধুসূদনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি সতীর্থগণকে প্রায়ই বলিতেন, "আমি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি হইব। তোমরা আমার জীবন-চরিত লিখিও।" অহঙ্কারবশতঃ তিনি এ কথা বলিতেন না। তাঁহার ভিতরে প্রতিভার একটা বিরাটশক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল। তিনি সে শক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাই সরল বিশ্বাসে বন্ধুজনের নিকট সে কথা প্রকাশ করিতেন। ভূদেব একখানি পত্রে পরে লিখিয়াছিলেন, "কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অন্যূন বিশলক্ষ ছাত্রের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল ; কিন্তু মধুর ন্যায় প্রতিভা আমি আর কাহাতেও কখনও দেখিতে পাই নাই।"

মধুসূদন ছাত্রাবস্থাতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তখন মাসিক অথবা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের বাহুল্য ছিল না। মধুসূদন হস্তলিখিত একখানি পত্রিকার প্রচার করিয়া তাহাতে কবিতা লিখিতেন। সেই সময় হিন্দুকলেজের জনৈক শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র "জ্ঞানান্বেষণ" নামক একখানি কাগজ বাহির করেন। মধুসূদনের হস্তলিখিত

পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ ও কবিতা প্রভৃতি পাঠ করিয়া তিনি এমন মুগ্ধ হন যে, উহা হইতে কতকগুলি কবিতা বাছিয়া লইয়া "জ্ঞানান্বেষণে" ছাপিতে আরম্ভ করেন। মধুসূদন ইহাতে উৎসাহ পাইয়া দ্বিগুণ অধ্যবসায় সহকারে কবিতা রচনায় ও কাব্যগ্রন্থ পাঠে মন দিলেন।

হিন্দুকলেজে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে তদানীন্তন ছাত্রবর্গের মধ্যে স্বধর্ম্মে অনুরাগ অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। মধুসূদন বাল্যকাল হইতে স্বাধীন-প্রকৃতি, উচ্ছৃঙ্খলচিত্ত ও ঘোর বিলাসী ছিলেন; তদুপরি পিতামাতার আদরের দুলাল বলিয়া ব্যয়ের জন্য যথেচ্ছ অর্থও পাইতেন। ইহাতে তাঁহার বিলাসিতার মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছিল। সুরাপান প্রভৃতি নানাপ্রকার অসমসাহসিক পাপকার্য্যেও তিনি লিপ্ত হইতেন। ধূলিমুষ্টির ন্যায় তিনি অর্থব্যয় করিতেন। সুরাপান করাটা সভ্যতার পরিচায়ক, ইহা মধুসূদনের চিত্তে দৃঢ়ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। সাহেব সাজিবার দিকে তাঁহার মনের ভাবও খুব প্রবল হইয়াছিল।

পুত্র যে যথেচ্ছাচারের মাত্রা বাড়াইয়া চলিয়াছে, ইহা পিতামাতা দেখিয়াও দেখিতেন না; বরং অপরিমিত অর্থ যোগাইয়া তাহাকে এ বিষয়ে প্রকারান্তরে উৎসাহই দিতেন। তাঁহারা পুত্রের পাঠে অসাধারণ মনোযোগ ও পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, মধুসূধন কালে অসাধারণ প্রতিভাবলে দেশের মধ্যে গণনীয় ব্যক্তি হইবেন। সেজন্য তাঁহারা পুত্রের কোনও ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিতেন না।

প্রতিভার শক্তি গতানুগতিকের পথে চলে না। মধুসূদনের প্রতিভা এজন্য তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। দশজনে যাহা করিতেছে,

সাধারণ ব্যক্তি যাহা পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে, মধুসূদন তাহাতে তৃপ্তি অনুভব করিতে পারিতেন না। তাঁহার অদম্য প্রকৃতি নূতন ক্ষেত্রে, নূতন উৎসাহে, নবভাবে কার্য্য করিবার জন্য উদ্দাম হইয়া উঠিল।

ইংরাজের কাব্য, ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের বেশভূষা, আচার ব্যবহার, সমস্তই মধুসূদনের চিত্তবৃত্তিকে প্রভাবিত করিল। বিলাতে গিয়া ইংরাজীতে কবিতা লিখিয়া তিনি যশস্বী হইবেন, জীবনের সাধ পূর্ণ করিবেন, এ ইচ্ছা অনেক দিন হইতেই তাঁহার মনে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার সময় মধুসূদনের বিবাহের প্রস্তাব হয়। পিতামাতা একটি সুন্দরী কন্যা নির্ব্বাচন পূর্ব্বক পুত্রের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মধুসূদন এ সংবাদে একেবারে দমিয়া গেলেন। কোথায় তিনি বিলাতে গিয়া মেম বিবাহ করিবেন, না রক্তাম্বরপরিহিতা, অষ্টমবর্ষীয়া, চন্দন-চর্চ্চিতা একটি বালিকা আসিয়া তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে! নোলকপরা বাঙ্গালীর মেয়ে তাঁহার জীবন-সঙ্গিনীর কথনই যোগ্যা নহে। কর্ত্তব্য স্থির করিয়া মধুসূদন মাতাকে তাঁহার মনের অভিপ্রায় জানাইলেন। পিতাও শুনিলেন; কিন্তু তিনি নিরস্ত হইলেন না; ভাবিলেন, বিবাহ হইলেই পুত্রের মতি-গতি ফিরিয়া যাইবে।

মধুসূদন পিতার অভিসন্ধি বুঝিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। তিনি পলায়নের পরামর্শ করিতে লাগিলেন; বিলাতে পলাইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন; কিন্তু টাকা কোথায়? মধুসূদন অগত্যা খৃষ্টান মিশনরীদিগের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা সম্ভ্রান্ত বংশের শিক্ষিত হিন্দুসন্তানকে

খৃষ্টান করিবার সুযোগ পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পাদরীরা তাঁহাকে এমন ভাবে আশাও দিলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যীশুর ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহারা তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইবার সুবিধা করিয়া দিবেন। মেমের সহিত বিবাহ হইতেও বাধা জন্মিবে না। মধুসূদন সরলচিত্ত, সংসারের কুটিলতার কোনও সংবাদ রাখিতেন না। তিনি খৃষ্টান পাদরীদিগের আপাতমধুর আশ্বাসবাক্যে মুগ্ধ হইলেন; গৃহ ত্যাগ করিয়া গোপনে কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কলিকাতায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। মধুর সন্ধান মিলিল না।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মধুসূদন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। মধুসূদন অতঃপর মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামে পরিচিত হইলেন।

ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করায় পিতা-মাতা বাধ্য হইয়া তাঁহার সহিত সকল সামাজিক সংস্রব ত্যাগ করিলেন। প্রথমতঃ মধুসূদনকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্বধর্ম্মে আনিবার জন্য তাঁহারা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু মধুসূদন সে পথে গেলেন না। হিন্দুকলেজে অহিন্দুর পাঠের অধিকার ছিল না। অগত্যা তিনি বিশপস্ কলেজে ভর্ত্তি হন। পিতা রাজনারায়ণ তাঁহাকে পড়ার খরচ দিতে লাগিলেন। একমাত্র সন্তান বিধর্ম্মী হওয়ায় পিতা-মাতার হৃদয়ে কিরূপ প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। মাইকেল অতঃপর পূরামাত্রায় সাহেবীভাবে বিশপস্ কলেজে পড়িতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি গ্রীক্ ভাষা উত্তমরূপে শিখিতে থাকেন। ক্রমে লাটিন, ফরাসী, হিব্রু, জর্ম্মণ

প্রভৃতি ভাষাও আয়ত্ত করেন। এই কলেজে তিনি ১৮৪৩ হইতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলেন। এই সময়ে আচারে ব্যবহারে কথায় সর্ব্ব বিষয়ে তিনি পূরামাত্রায় সাহেব সাজিয়া ছিলেন।

পিতা পুনরায় তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্ম ত্যাগ করিবার জন্য বলিলেন; কিন্তু মধুসূদন কোনও মতেই পিতার কথায় সম্মত হইলেন না। তখন পিতা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পুত্রের আশা ছাড়িয়া ছিলেন; খরচ পত্র দেওয়াও বন্ধ করিয়া দিলেন।

এদেশে যাহা কিছু পঠিতব্য ছিল, মধুসূদন সবই শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। তখন বঙ্গদেশ ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। হস্তে অর্থ নাই, আত্মীয় বন্ধু সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন—মধুসূদন চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। যে সকল খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিবেন বলিয়া আশা দিয়া ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তখন গা-ঢাকা দিলেন। মধুসূদন উপায় না দেখিয়া পড়ার কতকগুলি বই বিক্রয় করিয়া মান্দ্রাজ গমন করেন। সেখানে গিয়া অর্থের জন্য তাঁহাকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইল। নিজের উদরান্নের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিবার এইবার প্রয়োজন ঘটিল।

পাণ্ডিত্যের প্রভাবে তিনি তত্রত্য কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রচনার দিকেও তাঁহার মন প্রধাবিত হইল। ইংরাজের সম্পাদিত কতকগুলি সংবাদপত্রেও ক্রমে তাঁহার রচনা বাহির হইতে লাগিল। তখন তাঁহার বয়স প্রায় চব্বিশ বৎসর মাত্র।

রেবেকা ম্যাক্‌টাভিস্‌ নাম্নী কোনও ইংরাজ যুবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। সংসার পাতাইয়া মাইকেল কাব্য আলোচনায় অগ্রসর

হইলেন। এই সময় "The Captive Lady" নামক একখানি পদ্য গ্রন্থ ইংরাজীতে রচনা করেন। সংযুক্তার আখ্যান লইয়াই মধুসূদন এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিত্বশক্তি ও ইংরাজী ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া সকলেই এই নবীন কবির যশোগান করিতে লাগিল।

মহামতি বীটন প্রমুখ ইংরাজগণ মধুসূদনকে জানাইলেন যে, ইংরাজী পদ্য গ্রন্থখানি চমৎকার হইয়াছে সত্য; কিন্তু ইংরাজী ভাষায় যেমন উৎকৃষ্ট কাব্যই রচনা করুন না কেন, তাহাতে তাঁহার যশঃ ও অর্থ কিছুই হইবে না। তৎপরিবর্ত্তে তিনি যদি মাতৃভাষায় কাব্য রচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্যপ্রতিভার যথার্থ সমাদর ঘটিবে। বীটন সাহেবের এই উপদেশ মাইকেলের চিত্তক্ষেত্রে ভাবান্তর ঘটাইল। তিনি উহার সারবত্তাও উপলব্ধি করিলেন; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা দূরে থাকুক, চর্চ্চার অভাবে তিনি বাঙ্গালায় চিঠি পত্রাদি পর্য্যন্ত লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার করিল। তিনি অবসরকালে সংস্কৃত প্রভৃতি নানা ভাষা আয়ত্ত করিতে লাগিলেন।

স্কুল মাষ্টারী করিয়া ও সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া তিনি যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে সংসারের সকল অভাব দূরীভূত হইত না। নানাপ্রকার অশান্তি ঘটিতে লাগিল। ক্রমে পত্নীর সহিত নানা বিষয় লইয়া তাঁহার অসদ্ভাব ঘটিতে লাগিল। শেষে বিরক্ত হইয়া তিনি পত্নীর সহিত সকল সংস্রব ছিন্ন করিলেন। তার পর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষের কন্যা হেনরিয়েটা নাম্নী ইংরাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

সেই সময়ে তাঁহার পিতা-মাতা উভয়েই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। পিতার ত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি জ্ঞাতিগণ গ্রাস করিয়াছেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি অকূল সমুদ্রে পড়িলেন। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। নিরাশ্রয় সহায়-বিহীন মধুসূদন চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। এ সময় তাঁহার অকৃত্রিম সুহৃদ গৌরদাস বসাক তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। তাঁহারই চেষ্টায় মধুসূদন কলিকাতা পুলিস আদালতে দোভাষীর কার্য্য পাইলেন। তাহারই আয়ে কায়-ক্লেশে মধুসূদনের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। এ দিকে বন্ধুবর্গের চেষ্টায় পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টাও চলিতে লাগিল।

গৌরদাস বাবু মধুসূদনকে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিতও মধুসূদনের পরিচয় ঘটিল। বাঙ্গালায় এই সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বেলগেছিয়ায় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আদেশে মধুসূদন "রত্নাবলী" নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উহা বেলগেছিয়ার রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়। মধুসূদন এই অনুবাদের জন্য পাঁচ শত টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।

মধুসূদন এই নাটক অনুবাদের সময় সংস্কৃত নাটক রচনারীতির দোষ গুণ উত্তমরূপে অনুশীলন করিতে পারিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই নব প্রণালীতে বাঙ্গালা নাটক রচনার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে সমুদিত হয়। তদনুসারে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে শর্ম্মিষ্ঠা নাটক রচনা করেন। গ্রন্থাকারে

মুদ্রিত হইয়া উহা যখন বেলগেছিয়ার রঙ্গালয়ে অভিনীত হইল, তখন মধুসূদনের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

মাতৃভাষার প্রতি তখন মধুসূদনের ভক্তিসমুদ্র উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তৎপরে প্রাচীন গ্রীস্ দেশীয় পুরাণ অবলম্বনে "পদ্মাবতী" নাটক রচনা করেন। এই নাটকে তিনি অমৃতাক্ষর ছন্দের কিছু নমুনা দিলেন। দুইখানি নাটক রচনা করায় মধুসূদনের খ্যাতি যথেষ্ট হইয়াছিল। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা।" ও "একেই কি বলে সভ্যতা" নামক দুইখানি প্রহসন রচনা করেন। এই দুইখানিই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্য অমৃতাক্ষর ছন্দে রচনা করিয়া মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দেখিতে দেন। অমৃতাক্ষর ছন্দে যে কাব্য রচিত হইতে পারে, ইহা সে সময়ে কেহই বিশ্বাস করিতেন না। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্য্যন্ত উহা অসম্ভব বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্য পড়িয়া মহারাজ যতীন্দ্রমোহন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। মাইকেলের অপূর্ব্ব প্রতিভা দর্শন করিয়া আনন্দে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তিনি আপনার ব্যয়ে কাব্যখানি মুদ্রিত করিলেন। বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দ এই কাব্যের নূতন ছন্দ, নূতন ভাব ও ওজস্বিতা দর্শনে বিস্মিত হইলেন। মধুসূদনের কীর্ত্তি দিগন্তব্যাপিনী হইল।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে অমরগ্রন্থ "মেঘনাদ বধ" কাব্য রচিত হইল। মহাকবি বলিয়া মধুসূদনের নাম বাঙ্গালায় বিখ্যাত হইয়া গেল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যিনি "পৃথিবী" লিখিতে গিয়া "প্রথিবী" লিখিয়াছিলেন,

তিনিই বাঙ্গালার মহাকবির আসন অধিকার করিলেন। ইহার পর "কৃষ্ণকুমারী নাটক," "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" রচিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্য-রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়া দিল।

ইতিমধ্যে মোকদ্দমা করিয়া তিনি পৈতৃক সম্পত্তি ফিরিয়া পাই-লেন। সে সময় সম্পত্তি হইতে ও গ্রন্থ বিক্রয়ের ফলে যে অর্থ তিনি পাইতেন, তাহাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে তাঁহার চলিয়া যাইতে পারিত; কিন্তু আত্মসংযমে তিনি কোনও দিন অভ্যস্থ ছিলেন না। বিলাস-ব্যসনে তিনি অপরিমিতভাবে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহার অভাবও ঘুচিল না। এই সময় তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন স্থির করিলেন যে, তিনি বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিষয়সম্পত্তির ভার তাঁহার পিতার আমলের পুরাতন কর্ম্মচারী মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে অর্পণ করিয়া স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিয়া সেই বৎসর জুন মাসে তিনি বিলাত যাত্রা করিলেন।

কর্ম্মচারীর উপর নির্দ্দেশ ছিল যে, সে মাসে মাসে তাঁহাকে টাকা পাঠাইয়া দিবে। কিন্তু ধূর্ত্ত কর্ম্মচারী তাঁহাকে টাকা পাঠান দূরে থাকুক, কলিকাতাস্থিত তাঁহার স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণের টাকাও বন্ধ করিয়াছিল।

মধুসূদন বিলাতে গিয়া অর্থকষ্টে বিব্রত হইলেন। এ দিকে তাঁহার পত্নীও খরচের টাকা না পাইয়া অবশেষে অপগোণ্ড শিশু দুইটিকে লইয়া তাঁহার নিকট বিলাতে চলিয়া গেলেন। মধুসূদনের বিপদের মাত্রা

বাড়িল। দারুণ অর্থকষ্টে তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি দয়ার অবতার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পত্রযোগে সকল বিবরণ লিখিয়া অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্য্যাপ্ত অর্থ পাঠাইয়া তাঁহাকে সে যাত্রা রক্ষা করিলেন।

এমন দুর্দ্দিনের মধ্যেও মধুসূদনের "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" রচিত হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে মধুসূদন ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। বিদ্যা-সাগর মহাশয় তাঁহার জন্য বাড়ী সাজাইয়া ব্যারিষ্টারী করিবার যাবতীয় আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টে তিনি ব্যারি-ষ্টার হইলেন। প্রথমতঃ তাঁহার খুবই পসার প্রতিপত্তি হইল। মাসিক দেড় হাজার দুই হাজার টাকা উপার্জ্জনও হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি জন্মাবধি স্বভাব কবি, ব্যবহারাজীবের কার্য্যে তাঁহার আসক্তিও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। তাঁহার প্রকৃতিতে ব্যারিষ্টারী বুদ্ধির আদৌ স্থান ছিল না। কাজেই ক্রমে তাঁহার পশার কমিয়া আসিতে লাগিল। ব্যবহারাজীবের কার্য্যে কোনও মতেই তাঁহার আস্থা ছিল না।

উপার্জ্জন কমিয়া গেল, কিন্তু ব্যয় কমিল না। সুরাপানের মাত্রাও বাড়িয়া গেল। ক্রমে ঋণ বাড়িতে লাগিল। ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া তিনি কিছু দিনের জন্য চাকরী গ্রহণ করেন। এই সময় "হেক্টর বধ" "মায়া কানন" ও শিশুপাঠ্য কবিতাবলী রচনা করিয়া তিনি অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করেন।

ঋণ বাড়িতে লাগিল। উত্তমর্ণগণের তাগাদায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। বন্ধু-বান্ধবগণ যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু

আজীবন উচ্ছৃঙ্খল ও অমিতাচারী কবির দৈন্যদশা কোনও মতেই ঘুচিল না। এই সময় তিনি কিছু দিনের জন্য উত্তরপাড়ায় গিয়া অবস্থান করেন।

জজ দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের চেষ্টায় ও সাহায্যে মধুসূদন কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার বিবাহ দিয়াছিলেন। উত্তরপাড়ায় অবস্থান কালে কবির দুঃখ-দুর্দ্দশা চরম সীমায় উঠিয়াছিল। তিনি ও তাঁহার পত্নী উভয়েই সে সময়ে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। অগত্যা পত্নী হেনরীয়েটাকে কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার আলয়ে রাখিয়া তদীয় বান্ধবগণ মধুসূদনকে কলিকাতা লইয়া আসেন। মধুসূদন তখন আলিপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পত্নীর সহিত তাঁহার আর দেখা হয় নাই। হেন্‌রীয়েটা পূর্ব্বেই জীবন ত্যাগ করেন। রোগশয্যায় শয়ন করিয়া মধুসূদন সে সংবাদ পান। মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি তাঁহাকে দেখিতে যান। তিনি শিশু-পুত্র এলবার্ট নেপোলিয়নের ভার মনোমোহনের উপর অর্পণ করেন। মনোমোহন সে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। মহাকবির পুত্রকে লেখা-পড়া শিখাইয়া উত্তরকালে মানুষ করিয়া দিয়াছিলেন।

পত্নীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিন দিবস পরে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন রবিবার বেলা ২টার সময় বাঙ্গালার অমর কবি, প্রতিভার অপূর্ব্ব অবতার মধুসূদন সর্ব্বদুঃখ-যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অনন্ত পথে যাত্রা করেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের প্রযত্নে সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে মধুসূদনের দেহ যেখানে সমাহিত হইয়াছিল, তাহার উপর

একটি মর্ম্মরবেদী নির্ম্মিত হয়। মাইকেলের স্বলিখিত "দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব এ বঙ্গে" নামক কবিতাটি বেদীমূলে উৎকীর্ণ আছে।

মধুসূদনের অক্ষয় কীর্ত্তি "মেঘনাদ বধ" কাব্য ব্যতীত নিম্নলিখিত কাব্য, নাটকাদি তিনি রচনা করিয়াছিলেন ;—

"তিলোত্তমা-সম্ভব," "ব্রজাঙ্গনা," "বীরাঙ্গনা," "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী," "শর্ম্মিষ্ঠা," "কৃষ্ণকুমারী," "পদ্মাবতী," "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ," "একেই কি বলে সভ্যতা," "হেক্টর বধ," মায়াকানন," "শিশু পাঠ্য কবিতাবলী।"

এতদ্ব্যতীত তিনি "সিংহল বিজয়," "বিষণা ধনুর্গুণ" নামক দুই খানি কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বহু সংখ্যক কবিতাবলীও অপ্রকাশিত ভাবে ছিল। ক্রমে ক্রমে "অপ্রকাশিত কবিতাবলী" বাহির হইতেছে।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকাগারে মাইকেলের স্বহস্ত লিখিত "তিলোত্তমা সম্ভব" কাব্যের পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষিত আছে।

কাব্যকাননের কলকণ্ঠ কোকিলের, মধুর স্বরলহরী অকালে থামিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যবশতঃ অসময়ে মধুসূদন পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন। প্রতিভার অবতার বাণীর বরপুত্র অত্যল্প কালের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যভাণ্ডারে যে মহামূল্য রত্নরাজি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় ও অপূর্ব্ব প্রভাময় হইলেও বাঙ্গালীর সাধ তাহাতে মিটে নাই। মধুসূদনের নিকট মাতৃভাষা আরও অনেক পাইবার আশা করিয়াছিলেন। যে প্রতিভার অধিকারী হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সম্যক্ বিকাশ তখনও হয় নাই। বিশ্বসাহিত্যের রত্ন

সিংহাসনে যাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকার ছিল, তিনি তাহার উপযোগী অধিক সংখ্যক মহাকাব্য রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, এ দুঃখ বাঙ্গালীর চিরদিন থাকিবে। আবাল্যের অসংযম ও অমিতাচার তাঁহাকে অসময়ে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে, নহিলে "রত্নহারা রাজেন্দ্রাণী" রূপে মাতৃভাষার কি অপূর্ব্ব শোভা হইত, তাহা কল্পনাও করা যায় না। সারাজীবন বিজাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াও এই অপূর্ব্ব শক্তিধর মহাকবি কালে যেরূপ প্রগাঢ় দেশ-ভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, মাতৃভাষার প্রতি নিষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বিচিত্র, মহান্ ও পবিত্র। বিলাত যাত্রাকালে "বঙ্গভূমির প্রতি" শীর্ষক কবিতায় দেশ-প্রীতির কি গভীর নিষ্ঠার পরিচয় মধুসূদন দিয়া গিয়াছেন। ভাব-সম্পদে, ভাষার ঐশ্বর্য্যে, কাব্য কলার ললিত বিলাস ও ছন্দের লীলায়িত গতিতে "মেঘনাদ বধ" মহাকাব্য বঙ্গভাষার কোহিনুর। এমন মহাকাব্য বাঙ্গালায় দ্বিতীয় নাই, কখনও হইবে কি না কে জানে। যে মহাকবি এমন কাব্যৈশ্বর্য্য বাঙ্গালীকে দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান বাঙ্গালী জাতি করিতে পারে নাই। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণ হারাইয়াছিলেন, এ কলঙ্ক বাঙ্গালী কখনও স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। সার্কুলার রোডের উপরস্থিত সমাধিক্ষেত্রে, কবির সমাধিপ্রস্তরস্তম্ভের কাছে আসিলে মহাকবির লেখনী নিঃসৃত "দাঁড়াও পথিকবর! জন্ম যদি তব এ বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণ-কাল এ সমাধিমূলে" এই উৎকীর্ণ রচনাটি বাঙ্গালীর দৃষ্টিগোচর হইবা-মাত্র শ্রদ্ধায় তাহার মস্তক অবনত হইবেই। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইবে, কবে মাইকেলের স্মৃতিরক্ষার জন্য বাঙ্গালী মর্ম্মরমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া

কৃতজ্ঞতার ঋণ কিয়ৎপরিমাণে শোধ করিবে। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের মৃত্যুতে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহার সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে হয়, বাঙ্গালায় মাইকেলের মত মহাকবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া আশা হয়, এ দেশ আবার জাগিবে, আবার জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখায় বিশ্ববাসীকে আলোকিত করিবে। সে আশা মিথ্যা নহে, সে আশা দুরাশা নহে, বাঙ্গালীর সাহিত্য ভাবে ও ভাষার সৌন্দর্য্যে লোক বিমোহন হইয়া উঠিতেছে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ, ইংরাজী ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার, হুগলি জেলার অন্তর্গত গুলিটা নামক গ্রামে হেমচন্দ্র মাতামহালয়ে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জননীর নাম আনন্দময়ী। কৈলাসচন্দ্রের বংশ-মর্য্যাদা যথেষ্ট ছিল; কিন্তু অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। উত্তরপাড়ায় একটি সামান্য ও সাধারণ বাসভবন ছাড়া তাঁহার অন্য কোনও পৈতৃক সম্পত্তি ছিল না। হেমচন্দ্রের মাতামহ রাজচন্দ্র চক্রবর্ত্তীও ধনী ছিলেন না, তবে জামাতাকে নিজগৃহে রাখিয়া সযত্নে পুত্রনির্ব্বিশেষে লালন-পালন করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। তাঁহার আরও তিনটি সহোদর ও দুই সহোদরা ছিলেন। সহোদরত্রয়ের নাম যথাক্রমে, পূর্ণচন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র। সহোদরা যুগলের নাম, বসন্তকালী ও নৃত্যকালী। হেমচন্দ্রের মধ্যম সহোদর পূর্ণচন্দ্র উত্তরকালে বারাণসী ধামে যশঃ ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া উৎকৃষ্ট চিকিৎসক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র অকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। কনিষ্ঠ ঈশানচন্দ্র হুগলি কালেক্টরিতে কার্য্য করিতেন, পরিশেষে হাই-কোর্টে, চাকরি পাইয়াছিলেন। সুকবি বলিয়া ইনিও উত্তরকালে প্রতিপত্তি লাভ করেন। "যোগেশ" কাব্যে ঈশানচন্দ্রের কবিযশঃ সমুচ্চ সীমায় উঠিয়াছিল।

বাল্যকালে হেমচন্দ্র গুলিটা গ্রামে মাতামহালয়ে থাকিয়া তত্রত্য গ্রাম্য পাঠশালায় নয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অল্পবয়স হইতেই তিনি ধীর প্রকৃতি শান্ত এবং পাঠে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্ত হইলে হেমচন্দ্রের মাতামহ তাঁহাকে খিদিরপুরস্থিত ভবনে লইয়া আসেন এবং তত্রত্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করাইয়া দেন। কিছু বাঙ্গালা ও শুভঙ্করী শিখিয়া হেমচন্দ্র যখন উচ্চতর শিক্ষার জন্য লালায়িত, সেই সময় তাঁহার মাতামহ রাজচন্দ্র ভবলীলা সাঙ্গ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে পারিবারিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্রের পিতা কোনও কাজ-কর্ম্ম করিতেন না। সেই সময় পণ্ডিত-প্রবর প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী খিদিরপুরে বাস করিতেন। তিনি তখন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক। হেমচন্দ্রেব জননী প্রসন্নকুমারের শরণাপন্ন হইলে তিনি কিশোরবয়স্ক হেমচন্দ্রকে স্বয়ং ইংরাজী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। অত্যল্পকালের মধ্যে প্রতিভাবান হেমচন্দ্র পাঠে দক্ষতা প্রদর্শন করায় প্রসন্নকুমার তাঁহাকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতে থাকেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক দশ টাকা করিয়া বৃত্তিলাভ করেন। এই বৃত্তির টাকায় দরিদ্র পরিবারের আংশিক দুঃখ দূরীভূত হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্র সিনিয়র পরীক্ষা প্রদান করেন। বৃত্তিলাভ করিতে পারিলে সংসারের কষ্ট কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইতে পারিবে ভাবিয়া হেমচন্দ্র এ সময় অক্লান্তভাবে রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক

অধ্যয়ন করিতেন। পরিশ্রমের পুরস্কার আছে। হেমচন্দ্র চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তিলাভ করেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। সেই বৎসর প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হইলে হেমচন্দ্র উক্ত পরীক্ষা প্রদান করেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে দেখা যায় যে, তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছেন। হেমচন্দ্র অতঃপর প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন; কিন্তু দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করিবার সুযোগ ও সুবিধা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার সময় তাঁহাকে কলেজ পরিত্যাগ করিতে হইল। মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি দুই বৎসর পর্য্যন্ত ছিল। উহা শীঘ্র বন্ধ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া বাধ্য হইয়া হেমচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। অর্থোপার্জ্জন না করিলে সংসার অচল। মিলিটারী অডিটর জেনারেলের আফিসে বন্ধুবান্ধবের সুপারিশে হেমচন্দ্র একটি ৩৫ টাকা বেতনের কেরাণীগিরির পদ লাভ করিলেন।

কেরাণীগিরির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেও হেমচন্দ্রের অধ্যয়নানুরাগ হ্রাস পায় নাই। গৃহে তিনি নিয়মিত পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বি-এ পরীক্ষা গৃহীত হইতেছিল। হেমচন্দ্র উক্ত পরীক্ষা প্রদানের অধিকারী ছিলেন; তিনিও অবসরকালে অধ্যয়ন করিয়া উক্ত পরীক্ষা প্রদানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষা গৃহীত হইল। হেমচন্দ্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন। কেরাণীর পক্ষে এরূপ ভাবে

সাফল্য লাভ করা অত্যন্ত গৌরবের এবং এই ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য।

ছাত্রাবস্থাতেই হেমচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। ভবানীপুরের কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এক কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয় ঘটিয়াছিল। হেমচন্দ্রের পত্নীর নাম কামিনী দেবী। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না। বুদ্ধির বিশেষ প্রাখর্য্যও তাঁহার ছিল না। তবে তিনি যেমন ধর্ম্মপরায়ণা, পতিব্রতা তেমনই সুন্দরী ছিলেন।

কেরাণীগিরি করিয়া অবশিষ্ট জীবন যাপনের অভিপ্রায় হেমচন্দ্রের কোনও দিন ছিল না। বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি নব প্রতিষ্ঠিত "কলিকাতা ট্রেণিং স্কুলের" প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। মাসিক বেতন ৫০৲ টাকা। সরকারী চাকরীতে থাকিলে হেমচন্দ্র পরিণামে পেন্সন পাইতে পারিতেন, কিন্তু স্বাধীনচেতা হেমচন্দ্র দাসত্বের নিগড়কে, বিশেষতঃ কেরাণীগিরিকে শোভনীয় ও স্পৃহনীয় বলিয়া মনে করেন নাই। "ট্রেনিং স্কুলের" প্রধান শিক্ষকপদে কার্য্য করিতে করিতে তিনি সুপ্রসিদ্ধ জমীদার ও ব্যবহারাজীব রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্রগণের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

খিদিরপুর হইতে প্রত্যহ শিক্ষকতা করিতে আসা অসম্ভব বোধে তিনি সেই সময় কলিকাতায় মেসে অবস্থান করেন এবং ব্যবস্থাশাস্ত্র অধ্যয়নে মনোযোগী হন। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও গৃহ-শিক্ষকের কর্ত্তব্য পালন করিয়া অবকাশ অতি অল্পই ঘটিত, তথাপি হেমচন্দ্র পশ্চাৎপদ হইলেন না। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতেই ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বি, এল পরীক্ষা প্রদান করিলেন। পরীক্ষার ফল

সুবিধাজনক হইল না। তিনি এল, এল উপাধি লাভ করেন। এল, এল উপাধি লাভের পর তিনি শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিলেন। রমাপ্রসাদ হেমচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার উপদেশে হেমচন্দ্র মুন্সেফী পদের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। একশত টাকা বেতনে তিনি প্রথমতঃ শ্রীরামপুরে পরে হাবড়ায় মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু চাকরী তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। দীর্ঘকাল দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক। সুদূর প্রবাসে মুন্সেফী কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে যাইতে দিতে জননী আপত্তি প্রকাশ করায় মাতৃভক্ত হেমচন্দ্র কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১৯শে মার্চ্চ তারিখে হেমচন্দ্র হাইকোর্টের উকীলশ্রেণীতে নাম লিখাইয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। নবীন ব্যবহারাজীবকে প্রায়ই জীবন-সংগ্রামে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়া থাকে। কিন্তু হেমচন্দ্রকে সে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। সেই সময়ে Norton's Law of Evidence" ইংরাজী আইন-বিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গালায় অনূদিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। হেমচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাকেই উক্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। হেমচন্দ্র এই অনুবাদ ব্যাপার হইতে পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা পাইয়াছিলেন। এই অর্থের জন্য প্রথমতঃ হাইকোর্টে আসিয়াই তাঁহাকে অর্থকষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই। ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত নূতন নিয়মানুসারে ৩০৲ টাকা জমা দিয়া হেমচন্দ্র বি, এল উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ছাত্রাবস্থায় হেমচন্দ্রের কবিতা লেখার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। সেই সময় "চিন্তাতরঙ্গিণী" নামক তিনি একখানি কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সে সময় রঙ্গলালের "পদ্মিনী উপাখ্যান"; মাইকেলের "তিলোত্তমাসম্ভব" ও "মেঘনাদবধ" বাঙ্গালা সাহিত্য-কাননে ফুটিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালী সাধারণ পাঠক তখনও তাঁহাদের প্রকৃত সমাদর করিতে শিখে নাই। "চিন্তাতরঙ্গিণী" মুদ্রিত হইলে পর আচার্য্য কৃষ্ণকমলের চেষ্টায় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এ পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হয়।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্ত "বীরবাহুকাব্য" প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। এই গ্রন্থে, কবির দেশ-ভক্তির অঙ্কুর ও ছন্দের প্রতি অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। হেমচন্দ্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত হইয়া ক্রমশঃ যশোলাভ করিতে লাগিলেন। এ দিকে হাইকোর্টে তাঁহার পশার প্রতিপত্তিও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ রমাপ্রসাদ রায় তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে হেমচন্দ্র নিজের উন্নতি সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছিলেন। একদিন তিনি মনে এমন সংকল্পও করিয়াছিলেন যে, হাইকোর্ট ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া ব্যবহারাজীবের কার্য্য করিবেন; কিন্তু অকস্মাৎ অতর্কিতভাবে তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। রমাপ্রসাদের মৃত্যুর পর তিনি কোনও শ্বেতাঙ্গ উকীলের সহকারিভাবে কাজ করিতেছিলেন। একটি মোকদ্দমায় শ্বেতাঙ্গ উকীলটি উপস্থিত না থাকায় হেমচন্দ্রই সেই স্থলে মোকদ্দমা চালাইতেছিলেন। যুক্তি-তর্কের অবতারণাকালে তিনি এমনই

নিপুণভাবে মোকদ্দমার সম্বন্ধে নিজের মন্তব্য বিচারকের নিকট উপস্থাপিত করেন যে, তাহাতেই মোকদ্দমায় তিনি জয়লাভ করেন। এই ঘটনা হইতেই হাইকোর্টে হেমচন্দ্রের পসার-প্রতিপত্তি বাড়িতে আরম্ভ করে।

দ্বারকানাথ মিত্র তখনও হাইকোর্টের জজ হন নাই। সে সময়ে হেমচন্দ্রই হাইকোর্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল। হেমচন্দ্রকে দ্বারকানাথ অত্যন্ত ভালবাসিতেন। দ্বারকানাথের সহায়তায় হেমচন্দ্র প্রতিভাবলে হাইকোর্টে এমনই প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন যে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মাসিক দুই সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন হইতে লাগিল। হেমচন্দ্র লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই সস্নেহ দৃষ্টি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু-বান্ধব তাঁহার দ্রুত উন্নতি দর্শনে বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন।

এই উন্নতির সময় হেমচন্দ্রের পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। হেমচন্দ্র অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন। পিতার বিয়োগে তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন এবং কিছুদিন ধরিয়া নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গয়ায় গিয়া পিতৃদেবের শ্রাদ্ধাদি করিয়া তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম আলোচনার দ্বারা শিক্ষিত দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করিতে ব্যস্ত। হেমচন্দ্রের পিতৃশ্রাদ্ধাদি তাঁহার নিকট কুসংস্কার বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। উচ্চ-শিক্ষিত হেমচন্দ্রকে এরূপ "কুসংস্কারের" পক্ষপাতী হইতে দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রকাশ্যভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বাধীনচেতা, স্বদেশভক্ত, স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ হেমচন্দ্র তাঁহার এই প্রকাশ্য অসন্তোষের প্রতিবাদে কৃতসংকল্প হইয়া "Brahmis Theism in India" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ইংরাজী ভাষায় রচনা করেন। পুস্তিকাখানি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

ভূদেববাবু যখন "এডুকেশন গেজেটের" সম্পাদক, সেই সময় হেমচন্দ্রের অমৃত-নিস্যন্দিনী কবিতারাজি উক্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত। হেমচন্দ্র ভূদেববাবুর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। হেমচন্দ্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা "ভারত-বিলাপ" ও "ভারত-সঙ্গীত" ১২৭৭ সালে উক্ত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। "ভারত-সঙ্গীত" প্রকাশিত হইলে সমগ্র বঙ্গদেশে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত ভূদেববাবুর কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছিলেন। ভূদেববাবু উহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিলে সরকার বাহাদুর কবিতাটির সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য করেন নাই। এই একটি কবিতা রচনা করিয়াই হেমচন্দ্র দেশের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত আলোড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ওকালতীতে হেমচন্দ্রের এমনই প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল যে, সরকারী উকীল অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব, সুকবি হেমচন্দ্র তাঁহার স্থানে সরকারী সিনিয়র প্লীডারের পদে মনোনীত হন। সাহিত্যক্ষেত্রেও তখন হেমচন্দ্র পূর্ণ শশধর।

ইংরাজী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। কবিবর হেমচন্দ্র প্রথমাবধিই "বঙ্গদর্শনের" লেখক ছিলেন। "বঙ্গদর্শন" চারি বৎসর কাল নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে হেমচন্দ্রের সর্ব্বসমেত একাদশটি কবিতা ও একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

বন্ধুবর্গের অনুরোধে হেমচন্দ্র সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে প্রকাশিত কবিতাবলী সংগ্রহ পূর্ব্বক "কবিতাবলী" প্রথম ভাগ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে

মুদ্রিত করেন। সে সময় হেমচন্দ্র মধুসূদনের ত্যক্ত সিংহাসনে অবিসংবাদিরূপে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার বীণাধ্বনির মধুর তানে বঙ্গবাসী তখন পুলকিত, বিমুগ্ধ। কমলাসনা বীণাপাণির প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে হেমচন্দ্রের ললাট সমুজ্জ্বল। ইন্দিরাও তখন তাঁহার স্বর্ণ-ঝাঁপি খুলিয়া বঙ্গমাতার এই কৃতী সন্তানের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছিলেন। হাইকোর্টে হেমচন্দ্রের তখন অতুলনীয় প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদা।

বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র ও হেমচন্দ্র সমসাময়িক। উভয়ে একই সময়ে হাইকোর্টে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পসার ও প্রতিপত্তি রমেশচন্দ্র অপেক্ষা হেমচন্দ্রের কম ছিল না। অনেকের বিশ্বাস হেমচন্দ্রের তর্কশক্তি ও বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা রমেশচন্দ্র অপেক্ষা সমধিক ছিল। হেমচন্দ্রকে একবার বিচারকপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা হইয়াছিল, কিন্তু হেমচন্দ্র স্বাধীনতা হারাইয়া রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিশেষতঃ তাঁহার জননী উহার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বিচারপতি হইলেই অকালে প্রাণ হারাইতে হয়। বিচারপতি রমাপ্রসাদ রায়, শম্ভুনাথ ও দ্বারকানাথ মিত্র অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন। কাজেই তিনি সন্তানকে এ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দিবার কল্পনাও মনে পোষণ করিতে সম্মত ছিলেন না।

ওকালতী ব্যবসায়ের দ্বারা হেমচন্দ্র প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন সত্য, কিন্তু তিনি অর্থ-সঞ্চয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। প্রার্থী কখনও তাঁহার নিকট আসিয়া বিমুখ হইত না। বাল্যকালে দারিদ্র্যের কোলে লালিত-পালিত হইয়া তিনি দরিদ্রের দুঃখ বুঝিতেন। কাযেই অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে দান

করিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোপনে দানই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। বাহিরের প্রশংসালাভের দিকে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি ছিল না। বন্ধু-বান্ধবকে তিনি অযাচিতভাবে কত সময় নানাপ্রকারে অর্থ-সাহায্য করিতেন।

সমাজের সর্ব্বত্রই হেমচন্দ্রের অসামান্য প্রতিপত্তি জন্মিয়াছিল। সে সময় কবির গানের বাহুল্য ছিল। কবির গান উপলক্ষে উভয় পক্ষে কবিতার লড়াই চলিত। হেমচন্দ্র সেরূপ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলে প্রায়ই অনুরুদ্ধ হইয়া বিচারকের আসন গ্রহণ করিতেন। তিনি বিচার করিয়া যে পক্ষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিতেন, সেই পক্ষই জয় লাভ করিত; তজ্জন্য পরাজিত পক্ষ কখনও ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন না।

সারদার ধ্যানে তন্ময় হেমচন্দ্র ক্রমে ক্রমে "আশাকানন," "ছায়াময়ী," "দশমহাবিদ্যা," প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গালার কাব্যকুঞ্জকে রমণীয় করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

মহাকাব্য রচনা করিবার জন্য হেমচন্দ্রের হৃদয়ে একটা প্রবল আগ্রহ ছিল। "মেঘনাদ-বধের" টীকা রচনা করিবার সময় হইতেই হেমচন্দ্রের হৃদয়ে এইরূপ একখানি মহাকাব্য লিখিবার বাসনা জন্মিয়াছিল। মহাভারতে "বৃত্রসংহার" বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপেই বর্ণিত আছে। হেমচন্দ্র সেই বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া "বৃত্রসংহার"রূপ অপূর্ব্ব মহাকাব্য রচনা করেন। এই অমরকাব্যে পৌরাণিক বৃত্তান্তকে তিনি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করিয়া বহু স্থলে মৌলিক কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন। এই মহাকাব্য ১২৮১ সালে প্রকাশিত হয়। সুধী সমালোচকগণ "বৃত্রসংহারকে" "মেঘনাদ-বধের" কাব্য হইতেও উচ্চ আসন প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে এই উপাদেয় মহাকাব্যখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের অতুল্য সম্পদ্।

দীর্ঘকাল লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সেবা করিয়া হেমচন্দ্র বার্দ্ধক্যে দৃষ্টিশক্তি-হীন হন। কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করা সত্ত্বেও মুক্তহস্তে দান করার ফলে হেমচন্দ্র কপর্দ্দকমাত্র সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। এজন্য শেষবয়সে তাঁহাকে নিদারুণ অর্থকষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। এ যাবৎ তিনি কোনও দিন পুস্তকবিক্রয়-লব্ধ অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখেন নাই। দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ অন্ধ হইয়া হেমচন্দ্র কাশীধামে গমন করেন। শেষ জীবন তথায় অবস্থান করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই তিনি বিশ্বেশ্বরের চরণে শরণ লইয়াছিলেন। এতকাল পুস্তক-বিক্রয়লব্ধ অর্থ কখনও তিনি গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু দারুণ অর্থ-সমস্যায় পড়িয়া তাঁহাকে শেষে উহাও গ্রহণ করিতে হইল।

এই সময়ে তিনি "চিত্তবিকাশ" নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। নিজে মুখে মুখে বলিয়া যাইতেন, অন্যে তাহা লিখিয়া লইত। এইরূপ গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে, তিনি "চিত্তবিকাশকে" স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের তালিকাভুক্ত করাইবার জন্য কাশীধাম হইতে খিদিরপুরের বাটীতে আগমন করেন; কিন্তু কবিবরের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। দারুণ অন্ন-কষ্ট উপস্থিত হইল। হেমচন্দ্র দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া জগৎকে অন্ধকারময় দেখিতেছিলেন, অন্ন-চিন্তায় অধীর হইয়া সে অন্ধকারে কোনও কূল পাইলেন না। যিনি এত দিন সহস্র সহস্র অর্থ অকাতরে দরিদ্রের সেবায়, অভাবগ্রস্তের দুর্দ্দশা-বিমোচনে ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন, বাঙ্গালার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি অন্ধ হইয়া উদরান্নের জন্য লালায়িত, ইহা দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশেই সম্ভবে! বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবিগণ

কবিবরের দুর্দ্দশায় বিচলিত হইলেন। সকলে সমবেত হইয়া গবর্ণ-মেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। সরকার বাহাদুর তাঁহাকে মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি দান করিতে লাগিলেন। এই সামান্য বৃত্তি হেমচন্দ্রের অভাব কেমন করিয়া দূরীভূত করিবে? কিন্তু হেমচন্দ্র অগত্যা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। সাধারণ চাঁদার দ্বারাও কিছু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল।

বাঙ্গালার মহাকাব্যপ্রণেতা, হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব, অজস্র অর্থ-উপার্জ্জনকারী, পরোপকারী, মহাপ্রাণ হেমচন্দ্র ২৫৲ টাকা বৃত্তির দ্বারা কায়-ক্লেশে বাঁচিয়া রহিলেন! বাঙ্গালার শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও ধনবান্ সম্প্রদায় তাহা দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে কাল তাঁহার সকল দুঃখ-দৈন্যের অবসান করিয়া দিল। ১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ অমর কবি হেমচন্দ্র পার্থিব দুঃখ-যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। আকাশের চন্দ্র মেঘজালে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। মধুসূদনের ভেরীধ্বনির পর যাঁহার বীণারব বাঙ্গালার কাব্যকুঞ্জে অমৃতের ধারা বর্ষণ করিতেছিল—সে বীণা নীরব হইয়া গেল। কিছু কাল পরে পতি-বিয়োগবিধুরা উন্মাদিনী পত্নীও স্বামীর সহিত সাধনোচিত ধামে মিলিত হইতে গেলেন।

মহাকবি হেমচন্দ্রের রচিত গ্রন্থাবলীর নাম—(১) চিন্তাতরঙ্গিণী, (২) বীরবাহু কাব্য, (৩) আশাকানন, (৪) ছায়াময়ী, (৫) বৃত্র-সংহার, (৬) কবিতাবলী, (৭) চিত্ত-বিকাশ, (৮) দশমহাবিদ্যা, (৯) বিবিধ কবিতা, (১০) রোমিও জুলিয়েত, (১১) নলিনীবসন্ত। (১২) ভারত কবিতা, (১৩) রহস্য কবিতা, (১৪) অপূর্ব্ব কবিতা।

স্বভাবকবি হেমচন্দ্র, বঙ্গবাণীর শ্রেষ্ঠ সন্তান মহাকবি হেমচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অনলপ্রবাহপূর্ণ, ললিত শব্দবহুল কাব্যরাজি বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যে যুগান্তর আনিয়া দিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিবে। হেমচন্দ্রের ন্যায় এমন তেজঃপূর্ণ ভাষায় বাঙ্গালার কোনও কবি কাব্য রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার "ভারত-সঙ্গীত" অজর, অমরভাবে সাহিত্যের পৃষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত থাকিবে। এমন অনলস্রাবী, এমন ওজোগুণসম্পন্ন চমৎকার কবিতা সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে দ্বিতীয় আর একটি নাই। হেমচন্দ্র যদি অন্য কিছু রচনা না করিয়া শুধু "ভারত-সঙ্গীত" রচনা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তিনি চিরদিন অমর কবি বলিয়া পূজা লাভ করিতেন। হেমচন্দ্র আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। স্বজাতিবাৎসল্য তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় ছিল। স্বদেশভক্তি তাঁহার সমগ্র হৃদয়টিকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। উচ্চশিক্ষিত হেমচন্দ্র তাৎকালীন প্রথামত ইঙ্গভাবাপন্ন হন নাই। ইউরোপ অপেক্ষা ভারতবর্ষের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। বাঙ্গালার গৌরবের কথা লেখনী-সাহায্যে রচনা করিতে তাঁহার যে আগ্রহ প্রকাশ পাইত, তাঁহাতেই তাঁহার হৃদয়ের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। মধুসূদনের মৃত্যুতে কবিসিংহাসন যখন শূন্য হয়, তখন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' পাদটীকায় লিখিয়াছিলেন, "বঙ্গ-কবি সিংহাসন শূন্য হয় নাই। * * * * হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সু-কবিশূন্য বলিয়া আমরা রোদন করিব না।" দরিদ্রের সন্তান হেমচন্দ্র দারিদ্র্য-দুঃখ সহ্য করিয়া মানুষ হইয়াছিলেন, ইন্দিরার প্রসন্ন দৃষ্টিলাভে ধন্য হইয়াছিলেন; কিন্তু

জীবন-সায়াহ্নে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া তাঁহাকে রাজানুগ্রহের ভিখারী হইতে হইয়াছিল। একদিন তিনি লিখিয়াছিলেন, "যে জন সেবিবে তোমার চরণ সেই সে দরিদ্র হ'বে!" এই বাণী হেমচন্দ্রের নিজের জীবনে শেষদশায় অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছিল। মহাকবির মহাবাণী কি এমনই করিয়া নিজের জীবনে ফল প্রসব করিয়া থাকে? হেমচন্দ্র বাঙ্গালার মহাগৌরবের পাত্র, বাঙ্গালী এই মহাকবির অপূর্ব্ব দান মাথায় ধারণ করিয়া পবিত্র হইয়াছে। সমগ্র বাঙ্গালী জাতি চিরদিন, গভীর কৃতজ্ঞ হৃদয়ে হেমচন্দ্রের রচিত কাব্য-সুধাপানে পরিতৃপ্ত হইবে। হেমচন্দ্রের পর বহু কবি বাঙ্গালায় আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু এমন উন্মাদনাময় ভাষায় আর কেহ কাব্য রচনা করিতে পারিলেন না। তাঁহার বীণার ঝঙ্কার কখনও তরঙ্গভঙ্গবহুল সমুদ্রগর্জ্জনবৎ ভীষণ, গম্ভীর এবং হৃদয়োন্মাদময়, আবার কখনও কলনিনাদিনী ললিতনৃত্য-পরায়ণা তটিনীর ন্যায় সুমধুর। প্রত্যেক গীতি-কবিতায় এমন একটা ওজস্বিতা আছে—যাহা অন্যত্র দুর্লভ। জাতীয় মহাকবির আসন হেমচন্দ্রের ন্যায় কবির জন্যই নির্দ্দিষ্ট। এমন কবি না হইলে একটা জাতিকে কেহ উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারে না; হেমচন্দ্রের আসন এজন্য চিরকাল স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। তাঁহার সারা জীবনের তপস্যার ফল বাঙ্গালী জাতি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়া যে দিন ধন্য হইবে, সেই দিন এই মহাকবির যোগ্যতর সমাদর হইবে। এখনও সমগ্র বাঙ্গালীজাতি হেমচন্দ্রের কাব্য-প্রতিভার উপযুক্ত সমাদর করিতে পারে নাই। ইহা কবির দোষ নহে, জাতির দুরদৃষ্ট।

রমেশচন্দ্র দত্ত।

কলিকাতার রামবাগানের দেশপ্রসিদ্ধ দত্তবংশে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট তারিখে মাতুলালয়ে রমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ঈশানচন্দ্র, পিতামহের নাম পীতাম্বর দত্ত। রামবাগানের দত্ত-বংশের সকলেই সুশিক্ষিত ও সাহিত্যরসিক। রমেশচন্দ্র পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম যোগেশচন্দ্র, কনিষ্ঠের নাম অবিনাশচন্দ্র। এতদ্ব্যতীত রমেশচন্দ্রের আরও দুইটি সহোদরা জন্মগ্রহণ করেন।

চারি বৎসর বয়ঃক্রমকালে রমেশচন্দ্রের হাতেখড়ি হয়। জ্যেষ্ঠ সহোদরের সঙ্গে তিনি পল্লীর এক পাঠশালায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তৎপরে কোনও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে কিছুকাল পড়িয়া দুই সহোদর একত্রে হেয়ার স্কুলে প্রবিষ্ট হন। রমেশচন্দ্র বাল্যকালে পিতার নিকট দীর্ঘকাল থাকিতে পান নাই, কারণ, তাঁহার পিতা ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন। কাজেই দেশ-বিদেশে রাজকর্ম্মোপলক্ষে তাঁহাকে প্রায়ই বদলী হইতে হইত। রমেশচন্দ্র উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হইবার পর কলিকাতায় পিতৃব্য শশিচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত লেখাপড়া শিক্ষা করিতে থাকেন। উচ্চশিক্ষিত পিতৃব্যের সাহায্যে রমেশচন্দ্রের চরিত্র সুগঠিত হয়।

লেখাপড়ায় রমেশচন্দ্রের আন্তরিক যত্ন ও আগ্রহ ছিল। তিনি প্রায়ই অবকাশকালে বাড়ীতে থাকিতেন; কাহারও সহিত বড় একটা মিশিতেন না; সর্ব্বদা পাঠগৃহে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। বাল্যকালে যতদিন পিতার সঙ্গে ছিলেন, ততদিন তিনি ভাগলপুর, বীরভূম, কুমারখালি, পাবনা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি নানাস্থান দর্শন করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন।

রমেশচন্দ্রের পিতা ঈশানচন্দ্রের একটি পুরাতন ভৃত্য ছিল। তাহার নাম যুধিষ্ঠির। যে মনিবপুত্র দুইটিকে পরম যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিত। যখন তাঁহারা দেশভ্রমণে যাইতেন, সেও ছায়ার ন্যায় তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইত। বাল্যকালে রমেশচন্দ্র এই ভৃত্যের প্রমুখাৎ রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনিয়া পরম কৌতুক ও আনন্দ অনুভব করিতেন। রমেশচন্দ্রের জননী নিষ্ঠাবতী হিন্দুনারী ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। স্বামীর সহিত যখনই তিনি বিদেশে যাইতেন, তত্রত্য দেবদেবীর মন্দির ও তীর্থস্থানগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিতেন। মাতার সহিত রমেশচন্দ্র যখন থাকিতেন, তখন তিনিও এই সকল তীর্থক্ষেত্র দর্শনের সুযোগ পাইতেন। শুধু তাহাই নয়, স্থানীয় ইতিহাস জানিবার দিকেও তাঁহার প্রবল আগ্রহ বাল্যকাল হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র মাতৃহীন হন। তাহার পর স্থায়িভাবে কলিকাতাতেই খুল্লতাত-ভবনে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতে থাকেন।

ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি রমেশচন্দ্রের অনুরাগ বাল্যকাল হইতেই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাঁহার পিতা এ জন্য রমেশচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং প্রায়ই বলিতেন, পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইতে

পারিলে তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইয়া দিবেন; কিন্তু ঈশানচন্দ্র তাঁহার বাক্যরক্ষা করিবার অবকাশ পান নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কুষ্টিয়ার সন্নিহিত কোনও খালের মধ্যে নৌকাডুবি হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। সে সময় রমেশচন্দ্রের বয়স ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র।

খুল্লতাত শশিচন্দ্র পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে বুকে তুলিয়া লইলেন। এক দিনের জন্য রমেশচন্দ্র অথবা তাঁহার ভ্রাতা-ভগিনী কাহাকেও কোনওরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। শশিচন্দ্র উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বড় বড় ইংরাজদিগের মধ্যেও প্রবাদবাক্যের মত প্রচলিত ছিল। গুণবান্ পিতৃব্যের সংশ্রবে থাকিয়া রমেশচন্দ্রের সর্ব্ববিষয়েই ক্রমোন্নতি ঘটে। শশিচন্দ্র খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেও সামাজিক প্রথা এড়াইয়া চলিতে পারিতেন না। সুতরাং পঞ্চদশবর্ষ বয়সে সিমলার নবগোপাল বসু মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী মোহিনীর সহিত রমেশচন্দ্রের শুভ-বিবাহক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র ১০৲ টাকা বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলের সকল ছাত্রের উপরের স্থান তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইয়া তিনি ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষা প্রদান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে তিনি সেবার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ৩২৲ টাকা বৃত্তিলাভ করেন।

সাহিত্যের প্রতিই বাল্যাবধি রমেশচন্দ্রের সবিশেষ আকর্ষণ ছিল। কিন্তু গণিতশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার সেরূপ আকর্ষণ লক্ষিত হইত না। এফ্ এ পড়িবার সময় শিক্ষকগণ তাঁহার এই ত্রুটি আবিষ্কার করেন। তখন

বাঙ্গালীর গৌরবস্তম্ভ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনিই রমেশচন্দ্রকে বুঝাইয়া দেন যে, চেষ্টা করিলেই রমেশচন্দ্র গণিতশাস্ত্রেও অধিকার লাভ করিতে পারিবেন। পরিণামে ঘটিয়াছিলও তাহাই পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করিয়া রমেশ-চন্দ্র বিলাতযাত্রা করেন। সহাধ্যায়ী বিহারীলাল গুপ্ত ও দেশপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহার সহযাত্রী ছিলেন। বিলাতে গিয়া সিবিলসার্ব্বিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সংকল্প করিয়া তাঁহারা যাত্রা করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে বিলাতযাত্রা অত্যন্ত কঠিন ছিল। তাঁহাদের পূর্ব্বে একমাত্র বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই প্রথম বিলাত গিয়া সিবিলসার্ব্বিস্ পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন। এ পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন, প্রতিযোগিতা বড়ই ভীষণ। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র না হইলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা অল্প।

তিনটি বাঙ্গালী যুবক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। উৎকট সাধনা আরম্ভ হইল। রমেশচন্দ্র পরীক্ষার জন্য পাঁচটি বিষয় নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন ;—ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস ও রচনা, গণিত, মনোবিজ্ঞান, প্রকৃত বিজ্ঞান ও সংস্কৃত।

পরীক্ষার্থীদিগের সমস্তই ইংরাজ। তাঁহারা তিন বন্ধু ব্যতীত ভার-তীয় ছাত্র অন্য কেহ এই প্রতিযোগী পরীক্ষায় প্রার্থী ছিলেন না। বিলাতের শ্রেষ্ঠ কলেজসমূহের শ্রেষ্ঠ ছাত্রবর্গ পরীক্ষার্থী। ইংরাজী তাঁহাদের মাতৃভাষা। রমেশচন্দ্র অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন

করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎকট তপস্যা দর্শনে বিদেশীয় পণ্ডিতগণ চমৎকৃত হইয়া গেলেন। সকলেই এই অল্পবয়স্ক বাঙ্গালী ছাত্রকে সযত্নে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষার ফল বাহির হইলে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, এই মেধাবী বাঙ্গালী ছাত্র ইংরাজ ছাত্রবর্গকে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তিন শত পঁচিশ জন। ইংরাজী সাহিত্যের পূর্ণ সংখ্যা ৫০০; তন্মধ্যে রমেশচন্দ্র ৪২০ নম্বর পাইয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও তিনি ৫০০ শতের মধ্যে ৪৩০ নম্বর পান।

একমাস ধরিয়া পরীক্ষা গ্রহণের পর যখন পরীক্ষার ফল বাহির হইল, তখন বিস্ময়মুগ্ধ বিলাতবাসীরা দেখিলেন যে, এই নবীন বাঙ্গালী যুবক রমেশচন্দ্র সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেবার মাত্র পঞ্চাশ জন এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

সিবিলসার্ব্বিস সংক্রান্ত যাবতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর রমেশচন্দ্র স্কটল্যাণ্ড, আয়রল্যাণ্ড, বেলজিয়ম্‌, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী প্রভৃতি দেশ পর্য্যটন করেন। দেশভ্রমণস্পৃহা তাঁহাতে বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। তিনি যেখানে যাহা দর্শনীয় ছিল, সমুদয় দেখিয়া তৎসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। ভবিষ্যতে এই সকল বিষয়ের সাহায্যে রমেশচন্দ্র 'ইউরোপে তিন বৎসর' নামক উপাদেয় ভ্রমণ-কাহিনী রচনা করেন।

ইউরোপ-ভ্রমণের পর রমেশচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কিছুদিন পৈতৃক বাটীতে ভ্রাতৃগণের সহিত একত্র বসবাস করেন। তৎপরে

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে আলিপুরে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। এখানে এক বৎসর কার্য্য করিবার পর তিনি মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জঙ্গিপুরে বদ্‌লী হইয়া যান। তথা হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী নদীয়া জেলায় বনগ্রাম মহকুমার ভার প্রাপ্ত হন। বনগ্রামে অবস্থানকালে তিনি সেখানকার বহু বিষয়ের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। নূতন পথ নির্ম্মাণ, ভগ্ন বিদ্যালয় গৃহের সংস্কার; পাঠশালা প্রভৃতির উন্নতি বিধান করিয়া তত্রত্য অধিবাসিবর্গের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জ্জন করেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলায় মেহেরপুর মহকুমায় তিনি বদ্‌লি হন। সেই সময় জলপ্লাবন হেতু সে অঞ্চলে ভয়ানক মহামারী ও দুর্ভিক্ষ ঘটে। রমেশচন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রমে সেখানে অন্নসত্র খুলিয়া ক্ষুধিত নরনারীর বুভুক্ষা নিবারণ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী উভয় পক্ষই রমেশচন্দ্রের এই মহদনুষ্ঠানে চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে তত্রত্য নীলকর সাহেবদিগের সহিত রমেশচন্দ্রের মতের সামঞ্জস্য ছিল না। শ্বেতাঙ্গ নীলকরগণ নানাপ্রকারে তাঁহার ভাবী উন্নতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে লাগিল; কিন্তু রমেশচন্দ্র সে বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া সতেজে কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন।

দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইলে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিয়া দেশবাসীর হৃদয়োত্থিত পূজার অর্ঘ্য পাইয়া রমেশচন্দ্র ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আবার বনগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে কিছু দিন কার্য্য করিতে করিতে একবার তাঁহার নিকট জমীদার ও প্রজার বিবাদ-সংক্রান্ত একটা মোকদ্দমা উপস্থাপিত হয়। জমীদার বর্দ্ধিত হারে খাজনা

আদায় করিবার ব্যবস্থা করায় প্রজাগণ উহা দিতে স্বীকৃত হয় নাই। তদুপলক্ষে ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত হয়। রমেশচন্দ্র উভয় পক্ষের লোকদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদিগের সম্মতিক্রমে জমীর খাজনা নির্দ্ধারিত করিয়া আপোষে মোকদ্দমা মিটাইয়া দেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র নদীয়া জেলার একৃটিং ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া কিছুদিন সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহার পর ত্রিপুরা, কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করিবার পর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি তিন মাসের জন্য বাঁকুড়ার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য পান। তৎপরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বর জেলার হাকিমস্বরূপ আরও তিন মাস কার্য্য করেন। সে সময়ে কয়েকটি ইংরাজী সংবাদপত্র বাঙ্গালীকে জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইতে দেখিয়া নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল; কিন্তু রমেশচন্দ্র বালেশ্বর জেলায় যেরূপ দক্ষতা সহকারে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে ষ্টেটস্‌ম্যানের মত বাঙ্গালীবিদ্বেষী সংবাদপত্রেও রমেশচন্দ্রের সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র বাখরগঞ্জ জেলার ভারপ্রাপ্ত হন। ইহার পূর্ব্বে কোনও ভারতবাসী স্থায়িভাবে কোনও জেলার শাসনভার পান নাই। দীর্ঘকালের নিমিত্ত রমেশচন্দ্র জেলার ভারপ্রাপ্ত হইলে সকলেরই দৃষ্টি এই বাঙ্গালী যুবকের উপর নিপতিত হইল। সে সময় অনেকেরই ধারণা ছিল যে, দেশীয়দিগের দ্বারা কখনই জেলার কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না; কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যেই সকলের ভ্রম অপনোদিত হইল। বাখরগঞ্জের মত দুর্দ্দান্ত জেলার ভার পাইয়াও রমেশচন্দ্র অত্যন্ত দক্ষতার সহিত উক্ত জেলার শাসনসংরক্ষণ করিতে থাকেন। তাঁহার কার্য্যতৎপরতাগুণে

মুগ্ধ হইয়া তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা গেজেট তাঁহার কার্য্যদক্ষতার প্রশংসা করেন। সে সময়ে লর্ড রিপণ ভারতবর্ষের ভাগ্য-বিধাতা ছিলেন। তিনি রমেশচন্দ্রের শাসনকার্য্যের প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে চাহেন। রমেশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন।

সাহিত্য-রচনার দিকে রমেশচন্দ্রের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজীতে "ইউরোপে তিন বৎসর" নামক ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশিত করেন। "কলিকাতা রিভিউ" নামক ইংরাজী মাসিকেও তিনি কখনও কখনও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত রমেশচন্দ্রের পিতার সৌহার্দ্দ্য ছিল। সেই সূত্রে তিনি রমেশ-চন্দ্রকে চিনিতেন ও যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। বাঙ্গালায় প্রকাশিত গ্রন্থা-দিও রমেশচন্দ্র যত্নসহকারে পাঠ করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন "বঙ্গদর্শন" বাহির করেন, সেই সময় তিনি ভবানীপুরস্থিত ছাপাখানায় প্রায়ই যাই-তেন। রমেশচন্দ্র সেই ছাপাখানার অনতিদূরেই থাকিতেন। তিনি প্রায়ই এই ছাপাখানায় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর প্রশংসা করিলে সাহিত্য-সম্রাট রমেশ-চন্দ্রকে বলেন, "বাঙ্গালা বই যদি তোমার পড়িতে এত ভাল লাগে, তবে তুমি বাঙ্গালা লেখ না কেন?" রমেশচন্দ্র তাহাতে সবিস্ময়ে বলেন যে, তিনি বাঙ্গালা রচনাপদ্ধতি কিছুই জানেন না, কিরূপে লিখিবেন? তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "তোমরা শিক্ষিত যুবক, অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছ, তোমরা যাহা লিখিবে, তাহাই রচনাপদ্ধতি। তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে।"

সাহিত্য-সম্রাটের মহৎ বাণী রমেশচন্দ্রের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল; তাহার প্রথম ফল, "বঙ্গবিজেতা"। ক্রমশঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ স্বরূপ আরও তিনখানি উপন্যাস "মাধবীকঙ্কণ," "জীবন প্রভাত" ও "জীবন সন্ধ্যা" বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিল।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি "বাঙ্গালার কৃষি সম্প্রদায়" নামক একখানি ইংরাজী পুস্তক রচনা করেন। উহাতে জমীদার ও প্রজার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া রমেশচন্দ্র দরিদ্র প্রজার পক্ষ সমর্থন করেন। ভারতবর্ষ ও বিলাতে এই গ্রন্থখানি সমাদৃত হইযাছিল।

তৎপরে রমেশচন্দ্র "বঙ্গের সাহিত্য" ও "সভ্যতার ইতিহাস" নামক দুইখানি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। "বঙ্গের সাহিত্য" বিলাতের পণ্ডিতসমাজে বিশেষরূপে সমাদৃত হয়। তাঁহার ইংরাজী রচনা-পদ্ধতির প্রশংসা করিয়া "পরীক্ষক" নামক একখানি বিলাতী পত্রও রমেশচন্দ্রের গুণগান করেন।

মাতৃভূমির অতীত গৌরব-গাথা রমেশচন্দ্রের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দ্দেশে বাঙ্গালা উপন্যাস রচনা করিয়া "শতবর্ষের" অতীত ভারত-চিত্র তিনি বঙ্গবাসীর সম্মুখে ধারণ করেন। "বঙ্গবিজেতা", "মাধবী-কঙ্কণ" "জীবন সন্ধ্যা" ও "জীবন প্রভাত" এই চারিখানি উপন্যাসের নাম "শতবর্ষ"। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় এক বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত রমেশচন্দ্রের সমকক্ষ আর কোন বাঙ্গালা ভাষার লেখক এ পর্য্যন্ত আবির্ভূত হন নাই, ইহা অতিরঞ্জন নহে—অতি সরল সত্য কথা।

অক্লান্তকর্ম্মী, বঙ্গবাসীর একনিষ্ঠ সাধক রমেশচন্দ্র শুধু উপন্যাস রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি কয়েকজন পণ্ডিতের সহায়তায় ঋগ্বেদের

ন্যায় দুরূহ গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিস্ময়মুগ্ধ শিক্ষিত সমাজ চমৎকৃত হইয়া গেল; বিলাত-প্রত্যাগত একজন জেলার হাকিম সংস্কৃতভাষায় এরূপ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন যে, বাঙ্গালায় ঐ প্রকার কঠিন গ্রন্থের অনুবাদ করিতেছেন। চারিদিকে রমেশচন্দ্রের খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হইল। অবশ্য, হীনচেতা ব্যক্তিগণ তাঁহার নিন্দা-রটনাতে ক্ষান্ত ছিল না; কিন্তু রমেশচন্দ্র যেন সাধকের আসনে উপবিষ্ট; তুচ্ছ নিন্দা-স্তুতি তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। তিনি সাধনা করিতে লাগিলেন।

ঋগ্বেদ অনূদিত করিবার পর তিনি দুইখানি উপন্যাসে বাঙ্গালার গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র ফুটাইয়া তুলিলেন—"সংসার" ও "সমাজ" বাহির হইল। তৎপরে তিনি—"প্রাচীন ভারতের সভ্যতার" ইতিহাস ইংরাজী ভাষায় রচনা করেন। পাণ্ডিত্য ও গবেষণা-পূর্ণ এই গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি ও যশোলাভ করেন। সমগ্র সভ্য জগৎ রমেশচন্দ্রের গবেষণা-শক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া গেল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জ জেলা হইতে বিদায় লইয়া রমেশচন্দ্র রাজকার্য্য হইতে দুই বৎসরের জন্য অবকাশ গ্রহণ করেন। সেই সময়েই ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তৎপরে তিনি দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা করেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি পাবনা জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। সেই সময়ে ময়মনসিংহ জেলায় শাসনকার্য্যে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হয়। রমেশচন্দ্র তথায় প্রেরিত হন এবং ছয় মাস অবস্থানের পর জেলার শাসনকার্য্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র বর্দ্ধমান জেলার শাসনভার প্রাপ্ত হন। সেখানেও তিনি বিশেষ প্রশংসার সহিত কার্য্য করেন। তৎপরে ১৮৯১

খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার ভার প্রাপ্ত হন। সেখানে তিনি নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে প্রজাবর্গকে অব্যাহতি দান করিয়া অশেষ যশঃ উপার্জ্জন করেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সরকার বাহাদুর তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি প্রদান করেন। দীর্ঘ একুশ বৎসর কাল যোগ্যতার সহিত রাজকার্য্য সম্পাদনের পর তিনি অবকাশ লইয়া পুনরায় বিলাতযাত্রা করেন। বিলাত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার পদে উন্নীত হন। তাঁহার পূর্ব্বে কোনও ভারতবাসী এইরূপ সম্মানজনক, দায়িত্বপূর্ণ রাজপদ প্রাপ্ত হন নাই।

গুরুতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় তাঁহার অবকাশ আদৌ ছিল না। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত তিনি রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। রাত্রি সমাগত হইলে তখন ক্লান্ত দেহ বিশ্রামের জন্য লালায়িত হইত; কিন্তু মাতৃভাষার ভক্ত-সাধক তখন বিশ্রাম করিতেন না। অনেক সময় সারারাত্রি জাগিয়া তিনি সাহিত্যের সাধনা করিতেন। দীর্ঘ রজনী কোথা দিয়া চলিয়া যাইত, অনেক সময় রমেশচন্দ্র তাহা অনুভব করিতেও পারিতেন না।

রমেশচন্দ্র ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের" সভাপতি হন। তাঁহার যত্নে "সাহিত্য-পরিষদ" যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তৎপরে বিলাতে গিয়া কিছু দিন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি বরোদা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। কার্য্যদক্ষতাগুণে বরোদার গায়কোবাড় তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগী হন। সকল বিষয়েই রমেশচন্দ্র তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। রাজকার্য্য রমেশচন্দ্রের নির্দ্দেশক্রমেই পরিচালিত হইত।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র জাতীয় মহাসমিতির সভাপতিপদে মনোনীত হন। বরোদা রাজ্যে দীর্ঘকাল রমেশচন্দ্র কার্য্য করিতে পারেন নাই। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ৩০শে নবেম্বর বেলা দ্বাদশ ঘটিকার সময় বাঙ্গালার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রমেশচন্দ্র ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে রমেশচন্দ্র পাঁচ কন্যা ও একটিমাত্র পুত্র অজয়কে রাখিয়া যান। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির নাম—ঋগ্বেদ-সংহিতা, হিন্দুশাস্ত্র ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ, বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ, রাজপুত জীবনসন্ধ্যা, মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত, সংসার, সমাজ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইউরোপে তিন বৎসর, Ancient Civilization in India, Lays of ancient India, Ramayana and Mahabharata in English verse, Economic History of British India, The slave girl of Agra, এই শেষোক্ত গ্রন্থখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত উপন্যাস।

অতি শুভ মুহূর্ত্তে বঙ্গ-জননীর কোল আলো করিয়া বঙ্গ-সরস্বতীর বরপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রের গৌরবে বাঙ্গালী জাতি ধন্য, কৃতার্থ। এমন সুধী, এমন একনিষ্ঠ সাধক, এমন কর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষ বাঙ্গালার উর্ব্বরক্ষেত্রেও কদাচিৎ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বিদেশী পরিচ্ছদে দেহ আবৃত থাকিলেও বাঙ্গালা মায়ের এমন ভক্ত সুসন্তান কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়? বাঙ্গালা ভাষা যখন উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত,

তখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় অগ্রগণ্য রমেশচন্দ্র মাতৃভাষাচর্চ্চার জন্য আগ্রহ-ভরে সাধনা করিতেছেন। তাঁহার তপস্যা সার্থক হইয়াছে। তাঁহার অমূল্য দান বাঙ্গালার সারস্বত ভাণ্ডারে উজ্জ্বল মরকতের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া শোভা পাইতেছে। ইতিহাসের গৌরবময়ী কীর্ত্তি তিনি উপন্যাসা-কারে বঙ্গবাসীর চক্ষুর সম্মুখে ধারণ পূর্ব্বক অক্ষয় যশঃ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। উচ্চ রাজপদে ভারতবাসীর অধিকারের পথ তিনিই নিজের কর্ম্মকুশলতাগুণে বাধামুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা ও প্রজা উভয় পক্ষেরই তিনি হিতার্থী ছিলেন।

সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিযাও এমন সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক, তেজস্বী পুরুষ বাঙ্গালায় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। দেশবাসী রমেশচন্দ্রকে মাথাব মণি করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার পুণ্যস্মৃতি চিবদিন বাঙ্গালীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রদান করিবে। স্বদেশকে তিনি প্রাণ ভরিয়া ভাল-বাসিতেন, মাতৃভাষাকে তিনি গরীয়সী জ্ঞানে পূজা করিতেন। শুধু পূজা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই; সারা বঙ্গে তাঁহার চিন্তাপ্রসূত উপা-দেয় বচনাসম্ভাব বিলাইয়া দিয়াছেন। উত্তরকালের বাঙ্গালী জাতি এই মহানুভবের প্রভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া জাতিকে চিনিবে, মাতৃভাষাকে সগৌববে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিবে। সেই জন্যই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল; রমেশচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যের দিক্‌পাল বাঙ্গালার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সাধনার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্গজননী মাতৃভাষা আজ ভক্ত সন্তানবৃন্দের নিবেদিত হৃদয়ের পূজার অর্ঘ্যভারে গৌরবময়ী।

রমেশচন্দ্র চারণগীতে স্বদেশের গৌরবগাথার যে অপূর্ব্ব বর্ণনা করিয়াছেন, সে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র প্রভাবে বাঙ্গালী যুগ-যুগান্তরেও উদ্দীপিত-অণুপ্রাণিত হইবে। বীরত্বদীপ্ত ইতিহাসের অত্যুজ্জ্বল রশ্মিসম্পাতে রমেশচন্দ্র তাঁহার দেশমাতৃকার যে জ্যোতির্ম্ময়-মূর্ত্তি সুপ্ত-বাঙ্গালীর চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়াছেন, কালের প্রভাবে সে জ্যোতিঃ স্তিমিত হইবার নহে। যাও রমেশচন্দ্র! বঙ্কিম, হেম, মধুসূদন তোমার জন্য অমরধামে অপেক্ষা করিতেছিলেন; জীবনে তাঁহাদের সহিত সাহিত্য-সাধনায় জয়ী হইয়াছিলে;—অমরধামে তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া বাঙ্গালীকে আশীর্ব্বাদ কর, বাঙ্গালীর মন্ত্র সাধন সফল হউক।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন পাথুরিয়াঘাটা প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। হরকুমার ঠাকুরের ইনি জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহার জননীর নাম শিবসুন্দরী; পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমকালে হাতেখড়ি হইবার পর যতীন্দ্রমোহন প্রাসাদে নিযুক্ত গুরুমহাশয়ের নিকট পড়িতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে পাকিন্ সাহেবের যোড়াসাঁকোস্থিত "ইনফাণ্ট" বা শিশুবিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি বিদ্যার্জ্জন করিতে থাকেন। অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হইয়া যতীন্দ্রমোহন উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। এই কলেজে তিনি নয় বৎসরকাল পাঠ করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

ইংরাজী ও বাঙ্গালাভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ছাত্রাবস্থায় মধ্যে মধ্যে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের সুবিখ্যাত "প্রভাকর" পত্রে বাঙ্গালা-রচনা প্রকাশ করিতেন। "মিলিটারী গেজেট" ও অন্যান্য ইংরাজী কাগজেও তিনি প্রবন্ধ পাঠাইয়া দিতেন। হিন্দু কলেজের পাঠ সমাপ্ত হইলে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলেজ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। তৎপরে কাপ্তেন রিচার্ডসন্ ও রেভারেণ্ড জন্ন্যাস্ নামক দুই জন সুপণ্ডিত ইংরাজের নিকট গৃহে ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। এক জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও তাঁহাকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষা দিতেন। বাল্য-কালেই তাঁহার বিবাহ হয়।

যতীন্দ্রমোহন মাতৃভক্তের আদর্শ ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মেও তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যা-বন্দনাদি না করিয়া তিনি কোনও কর্ম্মে লিপ্ত হইতেন না।

বঙ্গ-সাহিত্যের তিনি অকৃত্রিম ভক্ত ছিলেন। কাব্য-রচনায় তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় তিনি বহু প্রবন্ধ, সঙ্গীত ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃতভাষায় তিনি যে সুমধুর শ্লোকাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অধুনা দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার রচিত "বিদ্যাসুন্দর", "চক্ষুদান", "উভয় সঙ্কট", "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" প্রভৃতি নাটক এখনও অনেকের চিত্তবিনোদন করে। তাঁহারই উৎসাহে মাইকেল মধুসূদনের নাটক অভিনীত হয়। যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভবকাব্য' পাঠে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া যথেষ্ট সমাদর ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা থিয়েটার তাঁহারই চেষ্টায় এ দেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বীয় ভবনে অভিনয় করাইবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রথম "বিদ্যাসুন্দর" নাটক রচনা করেন। কনিষ্ঠ সহোদর শৌরীন্দ্রমোহনকে লইয়া যতীন্দ্রমোহন প্রথম সখের থিয়েটারে ঐক্যতান বাদনের প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পিতার নিকট হইতে তিনি জমীদারীর তত্ত্বাবধানের কিয়ৎপরিমাণ ভার প্রাপ্ত হন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে ২৭ বৎসর বয়সে তিনি সমুদায় সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁহাকে জমীদারী পরিচালনের যাবতীয় কার্য্য শিখাইয়া দিয়াছিলেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর স্যার উইলিয়ম্ গ্রে তাঁহাকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যপদে মনোনীত করেন। এই কার্য্যে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বড় লাট বাহাদুর লর্ড মিণ্টো তাঁহার কার্য্যে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন।

যতীন্দ্রমোহন ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাবর্গকে চল্লিশ সহস্র টাকা দান করেন। সেই সময় প্রত্যহ আড়াই শত অনশন-ক্লিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার বাটীতে আহার্য্য প্রাপ্ত হইত। প্রায় তিন মাসকাল তিনি এইরূপে প্রত্যহ আড়াই শত ক্ষুধিত নরনারীর বুভুক্ষা নিবারণ করিয়া অশেষ কীর্ত্তি লাভ করেন। ১৬টি ছাত্র সর্ব্বদা তাঁহার ভবনে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি যোগ্যতার সহিত এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বড় লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণ করেন, সেই সময় দিল্লীর দরবার হইতে তিনি "মহারাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন "সি, আই, ই" উপাধি ভূষণে ভূষিত হন। সরকার বাহাদুর তাঁহার প্রতি এমনই প্রসন্ন হইয়াছিলেন যে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পুরুষানুক্রমে "মহারাজা" উপাধি ধারণ করিবার অধিকার প্রদান করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি "ফ্যাকল্‌টি অব্ আর্টস্" নামক সভার সভাপতি এবং "ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের" ট্রাষ্টি ও

সভাপতিপদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে কয়েক সহস্র মুদ্রার কোম্পানীর কাগজ প্রদান করেন। উহার সুদ হইতে প্রতি বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রকে একটি সুবর্ণ-পদক ও "ঠাকুর ল" পরীক্ষায় যে প্রথম স্থান অধিকার করিবে, তাহাকে রৌপ্যপদক দিবার ব্যবস্থা করেন। প্রথমটি তাঁহার পিতা হরকুমার ও দ্বিতীয়টি খুল্লতাত প্রসন্ন-কুমারের নামে প্রদান করিবার ব্যবস্থা হয়। এতদ্ব্যতীত খুল্লতাত প্রসন্নকুমারের একটি সুন্দর প্রস্তর-মূর্ত্তি ক্ষোদিত করিয়া সিনেটের সম্মুখ-ভাগে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রদান করেন।

মেও হাঁসপাতাল নির্ম্মাণের সময় যতীন্দ্রমোহন এক খণ্ড ভূমি ও দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত হাঁসপাতালে মহারাজের নামে একটি ওয়ার্ড আছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জুরীর কার্য্য সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান-সমিতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, যতীন্দ্রমোহন তাহার এক জন সদস্য ছিলেন।

কলিকাতা তালতলায় স্বর্গীয় পিতৃদেবের নামে একটি পার্ক বা ভ্রমণোদ্যান প্রতিষ্ঠার জন্য যতীন্দ্রমোহন ভূমি দান করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার পিতার একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

বিধবাদিগের দুঃখ দূরীকরণের অভিপ্রায়ে যতীন্দ্রমোহন এক লক্ষ টাকার একটি ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন। জননী শিবসুন্দরীর নামে উক্ত ধন-ভাণ্ডার পরিচিত।

যতীন্দ্রমোহন পাথুরিয়াঘাটা প্রাসাদে নিত্য অতিথি-সেবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। জমীদারীর মধ্যে বহু স্থানে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন ভারত সরকারের শিক্ষা-কমিশনের এক জন সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাটগণ বহুবার তাঁহার ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া পানভোজন করিয়া গিয়াছেন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিল। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অচলা ভক্তি সত্ত্বেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিনি ভক্ত শিষ্য ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠিত "পূর্ণিমা-সম্মিলনে" যতীন্দ্রমোহন সাগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন। সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের সমাদর করিতে তিনি অকুণ্ঠিত ছিলেন।

সন্তান না হওয়ায় তিনি কনিষ্ঠ সহোদরের মধ্যম পুত্র প্রদ্যোৎ-কুমারকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তারিখে বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী মহারাজা যতীন্দ্রমোহন অম্লশূল রোগে ইহধাম হইতে মহাপ্রস্থান করেন।

"যেমনটি যায়, তেমনটি আর হয় না।" এই প্রবাদবাক্যটি যতীন্দ্র-মোহনেও বিশেষরূপে আরোপ করা যাইতে পারে। সম্ভ্রান্ত, অতুল্য বিত্ত-বিভবশালী, সুপণ্ডিত, সাহিত্য-রসিক যতীন্দ্রমোহন বঙ্গমাতার ক্রোড় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সে স্থান আর পূর্ণ হইল না। যৌবন, ধন-সম্পত্তি, প্রভুত্ব প্রভৃতির সমবায়ে মানুষের গর্ব্ব, দম্ভ, অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কিন্তু যতীন্দ্রমোহন যেমন সদালাপী, বিনয়ী ও মধুর স্বভাবের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা দুর্লভ না হইলেও বাঙ্গালায়—আদর্শ স্বরূপ। সাহিত্য প্রচার ও সাহিত্যিকের মঙ্গলকামনায় যতীন্দ্র-মোহন কোনও দিন উদাসীন ছিলেন না। মাইকেলের কাহিনী আলোচনা করিলে বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবেন, যতীন্দ্রমোহন অপূর্ব্ব

প্রতিভাশালী বাঙ্গালী মহাকবির সহায়তাকল্পে কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। উচ্চশিক্ষিত হইয়াও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে যতীন্দ্রমোহন আপনার ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যভ্রষ্ট হন নাই। তিনি কায়মনোবাক্যে হিন্দু ছিলেন। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে তিনি বুঝিয়া চলিতে জানিতেন, সেজন্য তিনি রাজা ও প্রজা উভয় পক্ষেরই প্রীতিভাজন ছিলেন। তাঁহার মত বিদ্যোৎসাহী গুণগ্রাহী, বহু গুণসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ধনিসম্প্রদায়ে বিরল। বহু পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিককে তিনি সাহায্য করিতেন, উৎসাহ দিতেন এবং যোগ্যতানুসারে সমাদর করিতেন। যতীন্দ্রমোহনের বিয়োগে বাঙ্গালী বিক্রমাদিত্যের অভাব অনুভব করিয়াছে।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার প্রাসাদে শৌরীন্দ্রমোহন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরকুমার ঠাকুর; মহারাজ যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের ইনি কনিষ্ঠ সহোদর। তাঁহার ছয় মাস বয়ঃক্রমকালে জন্মকোষ্ঠীতে গ্রহাচার্য্য কালীনাথ আচার্য্য গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, উত্তরকালে "গান্ধর্ব্ববিদ্যায়" তিনি যশস্বী হইবেন। বাড়ীর পাঠশালায় বাল্যকালে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল। আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পাঠশালায় অধ্যয়ন করিবার পর তিনি হিন্দু-কলেজে প্রবিষ্ট হন। প্রায় আট বৎসরকাল তিনি উক্ত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পাঠ্যা-বস্থায় শৌরীন্দ্রমোহন সাহিত্যে অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন।

বয়ঃক্রম যখন চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ, সেই সময় শৌরীন্দ্রমোহন "ভূগোল ও ইতিহাসঘটিত বৃত্তান্ত" শীর্ষক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে শৌরীন্দ্রমোহনের অনন্যসাধারণ জ্ঞান ছিল। এই দুইটি বিষয়ে পাঠ্যাবস্থা হইতেই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আসিয়া-ছিলেন। উত্তরকালে একবার তিনি কোনওরূপ মানচিত্র না দেখিয়াই স্বহস্তে ইউরোপের একখানি চমৎকার মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালাভাষার প্রতি শৌরীন্দ্রমোহনের বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি "মুক্তাবলী নাটক" রচনা করেন। কিছুকাল পরে মহাকবি

কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্র" নামক প্রসিদ্ধ নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। বঙ্গভাষাচর্চ্চায় শৌরীন্দ্রমোহনের সমধিক আনন্দ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতানুরাগ অতিমাত্রায় প্রবল হওয়ায় তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়সে সঙ্গীত-কলা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। সেই বৎসর শারদীয়া পূজায় মহাষ্টমীর দিন দশভুজার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী হইবার বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে সাগ্রহ প্রার্থনা উত্তরকালে সার্থক হইয়াছিল।

কলেজের পাঠ সমাপ্ত হইলে শৌরীন্দ্রমোহন পণ্ডিত তিলকচন্দ্র ন্যায়-ভূষণের নিকট গৃহে "কলাপ" ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। সঙ্গীত-শাস্ত্র-চর্চ্চার জন্য তিনি সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-শাস্ত্রবিশারদ লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র এবং অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে বেহালা-যন্ত্র শিক্ষা দেন। সঙ্গীত-শাস্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যে শৌরীন্দ্রমোহন সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজী ও আর্য্য-সঙ্গীত সম্বন্ধে যে সকল হস্তলিখিত মূল্যবান্ গ্রন্থ আছে, তিনি তৎসমুদয় বহু আয়াসে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তৎপরে উক্ত গ্রন্থাদির সাহায্যে হিন্দু-সঙ্গীত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থের প্রচার করেন।

ইউরোপীয় সঙ্গীত-শাস্ত্র শিখিতেও শৌরীন্দ্রমোহনের প্রবল আগ্রহ ছিল। সেই উদ্দেশ্যসাধন-মানসে তিনি জনৈক জার্ম্মাণ শিক্ষকের নিকট পিয়ানো বাদ্যযন্ত্র বাজাইবার কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন; তৎপরে ইউরোপীয় সঙ্গীত-শাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করিতে থাকেন।

সঙ্গীত-শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া শৌরীন্দ্রমোহন বাঙ্গালা সঙ্গীতকে সংস্কৃত ও ইউরোপীয় সঙ্গীতবিজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত করিবার প্রয়াস

পান। তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। বাঙ্গালা-সঙ্গীত অধুনা তৎপ্রদর্শিত পথে বহু উন্নতিলাভ করিয়াছে।

সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে এ দেশীয় ও বৈদেশিক বহু গ্রন্থসংগ্রহের ফলে, দীর্ঘকাল পরিশ্রম ও সাধনায় সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় শৌরীন্দ্রমোহন "সঙ্গীতসার" নামক একখানি গ্রন্থের প্রচার করেন। সঙ্গীতের মূলসূত্র এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে বহু প্রাচীন প্রমাণেরও উল্লেখ ইহাতে আছে। "সঙ্গীতসার" গ্রন্থখানি সঙ্গীত-শিক্ষার্থীর পক্ষে মহামূল্যবান্ সামগ্রী। শৌরীন্দ্রমোহন স্বয়ং বহু সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন এবং তাহাদের স্বরলিপিও দিয়াছেন। "যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা" নামক গ্রন্থে সেতারের অনেকগুলি গৎ শৌরীন্দ্রমোহনের মস্তিষ্কপ্রসূত।

সঙ্গীত-শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া শৌরীন্দ্রমোহন হিন্দু-সঙ্গীতের যথেষ্ট উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে সুবাদক ছিলেন। ঐক্যতানবাদনের জন্য তিনি বহুসংখ্যক গৎ আবিষ্কার করেন। ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যা যাহাতে স্বদেশে ও বিদেশে প্রচারিত হয়, এ জন্য তিনি বহু যত্ন, পরিশ্রম, অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি-লিখন-প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়। রাগরাগিণীর মূর্ত্তি চিত্রে অঙ্কিত করিয়া প্রচার করিবার কল্পনা সর্ব্বপ্রথম শৌরীন্দ্রমোহনের উর্ব্বর মস্তিষ্কে উদ্ভূত হইয়াছিল। তিনিই পরিশেষে চিত্রের সাহায্যে রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছিলেন।

প্রত্নতত্ত্বেও শৌরীন্দ্রমোহনের প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। সে সম্বন্ধেও তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতকলা ব্যতীত চিত্রকলায়ও

তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহার চিত্রশালায় বহুবিধ সুদৃশ্য ও মূল্যবান্ চিত্রের সমাবেশ ছিল। লুপ্তপ্রায় বিশুদ্ধ সঙ্গীতের সমাদর বর্দ্ধিত করিবার জন্য ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে শৌরীন্দ্রমোহন কলিকাতা চিৎপুর রোডে বিপুল অর্থব্যয় করিয়া "বঙ্গীয় সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে"র প্রতিষ্ঠা করেন। সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী বহুসংখ্যক শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তিনি সঙ্গীত-শিক্ষার্থীদিগকে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করিতেন। এই সঙ্গীতবিদ্যালয় হইতে অনেকে সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় ভারত-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য বাঙ্গালার সম্ভ্রান্ত ও ধনী মহোদয়গণের চেষ্টায়—যোধপুর, জয়পুর প্রভৃতি রাজন্যবর্গের উপস্থিতিতে বেলগেছিয়ার উদ্যানে একটি বিরাট সম্মিলনী হইয়াছিল। যতীন্দ্রমোহন, শৌরীন্দ্রমোহন প্রভৃতি এই সভার অগ্রণী ছিলেন। শৌরীন্দ্রমোহন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বঙ্গভাষায় সঙ্গীত রচনা করেন। এই বিরাট সম্মিলনীর ফলে শৌরীন্দ্রমোহনের প্রতিভা-গৌরব বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়ে। সেই বৎসর আমেরিকায় ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে "ডক্টর অব্ মিউজিক" উপাধি প্রদত্ত হয়।

শৌরীন্দ্রমোহন-প্রতিষ্ঠিত "বঙ্গীয় সঙ্গীতবিদ্যালয়" এতাদৃশ উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, বাঙ্গালা সরকার উক্ত বিদ্যালয়ে অর্থসাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি "রাজা" উপাধি লাভ করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে "বেঙ্গল একাডেমিক্ অব মিউজিক" নামক সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া শৌরীন্দ্রমোহন বাঙ্গালার অশেষ কল্যাণসাধন করেন। স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে গুণগ্রামের পরিচয়

পাইয়া তাঁহাকে কে, সি, আই, ই উপাধি প্রদান করেন। সেই বৎসরই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। শৌরীন্দ্র-মোহনের পূর্ব্বে কোনও বঙ্গবাসী "নাইট" উপাধি পান নাই।

সঙ্গীতবিদ্যা আলোচনার ফলে শৌরীন্দ্রমোহন ভুবনবিখ্যাত হইয়াছিলেন। এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার স্বাধীন রাজন্যবৃন্দ সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সম্মানজনক উপাধি-ভূষণে বিভূষিত এবং নানারূপ উপহারপ্রদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন; রোমের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজক (পোপ) ত্রয়োদশ লিয়ো শৌরীন্দ্রমোহনকে রোমরাজ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া উপাধিপ্রদানের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু নানা অনিবার্য্য কারণে শৌরীন্দ্রমোহন তথায় যাইতে পারেন নাই। বেলজিয়মের রাজা দ্বিতীয় লিয়োপোল্ড গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে রৌপ্যপদক উপহার প্রদান করেন। গ্রীসের অধীশ্বর ভিক্টর ইমানুয়েল, জার্ম্মাণীর সম্রাট প্রথম উইলিয়ম্, ইতালীর রাজা প্রথম হাম্বার্ট প্রভৃতি প্রীতি-নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহাদিগের স্ব স্ব চিত্র শৌরীন্দ্রমোহনকে উপহারস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইতালী, অষ্ট্রিয়া, স্যাক্সনি, উটেম্‌বার্গ, বেলজিয়ম্. ডেন্‌মার্ক, সুইডেন, ফ্রান্স, মন্টিনিগ্রো, হাউয়াই, পর্ত্তুগাল, নেদারল্যাণ্ড, পার্শিয়া, শ্যাম, চীন, নেপাল, ভেনিজুলা প্রভৃতি স্থান হইতে তিনি রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়মও শৌরীন্দ্রমোহনের গুণে এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অঙ্কিত রাজচিহ্ন-সংযুক্ত সম্মান-প্রকাশক একখানি নিজ প্রতিমূর্ত্তি তাঁহাকে প্রদান করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে অক্স-ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইনি "ডক্টর অব্ মিউজিক" উপাধি প্রাপ্ত হন।

ভারতের বড় লাট লর্ড লিটন, লর্ড রিপণ, লর্ড ডফ্‌রিণ প্রভৃতি প্রায়ই শৌরীন্দ্রমোহনকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ নিজ প্রাসাদে লইয়া যাইতেন; তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।

লণ্ডনের "রয়েল কলেজ অব্ মিউজিক" নামক ধনভাণ্ডারে শৌরীন্দ্রমোহন বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। ভারতীয় কোনও ছাত্র বা ছাত্রী সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিলে উক্ত অর্থ হইতে একটি করিয়া সুবর্ণ-পদক প্রতি বৎসর পুরস্কার দেওয়া হইবে, এই সর্ত্তে তিনি টাকা দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি তদীয় পিতৃদেব হরকুমার ঠাকুর ও পত্নী আনন্দময়ীর নামে বৃত্তি দিবার জন্য বহু অর্থ দান করেন। গঙ্গাসাগরদ্বীপে তদীয় জনকের নামে তিনি একটি জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া সুমিষ্ট পানীয় জলের অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত করিয়া গিয়াছেন। বরাহ-নগরে ভাগীরথীতীরে তিনি একটি পথ নির্ম্মাণ করিয়া তত্রত্য জন-সাধারণের অশেষ উপকার করিয়াছেন।

লোকহিতকর অনুষ্ঠানে শৌরীন্দ্রমোহন কোনও দিন উদাসীন ছিলেন না। বরিশালে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ভূমি দান এবং কলিকাতায় "আলবার্ট ভিক্টর কুষ্ঠাশ্রমে" বহু অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। বাকুড়া "লেডী ডফ্‌রিণ দাতব্য চিকিৎসালয়" নির্ম্মাণ-কল্পে যাবতীয় ব্যয়ভার তিনিই বহন করেন।

সরকার বাহাদুর শৌরীন্দ্রমোহনকে এমনই শ্রদ্ধা করিতেন যে, তিনি নিজ প্রাসাদে সশস্ত্র প্রহরী ও দুইটি কামান রাখিবার অধিকার পাইয়া-ছিলেন। তিনি কিছুদিন কলিকাতার "জষ্টিস্ অব্ দি পিস্" ছিলেন।

শৌরীন্দ্রমোহনের দান যথেষ্ট ছিল। ধনীর সন্তান হইয়াও তাঁহার বিনয় প্রশংসনীয় ছিল। সকলেরই সহিত তিনি মিষ্টসম্ভাষণ করিতেন। বহুগুণে বিমণ্ডিত হইয়া দানবীর শৌরীন্দ্রমোহন জনসাধারণের বহু উপকার করিয়া গিয়াছেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৫ই জুন তারিখে, প্রায় ছয় মাস রোগভোগের পর তিনি পাথুরিয়াঘাটা প্রাসাদে ইহলীলা সংবরণ করেন।

শৌরীন্দ্রমোহনের পাঁচ পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রমোদকুমার অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। মধ্যম পুত্র প্রদ্যোৎকুমারকে তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর মহারাজ যতীন্দ্রমোহন দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ইনি এক্ষণে মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার নামে খ্যাত। তৃতীয় পুত্র নবাব শ্যামাকুমার ঠাকুর কিছুকাল পারস্য সম্রাটের সহকারী রাজদূতের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। চতুর্থ, পঞ্চম শিবকুমার এবং প্রণবকুমার, সকলেই যশস্বী।

শৌরীন্দ্রমোহন ন্যূনাধিক পঞ্চাশখানি গ্রন্থের প্রচার করেন। তাঁহার কতকগুলি অনূদিত, বাকিগুলি রচিত। তন্মধ্যে সঙ্গীতসংক্রান্ত "জাতীয় সঙ্গীতবিষয়ক প্রস্তাব," "যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা," "মৃদঙ্গ-মঞ্জরী," "একতান," "হারমোনিয়া-সূত্র," "হিন্দু-সঙ্গীত," "যন্ত্রকোষ," "ভিক্টোরিয়া-গীতিকা," "সঙ্গীতসার," "প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমনোপলক্ষে হিন্দু রাগরাগিণীতে ইংরাজী কবিতার সংযোগ," "বাহুলীন তত্ত্ব," "কণ্ঠ-কৌমুদী," "মালবিকাগ্নিমিত্রম্," "মুক্তাবলী নাটিকা" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এতদ্‌ভিন্ন "ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী," "দশাবতার," "নব রস" প্রভৃতি পরিকল্পনা তিনি উপযুক্ত চিত্রকরের সাহায্যে অঙ্কিত করাইয়া প্রকাশিত করিয়া ভারতীয় চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ করেন। ইঁহার প্রদত্ত ভারতীয়

বাদ্যযন্ত্রনিচয় "ভারত মিউজিয়মে" সংগৃহীত রহিয়াছে। সেগুলি দেখিবার জিনিষ।

লুপ্তপ্রায় বিশুদ্ধ সঙ্গীতের গৌরবের জন্য—ভারতীয় সঙ্গীতকলার প্রতিষ্ঠা ও সঙ্গীত-সাহিত্যের প্রচারের জন্য—চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য—শৌরীন্দ্রমোহন অকাতরে ব্যয় ও মুক্তহস্তে দান করিতেন। শৌরীন্দ্রমোহনের বিপুল সম্পত্তির আয়ে এই ব্যয় সঙ্কুলান হইত না; ক্রমে ক্রমে তিনি ঋণজালে বিজড়িত হইয়া পড়েন। শৌরীন্দ্রমোহন কিন্তু এই ঋণের জন্য বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া আমরণ সঙ্গীতের জন্য সমভাবে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাধনা ও কামনা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, কলাবিদ্যার জন্য সর্ব্বস্ব-ব্যয়ে তিনি কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। সম্পত্তি ত অনেক ধনবানের আছে—ব্যয়কুণ্ঠার ফলে ত বংশানুক্রমে বাড়িয়াই যাইতেছে—কিন্তু কলাবিদ্যার প্রতিষ্ঠার জন্য শৌরীন্দ্রমোহনের মত সর্ব্বস্ব-ব্যয়ে কৃতসঙ্কল্প কয়জন মহাপ্রাণ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? শৌরীন্দ্রমোহনের জীবনান্তের পর তাঁহার বিপুল সম্পত্তি—প্রাসাদ পর্য্যন্ত ঋণের দায়ে বিক্রয় হইয়া গেল—কলিকাতার সম্ভ্রান্ত-শিক্ষিত-সম্প্রদায় দূরের কথা, তাঁহার পুত্র মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর পর্য্যন্ত সে স্মৃতিরক্ষায় যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। কিন্তু শৌরীন্দ্রমোহন নিজে যে অমর অবদান প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, কালের প্রভাবে তাহা বিনষ্ট হইবে কি? ধন্য শৌরীন্দ্রমোহন! ধন্য তোমার সাধনা—ধন্য তোমার আত্মত্যাগ!

প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় পাথুরিয়াঘাটা-প্রাসাদে প্রসন্নকুমার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা গোপীনাথ ঠাকুর কলিকাতা-সমাজে দান-বীর বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাল্যকালে প্রসন্নকুমার সেরবোরণ্ সাহেবের বিদ্যালয়ে প্রথম ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি অধ্যয়নার্থ উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তিনি বিদ্যা-লয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পৈতৃক বিষয়-কর্ম্মের তত্ত্বাবধান আরম্ভ করেন।

প্রসন্নকুমারের জমীদারীর আয় বৎসরে প্রায় এক লক্ষ টাকা ছিল। কিন্তু অভিজাতবংশে ধনীর সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি স্বাধীন ব্যবসায়ের দ্বারা অর্থোপার্জ্জনে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি নীলের কুঠী ও তৈলের কল প্রতিষ্ঠা করেন; কিন্তু এরূপ ব্যবসায়ে বিশেষরূপ সফল-কাম না হইয়া তিনি কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতে ব্যবহারা-জীবের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কয়েকটি মোকদ্দমায় পরাজিত হইয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ব্যবহারাজীবগণ ধনকুবেরদিগের পক্ষে নিযুক্ত হইয়া যথেষ্ট অর্থ গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু পরিশ্রম তেমন করেন না। এজন্য ওকালতী ব্যবসা অবলম্বনের দিকে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। বাল্যাবধি প্রসন্নকুমারের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখরা ছিল। তিনি যাহা একবার শুনিতেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না, ইংরাজী ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ওকালতী ব্যবসায়েও তিনি যথেষ্ট

প্রতিপত্তি এবং অর্থ উপার্জ্জন করেন। এই ব্যবসায়ে বৎসরে গড়ে তিনি প্রায় দেড় লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। জমীদার-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসন্নকুমারই প্রথম উকীল হন। গবর্ণমেণ্টের উকীল বেলী সাহেব কার্য্য পরিত্যাগ করিলে প্রসন্নকুমার তাঁহার স্থলে সরকারপক্ষের উকীল নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সরকার বাহাদুর যখন লাখেরাজ জমী বাজেয়াপ্ত করিবার প্রস্তাব করেন, সেই সময় প্রসন্নকুমার "বেঙ্গল হরকরা" নামক সংবাদপত্রে তৎসম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত হইয়া গেলে, সরকারী তহশীলদারগণের অত্যাচার বর্দ্ধিত হইল। ক্রমে সেই অত্যাচার চরম সীমায় উপনীত হইলে, প্রসন্নকুমার দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি কতিপয় আত্মীয় ও বন্ধুর সহায়তা লইয়া কলিকাতা টাউন হলে লাখেরাজগণের একটি বিরাট সভা আহ্বান করেন। আন্দোলন ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল। তদানীন্তন বড় লাট লর্ড অক্‌-ল্যাণ্ড এই আন্দোলনের প্রচণ্ডতা দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার ধারণা হইল যে, লাটভবনও হয় ত আক্রান্ত হইতে পারে। অর্দ্ধ-ঘণ্টা অন্তর তাঁহার নিকট সভার কার্য্যাবলীর সংবাদ প্রেরিত হইতে লাগিল। এই বিরাট আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিলেন যে, পঞ্চাশ বিঘার অনধিক লাখেরাজ জমী গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিবেন না।

প্রসন্নকুমার "বেঙ্গল হরকরার" লেখক ছিলেন। উহাতে মধ্যে মধ্যে তিনি প্রবন্ধ রচনা করিতেন। কিছুকাল পরে "রিফরমার" নামক একখানি ইংরাজী ও "অনুবাদক" নামক একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র বাহির

করিয়া প্রসন্নকুমার উক্ত পত্র দুইখানির সম্পাদক হইয়াছিলেন। দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা উক্ত সংবাদ-পত্রে বাহির হইত। সংস্কৃতভাষা হইতে দায়বিষয়ক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া প্রসন্নকুমার বাঙ্গালায় উহা সঙ্কলিত করেন।

প্রসন্নকুমারের মাতৃভক্তি প্রশংসনীয় ছিল। মাতাকে তিনি দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন। কথিত আছে, তাঁহার মাতা যে রজত-বিনির্ম্মিত খট্টা ব্যবহার করিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর প্রসন্নকুমার উহা মূলাজোড়ে লইয়া যান এবং তদীয় পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মময়ী দেবীর সেবার জন্য উহা উৎসর্গ করেন। জননী যে দ্রব্য ব্যবহার করিতেন, তাহা তাঁহার নিকট এমনই পবিত্র ছিল যে, উহা পাছে অন্যে ব্যবহার করে, এই আশঙ্কায় তিনি খট্টাখানি দেবতার উদ্দেশেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

লর্ড ডালহাউসি যখন ভারতের বড় লাট, সেই সময় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম সৃষ্টি হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার উক্ত ব্যবস্থাপক সভার প্রথম সহকারী কার্য্যকারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই পদে অধিরূঢ় থাকিয়া তিনি ফৌজদারী আইনগঠন সম্বন্ধে কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার বার্ণেস্ পিকক্ মহোদয়কে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

লর্ড বেন্টিঙ্কের সময় রাজা রামমোহন রায় সতীদাহপ্রথা নিবারণের জন্য বিপুল চেষ্টা করেন; সে সময়ের সমাজপতিগণ রাজা রাম-মোহন রায়ের এই চেষ্টাজাত ব্যাপারের প্রতিকূলে বিলাতে আবেদন পাঠাইয়াছিলেন। প্রসন্নকুমারের বিশেষ চেষ্টায় সে আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছিল।

"বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্" সভা স্থাপনে প্রসন্নকুমারও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পর প্রসন্নকুমারই উক্ত সভায় সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি যোগ্যতার সহিত সভাপতির কর্ত্তব্য পালন করিতেন।

প্রসন্নকুমার পাকা জমীদার ছিলেন। জমীদারীকার্য্যে তাঁহার পর্য্যাপ্ত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। আইনেও তাঁহার অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল। প্রসন্নকুমার ইংরাজী সাহিত্যের ন্যায় সংস্কৃতভাষারও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি একটি বিরাট পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এই পুস্তকাগারে সাহিত্য ও আইনবিষয়ক বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ বিরাজিত। গ্রন্থাদি পাঠ করিবার জন্য হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতিরাও এই পুস্তকাগারে আসিতেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রসন্নকুমার উহার অন্যতম 'ফেলো' বা সদস্য নির্ব্বাচিত হন। হিন্দুর মৃতদেহ কলে ভস্মীভূত করিবার জন্য একবার আন্দোলন হয়। প্রসন্নকুমার এই ব্যবস্থার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় এই ব্যবস্থা রহিত হয়; উহা আর কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। প্রসন্নকুমার প্রথমতঃ সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। যে সকল প্রথা সমাজের অনিষ্টবিধান করে, তাহার উচ্ছেদে যত্নবান্ ছিলেন; কিন্তু তদীয় একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হইয়া গেলে, তিনি প্রাচীন সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হন।

প্রসন্নকুমার পুরাতন হিন্দু কলেজের অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। মেয়ো হাঁসপাতালের পরিদর্শনের ভার তাঁহার উপর ছিল। দেশের যাবতীয়

মঙ্গলানুষ্ঠানে প্রসন্নকুমার লিপ্ত থাকিতেন। স্বদেশের ও স্বদেশবাসীর যাহাতে উন্নতি হয়, এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। সমগ্র জীবন ধরিয়া তিনি স্বদেশের মঙ্গলানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বদান্য জমীদার বলিয়া প্রসন্নকুমারের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। দরিদ্র প্রজাবর্গকে তিনি নানা উপায়ে সাহায্য করিতেন। মূলাজোড়ে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া বহুসংখ্যক ছাত্রের জন্য তিনি বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। শিক্ষিত-সম্প্রদায় যাহাতে হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হন এবং অনুরাগ ও উৎসাহ সহকারে হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করেন, এজন্য তিনি মন্বাদি-স্মৃতি-গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

প্রসন্নকুমার একবার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। ভ্রমণব্যপদেশে তিনি ভূস্বর্গ কাশ্মীরেও গমন করেন। তদানীন্তন কাশ্মীর-মহারাজ গোলাপসিংহ প্রসন্নকুমারকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

স্বকীয় বিস্তৃত জমীদারীর মধ্যে প্রসন্নকুমার অনেকগুলি দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রজাবর্গের কল্যাণচিন্তা নিয়তই তাঁহার মনে জাগ্রত ছিল এবং সততই তিনি তাহাদের হিতার্থ নানা-প্রকার অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার ভবনে প্রত্যহ শতাধিক দরিদ্র ও বিদ্যালয়ের ছাত্র আহার প্রাপ্ত হইত।

মুঙ্গেরের অন্তর্গত পীরপাহাড়ের উপর প্রসন্নকুমার একটি সুদৃশ্য মনোরম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মুঙ্গেরের জলবায়ু স্বাস্থ্যের অনুকূল এবং উক্ত অঞ্চলে অনেক বিষয়-সম্পত্তি থাকার জন্যই তিনি উক্ত অট্টালিকাটি কোনও ইংরাজের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লন। তৎপরে উহাকে নিজের বাসোপযোগী করিয়া লইতে তাঁহার প্রভূত অর্থব্যয়

হইয়াছিল। পাহাড়ের উপরেই একটি কূপ খনন করাইতে তাঁহার যথেষ্ট অর্থব্যয় হয়। মুঙ্গেরের এই প্রাসাদোপম অট্টালিকাটি দর্শনীয় পদার্থ। উহার প্রত্যেক কক্ষ সুসজ্জিত অবস্থায় এখনও বিদ্যমান।

প্রসন্নকুমার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ প্রাপ্ত হন; কিন্তু তখন বিশেষ পীড়িত ছিলেন বলিয়া সভায় তিনি যোগদান করিতে পারেন নাই।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ৩০শে এপ্রিল তারিখে সরকার বাহাদুর প্রসন্নকুমারকে সি, আই, ই উপাধি প্রদান করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ৩০শে আগষ্ট এই মনস্বী, তেজস্বী ও যশস্বী পুরুষ দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ইনি যে উইল করিয়া যান, তাহাতে সৎকার্য্যে বহু প্রকার দানের ব্যবস্থা ছিল। পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ব্যতীত প্রসন্নকুমারের আরও দুইটি কন্যা ছিল। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করায় প্রসন্নকুমার তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি উইলের দ্বারা ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহনকে অর্পণ করিয়া যান। উইলের ব্যবস্থা দ্বারা তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে তিন লক্ষ টাকা আইন-শিক্ষাকল্পে দান করেন। সেই টাকার সুদে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে "ঠাকুর ল-লেকচার" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। "ঠাকুর আইন" অধ্যাপক দ্বাদশটি বক্তৃতা দিয়া নয় হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়া থাকেন। বাস্তবিক এরূপ লাভজনক পদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আর একটিও নাই। পূর্ব্বে মাসিক এক সহস্র টাকা ছিল, এক্ষণে উক্ত অধ্যাপকের মাসে নয়শত টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রসন্নকুমার মূলাযোড়ের সংস্কৃত বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণকল্পে ৩৫ হাজার টাকা দান করিয়া যান। তত্রত্য ঠাকুরবাড়ীর

সংলগ্ন সংস্কৃত বিদ্যালয়টি তাঁহারই প্রদত্ত টাকার উপস্বত্বের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। মূলাযোড়ের দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্যও তিনি এক লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। উইলে এতদ্ব্যতীত আরও প্রভূত দানের ব্যবস্থা ছিল। তদ্দ্বারা অনুগত স্বজন এক লক্ষ নয় হাজার, কর্ম্মচারী ও ভৃত্যবর্গ এক লক্ষ ছয় হাজার টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আরও অনেক প্রকার দানের ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন।

প্রসন্নকুমার গঙ্গাতীরে একটি বাঁধা ঘাটও নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। যতীন্দ্রমোহন পরে উহার সংস্কারসাধন ও শোভাবর্দ্ধন করেন।

প্রসন্নকুমারের শুঁড়াস্থিত উদ্যানে তাঁহার জীবিতাবস্থায় উইলিয়ম সাহেবের অনূদিত উত্তর-চরিতের প্রথম অঙ্ক ও জুলিয়স্ সিজারের পঞ্চম অঙ্ক ইংরাজী ভাষায় অভিনীত হইয়াছিল। সে জন্যও প্রসন্নকুমার যথেষ্ট অর্থ-ব্যয় করিয়াছিলেন। ব্যয়ে কোনও দিন তিনি বীতস্পৃহ ছিলেন না। তাঁহার সদ্ব্যয়ের বহু কাহিনী প্রবাদবাক্যের মত প্রচলিত আছে।

প্রসন্নকুমারের প্রস্তরমণ্ডিত প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া মহারাজ যতীন্দ্রমোহন, কলিকাতা সিনেট হলের সোপানোপরি প্রতিষ্ঠিত করেন। লর্ড রিপণ উক্ত প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচিত করিয়াছিলেন।

প্রসন্নকুমার যে উইলের দ্বারা পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে ত্যজ্য পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহনকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া যান, সেই উইল লইয়া দীর্ঘকাল বিচারালয়ে মোকদ্দমা হয়। পরিশেষে প্রিভি-কাউন্সিলের বিচারে ধার্য্য হয় যে, যতদিন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন জীবিত থাকিবেন, সমস্ত বিষয়ের উপস্বত্ব তিনিই ভোগ করিবেন। পরে সমস্ত বিষয় স্থায়িভাবে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের হস্তে আসিবে।

ধনীর দুলালগণ বিষয়ের ও অর্থের মালিক হইয়া যে সময় প্রায়ই বিলাসব্যসনে কালাতিপাত করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, সেই যুগে প্রসন্নকুমার আবির্ভূত হইয়া দেশবাসিগণের সমক্ষে এক অপূর্ব্ব আদর্শ রাখিয়া গিয়াছিলেন। পর্য্যাপ্ত পৈতৃক সম্পত্তি থাকিতেও তিনি নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার জন্য কি বিপুল চেষ্টাই না করিয়াছেন! এখনও এমন ধনীর দুলাল দেখিতে পাওয়া যায়—যাঁহারা কোনও প্রকার পরিশ্রমজনিত কার্য্যে যোগদান করাকে পদমর্য্যাদার বিরোধী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রসন্নকুমার অভিজাতবংশে জন্মিয়া, প্রচুর অর্থের মালিক হইয়া, কোনও দিন তাহা মনে করেন নাই। প্রথমতঃ নীলের কুঠী, তৈলের কল চালাইয়া তিনি ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জনের স্পৃহা চিরদিনই তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত ছিল। তাই আইন অধ্যয়ন করিয়া তিনি ব্যবহারাজীবের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, ইহার দ্বারা তিনি অপর্য্যাপ্ত অর্থ ও যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার দেশের সুসন্তান, দরিদ্রের বন্ধু, বিপন্নের আশ্রয়দাতা—সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রশংসার কথা তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের আদর্শ। ধনীর সন্তানগণ এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া স্বয়ং ধন্য হইতে পারেন, দেশবাসীর অশেষ মঙ্গলানুষ্ঠান করিতে পারেন। সঞ্চিত পৈতৃক অর্থে হাত না দিয়া নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারায় কি সুখ, কি তৃপ্তি, তাহা প্রসন্নকুমার ভোগ করিয়া গিয়াছেন, এবং উচ্চ আদর্শ স্বদেশবাসীর সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী সে আদর্শকে বরণ করিয়া নিজের ও জাতির সৌভাগ্যের পথ বাধামুক্ত করিবে কি?

দ্বারকানাথ ঠাকুর।

দ্বারকানাথ ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে, ১২০১ সালে কলিকাতা যোড়াসাঁকো ঠাকুর-প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কান্যকুব্জাগত ভট্টনারায়ণের পুত্র নৃসিংহ কুশারির বংশ হইতে উদ্ভূত। ইহাঁদের পূর্ব্ব-উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্ষণে 'ঠাকুর' নামে এই বংশ প্রসিদ্ধ। দ্বারকানাথের পিতামহেরা পাঁচ সহোদর। তন্মধ্যে দর্পনারায়ণ ও নীলমণি সুশিক্ষিত ও কর্ম্মী বলিয়াই প্রসিদ্ধিলাভ করেন। দ্বারকানাথের ঊর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষ জয়রাম তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের আদিনিবাস যশোহর হইতে বাস উঠাইয়া কলিকাতায় গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। তদবধি ঠাকুরবংশ কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দ্বারকানাথের পিতামহের নাম নীলমণি; পিতার নাম রামমণি। নীলমণি জজ-আদালতের সেরেস্তাদারী কার্য্য করিয়া যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেন। তাঁহার তিন পুত্র;—রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ। রামমণির দুই স্ত্রী। প্রথমার গর্ভে দ্বারকানাথ ও রাধানাথ, দ্বিতীয়ার গর্ভে রমানাথ জন্মগ্রহণ করেন। রামলোচন অপুত্রক ছিলেন, এজন্য তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারকানাথকে শাস্ত্রমতে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে দ্বারকানাথ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় কিছু বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। তৎপরে চিৎপুরস্থিত সেরবোর্ণ সাহেবের বিদ্যালয়ে ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। সামান্য প্রকার ইংরাজী শিক্ষার পর

তিনি বৈষয়িক কার্য্য পরিচালনায় প্রবৃত্ত হন। ক্রমশঃ দ্বারকা-নাথ উচ্চশ্রেণীর ইংরাজগণের সংসর্গে আসিয়া ইংরাজী ভাষা ভাল-রূপেই শিক্ষা করেন। নিজের যত্ন ও চেষ্টায় পরিণামে তিনি শাস্ত্রাদি আলোচনা দ্বারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। আইন শিক্ষা করিয়া প্রথমতঃ তিনি ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃতিত্বদর্শনে এতদ্দেশীয় রাজা, মহারাজ ও ইংরাজ ব্যবসায়ীরা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দ্বারকানাথ যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নরেন্দ্রপুর গ্রামনিবাসী প্রাণকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

এই সময়ে ২৪ পরগণার নিম্‌কি কালেক্টরের আফিসে সেরেস্তাদারী কার্য্য খালি হয়। দ্বারকানাথের পালক-পিতা বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালী জমীদার ছিলেন না; কিন্তু দ্বারকানাথের চালচালন যেরূপ বাড়িয়া-ছিল, তাহাতে উক্ত সম্পত্তির আয় তাঁহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। কাজেই অধিক অর্থ উপার্জ্জনের জন্য দ্বারকানাথকে এই পদ গ্রহণ করিতে হইল। এই পদে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করায় ক্রমে তিনি নিম্‌কি বোর্ডের দেওয়ান পদ লাভ করেন। দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত উক্ত কার্য্য পরিচালনের পর তিনি উক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ইউরোপীয় প্রণালীতে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক তাঁহার এই কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া পত্র দ্বারা দ্বারকানাথকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেন।

দ্বারকানাথ অতঃপর কয়েকজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ ও বাঙ্গালীর সহ-যোগিতায় একটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত করেন। ক্রমে তিনি রেশম, নীল ও চিনির

কুঠীও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাণীগঞ্জে তাঁহার কয়লার ব্যবসা ছিল চারিদিক্ হইতে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তিনি ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন।

দ্বারকানাথ স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে যেমন তৎপর ছিলেন, আবার পরের উপকারের জন্যও তাঁহার হৃদয় তেমনই প্রশস্ত ছিল। দেশের যাবতীয় মঙ্গলকর অনুষ্ঠানে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ দৃষ্ট হইত। সাধারণের উন্নতিজনক যাবতীয় ব্যাপারে তিনি অগ্রণী ছিলেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় "জমীদার সভা" প্রতিষ্ঠাতৃগণের তিনি অন্যতম। অধুনা উক্ত সভা "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন" নামে সুপরিচিত। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি অসহায় ও অন্ধদিগের সাহায্যার্থ ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীতে দেড় লক্ষ টাকা দান করেন। চব্বিশপরগণার দাতব্য চিকিৎসালয়েও তিনি লক্ষাধিক টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। কলিকাতায় কুষ্ঠাশ্রম প্রধানতঃ তাঁহারই অর্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বারকানাথের উৎসাহ, যত্ন এবং আগ্রহেই কলিকাতায় হিন্দুকলেজ ও মেডিকাল কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়।

বৈষয়িক বুদ্ধি যে দ্বারকানাথে অতিমাত্রায় বলবতী ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণরাশিরও তাঁহাতে অপ্রতুল ছিল না। একবার কোনও জেলার কোনও ইংরাজ জজ পীড়িত হইয়া বিলাতে যাইতেছিলেন। তাঁহার লক্ষাধিক টাকা ঋণ ছিল। ঋণ পরিশোধের সে সময়ে কোনও উপায় না করিতে পারিয়া সাহেব অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। তাঁহার উত্তমর্ণগণ তাঁহাকে কারাদণ্ড দিবার জন্য আয়োজন করিতেছে, এ সংবাদ পাইয়া পীড়িত শ্বেতাঙ্গ জজ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া দ্বারকানাথের শরণাপন্ন হইবার সঙ্কল্প করিলেন। সে সময়ে সাহেবেরা দ্বারকানাথকে উদারহৃদয় ও

মহৎ বলিয়াই জানিতেন। শ্বেতাঙ্গ জজসাহেব কিন্তু দ্বারকানাথের সহিত পরিচিত ছিলেন না। তিনি পত্রযোগে দ্বারকানাথকে সবিশেষ বিজ্ঞাপিত করিলেন। দ্বারকানাথ কালবিলম্ব না করিয়াই অনুসন্ধানে সাহেবের ঋণ যে প্রকৃত, তাহা বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি উত্তমর্ণগণকে লক্ষটাকা পরিশোধ পূর্ব্বক তাহাদের নিকট হইতে সাহেবের ঋণ-গ্রহণের স্বীকৃতি পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। এই সকল কার্য্যের পর একদা তিনি উক্ত জজসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। সাহেব তখন নিজের বিপদের বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বিবৃত করিতে লাগিলেন। দ্বারকানাথ তখন গম্ভীরভাবে সাহেবের হস্তলিখিত অঙ্গীকার লিপিগুলি তাঁহার সম্মুখে বাহির করিলেন। সাহেব বুঝিলেন, দ্বারকানাথের মহানুভবতায় তিনি ঋণমুক্ত। কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। জজসাহেব তখন লক্ষটাকার অঙ্গীকারলিপি প্রদানে উদ্যত হইলেন দ্বারকানাথ উহা গ্রহণ করিলেন না। পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সাহেব যদি পুনরায় কর্ম্মভার গ্রহণ না করিতে পারেন, তবে ঐরূপ স্বীকারোক্তি লইয়া কোনও লাভ হইবে না। রোগমুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলে তখন সাহেব অবশ্যই তদীয় ঋণ পরিশোধ করিবেন। দ্বারকানাথের এই প্রকার যুক্তিতে সাহেব নিরস্ত হইয়াছিলেন। পরিণামে উক্ত জজসাহেব স্বাস্থ্যলাভ করিয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া দ্বারকানাথের ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন।

এই প্রকারের দয়া ও বদান্যতার কার্য্য দ্বারকানাথ বহুবার করিয়াছিলেন। বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে জানাইলেই তিনি যে কোনও উপায়ে বিপন্নের সাহায্য করিতেন। সুপারিশ করিয়া বহু লোকের চাকরীও

তিনি করিয়া দিতেন। একবার তাঁহার পরম হিতৈষী প্লাউডেন সাহেব তাঁহার অনুরোধে অনেকগুলি ব্যক্তিকে চব্বিশপরগণার কালেক্টরীতে চাকরী করিয়া দেন। প্লাউডেন সাহেব তখন চব্বিশপরগণার হাকিম ও কলেক্টর। উক্ত কর্ম্মচারিবর্গের মধ্যে একজন সরকারী তহবিল হইতে কিছু অর্থ অপহরণ করে। সরকার বাহাদুর প্লাউডেন সাহেবকে ক্ষতিপূরণ করিতে আদেশ দেন। দ্বারকানাথ এই সংবাদ পাইয়া সাহেবকে পত্র লিখিয়া বলেন যে, তাঁহারই অনুরোধে সাহেব উক্ত ব্যক্তিকে কর্ম্ম দিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিই (দ্বারকানাথ) উক্ত ক্ষতিপূরণ করিতে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। প্লাউডেন সাহেব এজন্য দ্বারকানাথের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক পত্র লিখিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ হিন্দুকলেজকে ভারতবর্ষের যাবতীয় উন্নতির দ্বারস্বরূপ মনে করিতেন। হিন্দুকলেজের যাহাতে উন্নতি হয়, এ বিষয়ে দ্বারকানাথ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাসমিতির তিনি একজন সভ্যও ছিলেন। ১২৪৩ সালে মেডিকেল কলেজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বারকানাথ উহার ছাত্রবর্গের উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য তিন বৎসর অন্তর দুই সহস্র টাকা পারিতোষিকস্বরূপ প্রদান করিতেন। শুধু স্বদেশীয় ছাত্রবর্গের জন্যই এই দান নির্দ্দিষ্ট ছিল। শবব্যবচ্ছেদের সময় হিন্দু ও বাঙ্গালী ছাত্রগণ শবদেহ স্পর্শ করিতে প্রথমতঃ ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করেন। দ্বারকানাথ এই ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া, কলেজের ব্যবচ্ছেদগৃহে প্রত্যহ উপস্থিত হইয়া ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিতেন যে, ইহাতে অধর্ম্ম হইবে না। পুনঃ পুনঃ এইরূপ চেষ্টায় ছাত্রগণের ভ্রান্ত ধারণা ক্রমশঃ দূরীভূত হয়।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক তখন ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা। তাঁহার শাসন-গুণে ভারতবাসীরা সকলেই তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়াছিল। দ্বারকানাথ বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরকে সংস্কৃত কলেজগৃহে সমাদরে আহ্বানপূর্ব্বক এক অভিনন্দন-পত্র দান করেন। সে সভাস্থলে দেশের যাবতীয় গণ্য-মান্য ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। এই অভিনন্দন পত্রের উত্তরে রাজপ্রতিনিধি মহোদয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই কথাই বুঝায় যে, দ্বারকানাথ ইংরাজ-শাসনের ফলাফল যেমন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, আর কেহ তেমন সম্যক্ অনুভব করিতে পারেন নাই।

১২৪২ সালে ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তৃত হয় নাই। সেই সময়ে দ্বারকানাথ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে যাত্রা করেন। ডাকের গাড়ীতেই তিনি যাবতীয় তীর্থস্থল দর্শন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে গিয়া তিনি তথায় প্রভূত অর্থ-ব্যয় করেন, অন্নদানেরও বন্দোবস্ত করিয়া-ছিলেন। সম্প্রদায়বিশেষের উপর তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ছিল না। আগ্রা-দুর্গ সন্দর্শনকালে কতিপয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সৈনিক তাহাদিগের উপাসনা-মন্দিরের শোচনীয় অবস্থার কথা বিবৃত করায় তিনি উপাসনাগৃহ-সংস্কারের জন্য পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছিলেন। তিনি অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনও দিন ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না।

সংবাদপত্রের বহুল প্রচারে দেশের উন্নতিসাধন অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া দ্বারকানাথ বাঙ্গালা ও ইংরাজী সংবাদপত্র সমূহকে সবিশেষ উৎসাহ দান করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দ্বারা পরিচালিত "প্রভাকর"কে তিনি স্নেহের চক্ষে দর্শন করিতেন; অনেক সময় অর্থ দ্বারা ঈশ্বর গুপ্তকে সাহায্যও করিতে বিরত ছিলেন না। "জ্ঞানান্বেষণ" নামক মাসিক পত্রের তদানীন্তন

সম্পাদক রসিককৃষ্ণ মল্লিক একদা স্বীয় সংবাদপত্রে দ্বারকানাথ সম্বন্ধে কতকগুলি নিন্দাবাদ প্রচার করেন। এই ব্যাপারে দ্বারকানাথের কতিপয় বন্ধু উক্ত সম্পাদককে রীতিমত প্রহার করিবার পরামর্শ প্রদান করেন; কিন্তু সুচতুর দ্বারকানাথ তাঁহাদের পরামর্শ গ্রাহ্য করেন নাই। একদা একটি ভোজে তিনি রসিক বাবুকেও নিমন্ত্রণ করেন। তার পর তাঁহাকে কিনরনম্রভাবে বুঝাইয়া দেন যে, সম্পাদক তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই ঘটনা হইতে দ্বারকানাথের চরিত্র সম্বন্ধে উক্ত সম্পাদকের ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

১২৪৬ সালে সার চার্লস্ মেটকাফ্ বাহাদুর মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন। এই মহৎ ব্যাপারের জন্য দ্বারকানাথ প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় ভারতবর্ষ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

দ্বারকানাথ ইউরোপীয় ও দেশীয়গণের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম লাভ করিয়াছিলেন। নিজের কার্য্যদক্ষতাগুণে তিনি প্রকৃতই সে সময়ে দেশের সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশীয় যাবতীয় মঙ্গলানুষ্ঠানে তাঁহার যোগ ছিল। গবর্ণমেণ্টও প্রত্যেক কল্যাণজনক অনুষ্ঠানে দ্বারকানাথের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন; দ্বারকানাথও নির্ভীক-ভাবে আপনার মত ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। পদস্থ ইংরাজ কোনও দোষ করিলে, তিনি তাঁহার মুখের উপর তাঁহার দোষ ও ত্রুটীর উল্লেখ করিতেন। এইরূপে তিনি তদানীন্তন বহু সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয়ের চরিত্র-সংশোধন করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ বেলগেছিয়ায় একটি মনোরম উদ্যানবাটিকা রচনা করিয়াছিলেন। তেমন চমৎকার প্রমোদভবন তখন

এ দেশে কোনও বিলাসী বাঙ্গালীর ছিল না। গবর্ণর জেনারেল পর্য্যন্ত সেই উদ্যান-বাটিকায় প্রায়ই নিমন্ত্রণে যাইতেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী (১২৪৯ সালে) তারিখে "ইণ্ডিয়া" নামক অর্ণবযানে আরোহণ পূর্ব্বক দ্বারকানাথ বিলাতযাত্রা করেন। তাঁহার ভ্রাতা রমানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়, দ্বারকানাথের ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রাইভেট সেক্রেটারী পরমানন্দ মৈত্র তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করেন। বিলাত-যাত্রার একখানি দিনলিপি দ্বারকানাথ রচনা করিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার সমুদয় বিবরণ তিনি লিখিয়া রাখিয়াছেন। বিলাতে গিয়াই তিনি সেখানকার সম্ভ্রান্ত-সমাজে সমাদরে অভ্যর্থিত হন।

২২শে জুন তারিখে কোর্ট অব্ ডাইরেক্টারের সভ্যবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া লণ্ডন নগরের কোনও প্রসিদ্ধ স্থানে একটি মহতী সভার আহ্বান করিয়া দ্বারকানাথের সংবর্দ্ধনা করেন। ক্রমশঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও রাজপরিবারস্থ যাবতীয় ব্যক্তি এবং ইংলণ্ডের অভি-জাত-সম্প্রদায়ভুক্ত যাবতীয় প্রধান প্রধান লোকের সহিত দ্বারকা-নাথ পরিচিত হইয়াছিলেন। সকলেই বিশেষ সম্মান সহকারে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করেন। মহারাণী কর্ত্তৃক প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইয়া দ্বারকানাথ তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। এই ভোজে মহারাণীর স্বামী প্রিন্স আলবার্ট ও রাজপরিবারস্থ আরও অনেক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মহারাণী দ্বারকানাথকে তিনটি স্বর্ণমুদ্রা উপহার প্রদান করেন। উক্ত মুদ্রাত্রয় সেই দিনই মুদ্রিত হইয়াছিল।

মহারাণীর অনুরোধে দ্বারকানাথ ইংলণ্ডের সৈন্য-সম্মিলন পরিদর্শন করেন। সে দিন মহারাণী তাঁহার স্বামী ও খুল্লতাত প্রভৃতি সমভিব্যাহারে দ্বারকানাথকে অশ্বারোহী সেনাদলের রণ-নৈপুণ্যের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। মহারাণী স্বয়ং দ্বারকানাথকে সেই রণ-কৌশল বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এরূপ সৌভাগ্য কোনও বাঙ্গালীর অদৃষ্টে কখনও ঘটে নাই।

মহারাণী দ্বারকানাথকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। একদিন তিনি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের অন্তঃপুরের মধ্যেও লইয়া গিয়াছিলেন; সেখানে গিয়া আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভৃতির সহিত দ্বারকানাথের পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ইংলণ্ডের যে কোন অভিজাতবংশীয় সম্ভ্রান্ত ইংরাজের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, তিনি সেইখানেই বিশেষ সমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। স্কটল্যাণ্ডেও দ্বারকানাথ বিশেষরূপ সম্মান পাইয়াছিলেন।

বৃষ্টলে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি ছিল। পরম বন্ধুর সমাধিদর্শনার্থ দ্বারকানাথ বৃষ্টলে গিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি ফরাসীরাজ্যদর্শনার্থ গমন করেন। বিদায়ের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিত হইয়া দ্বারকানাথকে "বিদায় অভিনন্দন" প্রদান করেন। প্যারী নগরীতেও তিনি মহাসমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। প্যারী নগরীতে অবস্থানকালে ইংলণ্ডের ডাইরেক্টর-সভার নিকট হইতে তিনি একখানি অভিনন্দনপত্র ও একটি স্বর্ণ-পদক লাভ করেন। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই ঐ প্রকারে তিনি সম্মানিত হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথের অনুরোধে মহারাণী ও তাঁহার স্বামী প্রিন্স

আলবার্ট তাঁহাদের দুইখানি তৈলচিত্র কলিকাতাবাসিগণকে উপহার প্রদান করেন। টাউন হলে অদ্যাপি সেই দুইখানি চিত্র বিদ্যমান আছে।

ইতালীর রাজধানী রোম নগরে ভ্রমণকালে ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায়ের শিরোমণি পোপ মহোদয় দ্বারকানাথের বিশেষ সম্মান করেন। ফরাসী-সম্রাট লুই ফিলিপ্, প্রুসিয়ার রাজকুমার ও বেলজিয়মের রাজা এবং রাণী তাঁহাকে বিশেষরূপে সম্মানিত করিয়াছিলেন। প্রুসিয়ার রাজকুমার ফ্রেডরিকের সহিত দ্বারকানাথের বিশেষ সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। বিদুষী মিসেস্ সমরভাইলের সহিতও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইযাছিলেন।

এক বৎসর পরে দ্বারকানাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইউরোপ-ভ্রমণকালে তিনি মহাসমারোহে অবস্থান করিতেন, এজন্য তিনি "ইণ্ডিয়ান প্রিন্স" নামে তথায় অভিহিত হইতেন। তদবধি তিনি "প্রিন্স" আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। স্বদেশে ফিরিবার পর সমাজ তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য বিধান দিলেন; কিন্তু দ্বারকানাথ সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। মনে জ্ঞানে হিন্দু হইলেও প্রায়শ্চিত্তর দ্বারা সমাজে পাংক্তেয় হইবার আগ্রহ তিনি প্রকাশ করিলেন না।

১২৫১ সালে, ইংরাজী ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি পুনরায় ইংলণ্ডভ্রমণে যাত্রা করেন। কায়রো নগরে মিশরের রাজপ্রতিনিধি ও নেপলস্ সহরে তদানীন্তন ইতালীর নরপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উভয়েই তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবারও ভারতেশ্বরী মহারাণী তাঁহাকে যথোপযুক্তরূপে সম্মানিত করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রাকালে ভোলানাথ বসু ও সূর্য্যকুমার বা গুডিব

চক্রবর্ত্তী নামক দুই জন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রকে উত্তমরূপে চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইবার জন্য সঙ্গে করিয়া বিলাতে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধ্যয়নের যাবতীয় ব্যয় তিনি স্বয়ং বহন করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের দেখাদেখি গবর্ণমেণ্ট আরও দুইটি ছাত্রকে চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইবার জন্য বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন।

বিলাতে অবস্থানকালে একদা কোনও ভোজসভায় দ্বারকানাথ অকস্মাৎ পীড়িত হইয়া পড়েন। ডাক্তারগণের পরামর্শানুসারে তিনি বায়ু-পরিবর্ত্তন করিতে যান। মাসাধিক কাল নানাস্থানে বায়ু-পরিবর্ত্তনার্থ গমন করিয়াও তিনি নিরাময় হইতে পারিলেন না। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের (১২৫৩ সাল) ১লা আগষ্ট তারিখে সবিরাম জ্বরে বেলফাষ্ট নগরে তিনি ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার মাত্র ৫২ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়া কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইবে, ইহা লইয়া সে সময় অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। সঙ্গে পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তাঁহারা তখন বালকমাত্র। সুতরাং কেলসান গ্রীন্ নামক রমণীয় স্থানে তাঁহার শবদেহ সমাহিত হয়। সমাধিগাত্রে রজতফলকে দ্বারকানাথের নাম ও পরিচয় ক্ষোদিত হইয়াছিল।

দ্বারকানাথ ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কি স্বদেশবাসী কি ইউরোপবাসী সকলেই আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন বটে; কিন্তু পরিশেষে রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমতকে মানিয়া চলিতেন; প্রত্যহ স্নানের পর নিয়মিতভাবে উপাসনাদি করিতেন। ধর্ম্মানুষ্ঠানব্যাপারে তিনি প্রাচীন আর্য্য-রীতিরই

অনুসরণ করিতেন। যে যুগে দ্বারকানাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার মত ক্ষমতাশালী বাঙ্গালী আর কেহই যে বাঙ্গালাদেশে ছিলেন না, ইহা অত্যুক্তি নহে।

দ্বারকানাথ যে শ্রেণীর বাঙ্গালী ছিলেন, সে শ্রেণীর বাঙ্গালী এখন এ দেশে দুর্লভ। আপনার চেষ্টায় বিপুল বিত্ত ও সম্পত্তির মালিক হইয়া সেই অর্থ লোকহিতকর অনুষ্ঠানে ও বিলাসে তুল্যরূপে ব্যয় করিবার মত শক্তিধর বাঙ্গালী এখন বিরল। দ্বারকানাথ স্বদেশের হিতানুষ্ঠানে যেমন কল্পতরু ছিলেন, ভোগবিলাসের জন্যও তেমনই মহাসমারোহে অর্থ-ব্যয় করিতেন। তাঁহার এই প্রকার আমীরী চালের কত কাহিনীই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। দ্বারকানাথ অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। আরও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিলে দেশবাসীর মঙ্গলানুষ্ঠানে বোধ হয় তিনি অধিকতর সামর্থ্য প্রকাশ করিতে পারিতেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাব তাঁহাকে ঘর হইতে বাহিরে টানিয়াছিল—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু সেটা যুগধর্ম্ম; রামমোহন বা দ্বারকানাথের মত স্বাধীনচেতা বাঙ্গালীও তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ইহা বাঙ্গালার পক্ষে কোনও কোনও বিষয়ে ক্ষতির কথা সন্দেহ নাই; তথাপি স্বদেশ-বাসীর প্রতি মমত্ববোধ এবং তজ্জনিত চেষ্টা তাঁহাদের কার্য্যাবলীকে বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

রামগোপাল ঘোষ।

১২২১ সাল, ইংরাজী ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর বা আশ্বিন মাসে রামগোপাল ঘোষ তদীয় মাতামহ দেওয়ান রামপ্রসাদ সিংহের কলিকাতাস্থিত ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, জাতিতে কায়স্থ; পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ ত্রিবেণী তীর্থের সন্নিকটবর্ত্তী বাগাটী গ্রাম। রামগোপালের পিতামহ কলিকাতাস্থিত কিং হ্যামিলটন্ কোম্পানীর আপিসে কর্ম্ম করিতেন। পিতা গোবিন্দচন্দ্র চীনাবাজারে একখানি সামান্য কাপড়ের দোকান করিয়াছিলেন।

রামগোপাল শৈশবে শেরবোরন্ সাহেবের ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তার পর তিনি হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। হিন্দু কলেজের বেতন দিয়া পুত্রকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার মত অবস্থা গোবিন্দের ছিল না; কিন্তু ঘটনাক্রমে উক্ত কলেজে রামগোপালের পাঠের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। একদা কোন আত্মীয়া কন্যার বিবাহ উপলক্ষে রামগোপাল তাৎকালীন প্রথা অনুসারে বরপক্ষীয় বালকগণের সহিত নানা প্রকার কৌতুক করিতেছিলেন। অর্থহীন ইংরাজীতে তিনি সভাস্থ সকলকেই এমন হাসাইতেছিলেন যে, কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি তাঁহার উচ্চারণভঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া বলেন যে, ভালরূপ ইংরাজী শিক্ষা করিলে এই বালক কালে উৎকৃষ্ট বক্তা হইতে পারিবে। রামগোপাল হিন্দু

কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য পিতাকে ধরিয়া বসিলেন। এই ঘটনার কথা জানিতে পারিয়া কিং হ্যামিলটন কোম্পানীর রজার্স সাহেব রামগোপালকে হিন্দু-কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া তাঁহার বেতন-ব্যয় নিজে দিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন।

অসাধারণ প্রতিভাশালী রামগোপাল দীর্ঘকাল বেতন দিয়া কলেজে পড়েন নাই। মহামতি হেয়ার সাহেব বালক রামগোপালের মেধাশক্তির পরিচয় পাইয়া অবৈতনিক ছাত্রদলে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রামগোপাল কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। যখনই যে শ্রেণীতে তিনি পড়িতেন, পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠস্থান তাঁহারই অধিকারভুক্ত ছিল। এই সময় হেনরী লুই ডিরোজিও নামক জনৈক নবীন ফিরিঙ্গী হিন্দু-কলেজে শিক্ষক হইয়া আসেন। তাঁহার অধ্যাপনা-প্রণালী ও পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। এই চিন্তাশীল ও তার্কিক শিক্ষক বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাদানে পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া, কলেজের কয়েকজন বাছা-বাছা ছাত্র লইয়া একটি বিশেষ শ্রেণী স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ের ছুটীর পর এই শ্রেণীতে তিনি উচ্চতর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী ও রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি এই শ্রেণীর ছাত্র হইয়াছিলেন। ডিরোজিও লক্, রিড্, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক-গণের গ্রন্থাবলম্বনে ছাত্রগণকে উপদেশ দিতেন। ডিরোজিওর শিক্ষা-প্রণালীতে ছাত্রগণ ইংরাজী ভাষায় অত্যন্ত ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগি-লেন, তাঁহাদের চিন্তাশক্তি, তর্কশক্তি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; কিন্তু সেই সঙ্গে জাতীয় ধর্ম্ম ও আচার-পদ্ধতির বন্ধন শিথিল হইয়া গেল। সুরাপান

ও বিজাতীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছাত্রগণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল। ক্রমে যখন ছাত্রগণের ব্যবহার সীমা অতিক্রম করিয়া গেল, তখন কলেজের অধ্যক্ষ ও পরিচালকবর্গের নির্দ্দেশক্রমে ডিরোজিও কলেজ পরিত্যাগ করেন। রামগোপালেরও পাঠ সেই সঙ্গে শেষ হইয়া গেল। তিনিও শিক্ষকের সহিত কলেজ ত্যাগ করেন।

সপ্তদশ বৎসর বয়সে রামগোপাল কলেজ ছাড়িয়া জোসেফ নামক জনৈক ইহুদী বণিকের আপিসে কার্য্যারম্ভ করেন। জোসেফ রামগোপালের কার্য্যদক্ষতা, পরিশ্রম করিবার সামর্থ্য ও বিদ্যাবুদ্ধি দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। প্রভুর নির্দ্দেশ অনুসারে একবার রামগোপাল এ দেশের উৎপন্ন ও শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভারের রপ্তানী সম্বন্ধে এরূপ একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহাতে জোসেফ রামগোপালের উপর অত্যন্ত প্রীত হন। এই তালিকায় অবশ্যজ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় সকল সংবাদই রামগোপাল সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। চাকরী করিতে করিতেও রামগোপাল মনোযোগ সহকারে কাব্য, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা করিতেন। সেক্‌সপীয়ারের নাটকাবলীর প্রতি তাঁহার সমধিক আকর্ষণ ছিল। নিজের বাড়ীতে অনেক সময় বন্ধুবান্ধব-পরিবৃত হইয়া সেক্সপীয়ারের অমর রচনাবলীর কাব্য-মাধুর্য্য উপভোগ করিতেন; প্রতি শনিবার হিন্দু-কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবৃন্দের সহিত ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনায় যাপন করিতেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বাগানে সাহিত্যের আলোচনার জন্য একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই সভায় রামগোপাল প্রায়ই বক্তৃতা করিতেন। এইখানেই

রামগোপালের বক্তৃতা-শক্তির উন্মেষ ও পরিপুষ্টি ঘটে। তাঁহার বাগ্মিতা ক্রমে তদানীন্তন বড় লাটেরও শ্রুতিগোচর হইয়াছিল।

রামগোপালের সতীর্থ রসিককৃষ্ণ মল্লিক ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে "জ্ঞানান্বেষণ" নামক একখানি সংবাদপত্রের প্রচার করেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধ মুদ্রিত হইত। রামগোপাল এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। রাজনীতি ও দেশীয় বাণিজ্যবিষয়ক প্রবন্ধাদি রচনার ভার রামগোপালের উপরেই অর্পিত ছিল।

ভারত সরকার যখন "আমদানী দ্রব্যের উপর শুল্ক থাকিবে কি উঠিয়া যাইবে," এই ব্যাপারের আলোচনায় বিব্রত, সেই সময় রামগোপাল ছদ্ম নামে "জ্ঞানান্বেষণে" কতিপয় প্রবন্ধ লেখেন। ঐ সকল প্রবন্ধ উক্ত অকল্যাণকর শুল্করহিত-বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। "জ্ঞানান্বেষণ" বন্ধ হইয়া গেলে "বঙ্গদর্শক" (Bengal Spectator) নামক পত্রে রামগোপাল সময়ে সময়ে প্রবন্ধ রচনা করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্র) সহোদর কিশোরীচাঁদ মিত্র উক্ত পত্রের সম্পাদক ছিলেন।

রামগোপাল অপেক্ষাকৃত স্বল্পবেতনে ইহুদী বণিক জোসেফের কার্য্যালয়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু কর্ম্মদক্ষতাগুণে শীঘ্রই তাঁহার বেতন ও পদবৃদ্ধি ঘটিল। কেল্‌সেল নামক জনৈক ধনবান্ বণিক জোসেফের কুঠীর অংশী হইলে, রামগোপালও সেই কুঠীর মুচ্ছুদ্দী হইলেন। রামগোপালের কার্য্যতৎপরতায় কুঠীর যথেষ্ট উন্নতি ঘটে; কিন্তু অংশীদ্বয়ের ভিতর কোনও কারণে সেই সময় মনান্তর হওয়ায় কেল্‌সেল ও জোসেফ স্বতন্ত্রভাবে কারবার চালাইতে লাগিলেন। রামগোপাল কেল্‌সেল

সাহেবেরই কার্য্যে যোগদান করেন। রামগোপাল তীক্ষ বুদ্ধি ও পরিশ্রমপ্রিয়তার সাহায্যে অবিলম্বে উক্ত কারবারের অংশী হন। তখন সেই কোম্পানীর নাম "কেল্‌সেল ঘোষ এণ্ড কোং" নামে সাধারণে পরিচিত হয়। পরে নানা কারণে কেল্‌সেল সাহেবের সহিতও রামগোপালের দীর্ঘকাল প্রণয় অটুট রহিল না। রামগোপাল স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে "R. G Ghosh Co" নামে একটি কারবার প্রতিষ্ঠা করেন। এ কার্য্যেও তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইয়াছিল।

১২৫৭ সালে রামগোপাল বণিক্-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সামান্য অবস্থা হইতে এই প্রকার উন্নতিলাভে সাধারণতঃ মানুষের স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; কিন্তু রামগোপালের মনে দম্ভ বা অহঙ্কারের ছায়াপাতমাত্র ঘটে নাই। তিনি পূর্ব্ব-বন্ধুগণের সহিত বন্ধুত্ব সমানভাবেই বজায় রাখিয়াছিলেন। রামগোপাল স্বভাবতঃ বন্ধুবৎসল ছিলেন। বন্ধুবর্গের মঙ্গলের জন্য তিনি সর্ব্বদাই সমুৎসুক ছিলেন। এক দিন যদি বন্ধুগণ তাঁহার বাড়ীতে না আসিতেন, তাহা হইলে রামগোপাল অস্থির হইয়া পড়িতেন, অমনই তাঁহাদের সন্ধানে নিজেই বাহির হইতেন। শরীর, মন ও অর্থ দিয়া তিনি সর্ব্বদাই বন্ধুগণের সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার বন্ধুপ্রীতি আদর্শস্বরূপ। উত্তরকালে তাঁহার শৈশব-সহচর রসিককৃষ্ণ মল্লিক পীড়িত হইয়া কলিকাতায় আসিলে রামগোপাল নিজের গঙ্গাতীরবর্ত্তী বাগানবাড়ীতে তাঁহাকে রাখিয়া তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

রামগোপালের বক্তৃতাশক্তি যে সময় বিকসিত হইতেছিল, সেই সময় দ্বারকানাথ ঠাকুর জর্জ্জ টম্‌সন্ নামক জনৈক সহৃদয় বিখ্যাত ইংরাজ

বাগ্মীকে লইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। রামগোপাল জর্জ্জ টম্সনের আগমনসংবাদে অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া তাঁহাকে সভায় লইয়া আসেন। রাজনীতি-সংক্রান্ত বক্তৃতা পার্লামেণ্টে যে ভাবে হইয়া থাকে, টম্সনের বক্তৃতা সেই শ্রেণীর। তিনি রামগোপাল প্রভৃতির উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বক্তৃতার দ্বারা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার পর হইতেই রামগোপালের সভার প্রকৃতি ও নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। পরিণামে ঐ সভার নাম "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী" হয়।

যাহাদের সামর্থ্য অল্প, বুদ্ধিবিদ্যা যৎসামান্য, রামগোপাল এরূপ ব্যক্তির জন্য সাহায্যের দ্বার মুক্ত করিয়া রাখিতেন। স্বদেশবাসীর লেখাপড়া-শিক্ষার প্রসার যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, সে বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ চেষ্টা ও আগ্রহ ছিল। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। একবার কোনও নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে তিনি সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দান করিয়াছিলেন। অন্য আর এক সময় সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মার্সমান সাহেবের রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাস নিজ ব্যয়ে শতাধিক খণ্ড ক্রয় করিয়া ছাত্রগণকে পারিতোষিক দিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্রদিগকে তিনি প্রতি বৎসর স্বর্ণ ও রৌপ্য-পদক প্রদান করিতেন।

সে সময়ে বিলাতযাত্রার জন্য সামাজিক নিগ্রহ অত্যন্ত প্রচণ্ড ছিল। কলিকাতা মেডিকাল কলেজের চারিটি ছাত্র যখন বিলাতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য যাত্রার আয়োজন করেন, সেই সময় রামগোপাল স্বয়ং একরাত্রি জাহাজে গিয়া ছাত্রগণের সহিত যাপন করেন। পাছে সামাজিক শাসনের ভয়ে ছাত্রগণ শেষ পর্য্যন্ত বিলাতগমনে নিরুৎসাহ হইয়া না পড়ে, এ নিমিত্ত তিনি তাহাদিগের সহিত এক রাত্রি যাপন

করিয়াছিলেন। কলিকাতায় যখন বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সময় রামগোপাল অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য তিনি আপনার কন্যাকে তথায় প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। দেশের যাবতীয় মঙ্গলানুষ্ঠানে রামগোপাল অগ্রণী ছিলেন।

১২৫৩ সাল পর্য্যন্ত রামগোপাল নিরুদ্বেগে কুঠার কার্য্য চালাইয়াছিলেন; কিন্তু ১২৫৪ সালে যাবতীয় ইংরাজ ব্যবসাদারের কার্য্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়। বহুসংখ্যক ব্যবসায়ীকে সেই বৎসর দেউলিয়া হইয়া যাইতে হয়। রামগোপালও বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রাপ্য টাকার বিল তিনি বিলাতের বণিক্‌দিগের নিকট পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু বাণিজ্যের অবস্থা তখন অত্যন্ত আশঙ্কাজনক, তিনি প্রাপ্য টাকা পাইবেন কি না, সে বিষয়ে ঘোরতর সংশয় ছিল। সে টাকা না পাইলে, রামগোপালকে একেবারে পথে বসিতে হইবে—এইরূপ অবস্থা। হিতচিকীর্ষুগণ রামগোপালকে পরামর্শ দিলেন যে, তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি ইত্যবসরে 'বেনামী' করিয়া ফেলুন; কিন্তু সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক রামগোপাল এই ঘৃণিত প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রকাশ করেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত সেই সময় বলিয়াছিলেন যে, ঋণ-পরিশোধের জন্য যদি পরিধেয় বসনখানি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হয়, তিনি তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইবেন না। সত্যনিষ্ঠার পুরস্কার আছেই। রামগোপালের সৌভাগ্যবশতঃ বিলাতের বণিকৃগণ তাঁহার প্রাপ্য টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং ব্যবসায়-জগতের সেই ঘোরতর দুর্দ্দিনেও তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই।

বাঙ্গালা সরকার রামগোপালের কৃতিত্ব, পাণ্ডিত্য এবং বক্তৃতা-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ছোট আদালতের বিচারপতির পদ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন ; রামগোপাল সে পদ পরিত্যাগ করেন নাই। এই সময়েই তিনি স্বাধীনভাবে নিজের নামে কারবার খুলিয়াছিলেন। ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাঁহার এমনই সুযশঃ ছিল যে, প্রয়োজন হইলে বিনা খতে তিনি লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ঋণস্বরূপ পাইতেন। সকলেই জানিত, রাম-গোপাল কাহাকেও বঞ্চনা করিবেন না, বরং পৃথিবীতে যাহা অসম্ভব, তাহাও ঘটিতে পারে ; কিন্তু রামগোপাল ঘোষের বাক্য মিথ্যা হইবে না, এমনই একটা প্রবাদবাক্য সে সময়ে প্রচলিত ছিল।

রামগোপালের সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালী ও শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে মনো-বাদ চলিতেছিল। সাহেবগণ মনে করিতেন যে, বাঙ্গালীরা এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদের খাতির-যত্ন করেন না। শিক্ষিত বাঙ্গালীরা তখন শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রদায়ের সহিত সমান স্বত্ব ও অধিকারের দাবী করিতে-ছিলেন। রামগোপালই এই মতের সমর্থক ছিলেন। এজন্য শ্বেতাঙ্গ-গণ রামগোপালের বিরুদ্ধাচরণ করেন। রামগোপালের দুর্নাম রটনার জন্যও বহু শ্বেতাঙ্গ সে সময়ে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। রামগোপালও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না ; তিনিও আত্মপক্ষসমর্থন ও সাহেবদিগের অস্বাভাবিক ব্যবহারের পরিচয় দিয়া একখানি পুস্তিকার প্রচার করেন। স্বদেশ, বিদেশ সর্ব্বত্রই ঐ পুস্তিকার বিশেষ সমাদর হইয়াছিল।

কলিকাতায় গড়ের মাঠে লর্ড হার্ডিঞ্জের যে অশ্বারূঢ় প্রস্তর-মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাহা রামগোপালের কল্পনাপ্রসূত। লর্ড হার্ডিঞ্জের স্মৃতিরক্ষাকল্পে যে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে কয়েক জন প্রতিপত্তিশালী ইংরাজ

ঐ মূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু রামগোপালের ওজস্বিনী বক্তৃতাশক্তির প্রভাবে রামগোপালের মতই প্রতিষ্ঠিত হয়। কোনও বিষয়ের অনুসন্ধান বা তত্ত্বাবধান করিবার জন্য সরকার বাহাদুর যখনই কোনও কমিটী নিযুক্ত করিতেন, তাহার প্রত্যেকটির সহিত রামগোপালের সংস্রব থাকিত। ১২৫৫ সালে তিনি কলিকাতার "ডিষ্ট্রিক্ট" দাতব্য সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

স্বদেশবাসিগণের সিবিল সার্ভিস ও ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের পথ মুক্ত করিবার জন্য রামগোপাল বহুসংখ্যক গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার গৈরিকধারা-নিঃসৃত বক্তৃতাবলী শ্রোতার হৃদয়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিত। বিলাতের "টাইমস্" পত্র রামগোপালকে বাঙ্গালার "ডিমস্থিনীশ" পদবী প্রদান করিয়াছিলেন।

কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটী নিমতলার শ্মশানঘাট স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করেন। তাঁহাদের নির্ব্বাচিত স্থানটি কলিকাতা সহর হইতে বহু দূরবর্ত্তী। অত দূরে দাহঘাট নির্দ্দিষ্ট হইলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে কলিকাতাবাসীর ঘোরতর অসুবিধা হইবে। রামগোপাল মিউনিসিপ্যালিটীর এই অবিবেচনাকর কার্য্যের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার চেষ্টায় পরিণামে নিমতলার শ্মশানঘাট পূর্ব্ববৎ সেইখানেই রহিয়া গেল।

প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাঙ্গণে ডেভিড হেয়ার সাহেবের যে প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, উহা সংস্থাপনের জন্য রামগোপালই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। কথিত আছে, অনেকেই উক্ত প্রস্তর-মূর্ত্তি নির্ম্মাণের বিরোধী ছিলেন। রামগোপাল তাঁহার এক মাসের আয় দিয়া, হেয়ারের শিষ্য-বর্গকে এক এক মাসের উপার্জ্জন দান করিবার নিমিত্ত এক অনুরোধ-পত্র

প্রচার করেন। তাহার ফলে অনেকেই ঐরূপ অর্থদান করিয়াছিলেন। সেই অর্থেই হেয়ারের প্রস্তর-মূর্ত্তি নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রামগোপাল ছোট লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস-কমিটীর সভ্য, চেম্বার অব কমার্সের সদস্য প্রভৃতি পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া স্বদেশের নানারূপ মঙ্গলানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল গুরুশ্রমে রামগোপালের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। তিনি সর্ব্বপ্রকার চিন্তা ও কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনবাসের আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। পীড়া ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ১২৬৩ সালের দুর্ভিক্ষে যে সকল আশ্রয়হীন বালক-বালিকা সরকারের আশ্রয়ে আসিয়াছিল, খৃষ্টান পাদরীরা ভার লইয়া তাহাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রস্তাব হইতে লাগিল। রামগোপাল তখন অসুস্থ; কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রতিবাদের জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ ব্যবস্থার পরিণাম দেশের অমঙ্গলজনক, কিন্তু তাঁহার শরীরের অবস্থা তখন যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে আত্মীয়, বন্ধু ও চিকিৎসক কেহই তাঁহাকে এ সম্বন্ধে অধিক চিন্তা পর্য্যন্ত করিতে দিলেন না। এই ঘটনার অত্যল্পকাল পরে তাঁহার স্নেহ-প্রতিমা একমাত্র কন্যার মৃত্যুসংবাদ তিনি পান। রামগোপাল রোগশয্যায় শয়ন করিয়া অনন্তপথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন; কিন্তু একদিনের জন্যও তিনি রোগের যন্ত্রণাসূচক কোনও প্রকার শব্দ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। মৃত্যুকে তিনি বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রামগোপাল ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে রামগোপাল বন্ধুগণের নিকট যে চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ-স্বরূপ পাইতেন, তাহার খতপত্র সমুদায় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাঁহাদিগকে ঋণের দায় হইতে অব্যাহতি দান করেন। এরূপ সহৃদয়তা জগতে দুর্লভ। নিজের সমুদয় সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। একলক্ষ টাকা তাঁহার পত্নী ও অন্যান্য পরিজনকে দিয়া যান। জেলা-দাতব্য-ভাণ্ডারে বিশ হাজার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে চল্লিশ হাজার টাকা দান করেন।

রামগোপালের মাতৃভক্তি প্রশংসনীয় ছিল। মাতার যখন যাহা প্রয়োজন হইত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণমাত্রায় সম্পূরণ করিতেন। নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজন ও পান করিতেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণ একবার তাঁহার মাতার প্রদত্ত নৈবেদ্য ফিরাইয়া দেন। তাঁহার মাতা সে জন্য অত্যন্ত মনোবেদনা পান। রামগোপাল ইহা জানিতে পারিয়া জননীকে বলিলেন, "মা! নৈবেদ্য কিরূপ সাজান হইয়াছে দেখি?" জননী নৈবেদ্য আনাইয়া দেখাইলে রামগোপাল একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "মা, আসল খুরিই যে বাদ দিয়াছ।" এই বলিয়া প্রত্যেক নৈবেদ্যের উপর একখানি খুরিতে ষোলটি করিয়া টাকা প্রদান করেন। তখন উহা গ্রহণে ব্রাহ্মণ-গণের আর আপত্তির কারণ রহিল না। রামগোপালের মাতার বিষণ্ণ আননও প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

রামগোপাল দেশমাতার সুযোগ্য সন্তান ছিলেন। জন্মভূমিকে তিনি কায়মনোবাক্যে ভালবাসিতেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল—জন্মভূমির

ক্রমোন্নতি, স্বদেশবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য। মানবমাত্রেই সর্ব্বত্র সমান, সকল বিষয়েই সকলের তুল্য অধিকার আছে, ইহা বাঙ্গালায় তিনিই প্রথম দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে রামগোপালের মধ্যে নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব বিশেষভাবেই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। নূতনের ভাল ও মন্দ উভয়কেই তিনি বরণ করিয়া লইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্যের যাহা উৎকৃষ্ট শিক্ষা, তাহা রামগোপালের হৃদয়ে এমনই ছাপ মারিয়াছিল যে, পুরাতনের মহত্ত্বভাবগুলিকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গালী ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে পারে না বলিয়া একটা দুর্নাম আছে, কিন্তু রামগোপাল ঘোষ, রামদুলাল সরকার প্রভৃতি সেই অসার বাক্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। রামগোপাল উচ্চশিক্ষিত হইয়াও ব্যবসায়ে কিরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনচরিত আলোচনা করিলেই বাঙ্গালী অনায়াসে বুঝিতে পারিবে।

দীনবন্ধু মিত্র।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে, বাঙ্গালা ১২৩৬ সালের চৈত্রমাসে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়ার কয়েক ক্রোশ দূরবর্ত্তী চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী বেলিনী গ্রামই দীনবন্ধুর পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান ছিল; কিন্তু তাঁহার পিতা কালাচাঁদ মিত্র মাতুলালয় চৌবেড়িয়া গ্রামে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। তদবধি তাঁহারা সেই গ্রামের অধিবাসী বলিয়াই পরিগণিত। কালাচাঁদ দীনবন্ধুকে 'গন্ধর্ব্বনারায়ণ' বলিয়া ডাকিতেন। দীনবন্ধু গ্রামে সেই নামেই পরিচিত ছিলেন।

কালাচাঁদ দরিদ্র ছিলেন। দীনবন্ধুকে তিনি প্রথমতঃ গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেন। পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই কালাচাদ পুত্রকে কোনও জমীদারী সেরেস্তায় ৮৲ টাকা বেতনের একটি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পিতার আদেশ অবহেলা করিতে না পারিয়া, দারুণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও লেখাপড়া ছাড়িয়া অল্পবয়সে দীনবন্ধুকে চাকরী লইতে হইয়াছিল; কিন্তু কিছুদিন কাজ করিবার পর পিতার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে তিনি কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতায় আগমন করেন। তখন তিনি পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোর মাত্র। তাঁহার পিতৃব্য সে সময় কলিকাতায় অবস্থান করিতেন। খুল্লতাতের আশ্রয়ে থাকিয়া, দীনবন্ধু লং সাহেবের প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। এ সময়ে দীনবন্ধুকে বিশেষ কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল।

প্রায়ই তাঁহাকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে হইত; কিন্তু অধ্যয়নানুরাগ তাঁহার এমনই প্রবল ছিল যে, বিদ্যার্জ্জনের জন্য তিনি কোনও অসুবিধা গ্রাহ্য করিলেন না। এই সময়ে তিনি পিতৃদত্ত গন্ধর্ব্বনারায়ণ নাম পরিত্যাগ করিয়া দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে সকলেই তাঁহাকে "গন্ধ গন্ধ" বলিয়া ডাকিত—বিদ্রূপ করিত। সে জন্য এ নামটির প্রতি তাঁহার নিতান্ত বিরাগ ছিল। লং সাহেবের বিদ্যালয়ে নাম লিখাইবার সময় তিনি আপনাকে দীনবন্ধু নামে পরিচিত করেন। এই নামকরণ তিনি নিজেই করিয়াছিলেন। তদবধি তিনি সমগ্র বঙ্গে ও সাহিত্য-জগতে দীনবন্ধু নামেই পরিচিত।

লং সাহেবের ইংরাজী বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া দীনবন্ধু হেয়ার স্কুলে, পরে জুনিয়ার পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন। হিন্দুকলেজে তিনি উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। অধ্যয়নানুরাগের ফলে হিন্দুকলেজ হইতে তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া "সিনিয়র" বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কলেজের পাঠ সমাপ্ত হইলে পর তিনি ১৫০৲ দেড় শত টাকা বেতনে ডাক-বিভাগের কর্ম্ম লইয়া পাটনায় গমন করেন।

পাঠ্যাবস্থাতেই দীনবন্ধু বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই তিনি রচনা আরম্ভ করেন। "প্রভাকর"-সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার রচনায় মৌলিকতা ও রসের সন্ধান পাইয়া এ বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন। দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের রচনাকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার বাঁশবেড়ে গ্রামে দীনবন্ধু বিবাহ করেন। পাটনায় পোষ্টমাষ্টারের কার্য্য ছয় মাস করিবার পর দীনবন্ধুর

পদবৃদ্ধি হয়। উড়িষ্যা বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার হইয়া তিনি সেই অঞ্চলে গমন করেন। বৎসরের অধিকাংশ কালই তাঁহাকে মফঃস্বলের নানাস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে হইত। নানাস্থানের জল-বায়ুর দোষে ক্রমে তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি উড়িষ্যা বিভাগ হইতে নদীয়া বিভাগে প্রেরিত হন। এই জেলায় কিছুকাল কার্য্য করিবার পর তিনি ঢাকা বিভাগে গমন করেন।

এই সময় বঙ্গদেশ নীলকরগণের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে নদীয়া ও যশোহর প্রভৃতি জেলার প্রজাবর্গের সহিত নীলকর সাহেবগণের ঘোরতর বিবাদ ঘটে। প্রজাগণ ধর্ম্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহারা মরিবে, তথাপি নীলের আবাদ করিবে না। দীনবন্ধু কর্ম্মসূত্রে তৎপূর্ব্বে বহু নীলকর-প্রপীড়িত স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রজাসাধারণের অনন্ত দুর্গতি-কষ্ট স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রে স্বদেশ-হিতৈষী হরিশ্চন্দ্র ওজস্বিনী ভাষায় সে সময় প্রজাবর্গের দুর্দ্দশার যে সকল করুণ, লোমহর্ষক চিত্র অঙ্কিত করিতেছিলেন, দীনবন্ধু তাহার অধিকাংশ অনুরূপ ব্যাপার স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছিলেন। প্রজাগণের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া সে সময় স্বদেশভক্তমাত্রেরই হৃদয়ে ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশভক্ত, স্বজাতিবৎসল দীনবন্ধুর করুণহৃদয় প্রজার হৃদয়ের এ শেলাঘাতে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিল। তিনি "নীল-দর্পণ" লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ঢাকা হইতে "নীল-দর্পণ" প্রকাশিত হইল। বঙ্গদেশে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, সমগ্র বঙ্গ চকিত হইয়া উঠিল। কিংবদন্তী, বাঙ্গালা সরকারের প্রধান

কর্ম্মচারিবৃন্দের অনুমোদনক্রমে মধুসূদন উহা ইংরাজীভাষায় অনূদিত করেন এবং ভারতবন্ধু লং সাহেব নিজ নামে উহা মুদ্রিত করেন। নীলকরদিগের অত্যাচারের যে চিত্র দীনবন্ধু উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া কি ইংরাজ, কি ভারতবাসী, সকলেরই হৃদয় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। নীলকরগণ দীনবন্ধুকে কোনওরূপে জড়াইতে না পারিয়া সদাশয় লং সাহেবের নামে মোকদ্দমা করে। সুপ্রিমকোর্টের বিচারে লং সাহেব সহস্রমুদ্রা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত ও এক মাসের জন্য কারারুদ্ধ এবং সীটনকার সাহেব অপদস্থ হন। পরে মহামতি কালীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানার এক সহস্র টাকা প্রদান করেন। দেশবন্ধু হরিশচন্দ্রও নীলকরগণের প্রতিহিংসার আগুনে ধনে-প্রাণে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু দীনবন্ধুর কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই। দীনবন্ধুর এই কীর্ত্তি "যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর" পৃথিবীর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

ঢাকা জেলা হইতে অতঃপর দীনবন্ধু পুনরায় নদীয়া বিভাগে প্রেরিত হন। নদীয়া বিভাগেই তিনি দীর্ঘকাল নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে পুনরায় ঢাকায় প্রেরিত হন। ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি "নবীন তপস্বিনী" নাটক রচনা করেন। কৃষ্ণনগরেই সেই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল।

যশোহরে অবস্থানকালে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত দীনবন্ধুর মিত্রতা জন্মে। এই বন্ধুত্ব আজীবন-স্থায়ী ছিল। দীনবন্ধু বঙ্কিমের অপেক্ষা কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু তাহাতে আন্তরিক হৃদ্যতার বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে দীনবন্ধু কলিকাতায় সুপারনিউমারি ইন্‌স্‌পেক্টার পোষ্টমাষ্টারের পদ লাভ করেন। ডাক-বিভাগের কর্ত্তার

কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্যই এই পদের সৃষ্টি হইয়াছিল। দীনবন্ধু কর্ম্মতৎপরতার দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষের মনোরঞ্জনে সমর্থ হন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ডাক-বিভাগের কর্ত্তা হইয়া দীনবন্ধু লুসাই-যুদ্ধ উপলক্ষে কাছাড়প্রদেশে গমন করেন। সেখানে ডাকের বন্দোবস্ত তিনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করায় তাঁহার কার্য্যে সরকার বাহাদুর অত্যন্ত পরিতুষ্ট হন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে গবর্ণমেণ্ট দীনবন্ধুকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন।

সুখ্যাতির সহিত রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে করিতে অকস্মাৎ একদিন দীনবন্ধুর অদৃষ্ট অপ্রসন্ন হইল। পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ও ডিরেক্টার জেনারেল উভয়ের মধ্যে কোনও বিষয় উপলক্ষে বিবাদ উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পক্ষসমর্থন করেন। তাহার ফলে তাঁহাকে ডাক-বিভাগ ত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল।

দীনবন্ধু বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে নানাপ্রকার নাটক, প্রহসন ও কবিতা রচনা করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টি-সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার লেখনী কখনও নিষ্ক্রিয় থাকিত না।

দীনবন্ধু যেমন পরিহাসরসিক, তেমনই সদানন্দ ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। সভাস্থলে যখনই তিনি আসর জমাইয়া বসিতেন, তখনই শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার হাস্য-পরিহাসে অধীর হইয়া উঠিতেন। তাঁহার কথা শুনিয়া হাস্যসংবরণ করিবার ক্ষমতা অতি কম লোকেরই ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার তিনি পাল্কী করিয়া মফঃস্বল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। দিবা দ্বিপ্রহরে তিনি কোনও গ্রামে

উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কোনও সম্ভ্রান্ত ধনীর গৃহে ব্রাহ্মণভোজনের বিরাট অনুষ্ঠান হইতেছে। দীনবন্ধু বাহকগণকে সেই বাড়ীর সম্মুখে পাল্কী নামাইতে আদেশ করিলেন। চণ্ডীমণ্ডপে ভোজনার্থী ব্রাহ্মণগণ উপবিষ্ট। দীনবন্ধু কাহারও সহিত কোনও প্রকার বাক্যালাপ না করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া বিস্তৃত আসনের একপ্রান্তে বসিলেন এবং বেহারাদিগকে পাল্কী হইতে সরকারী কাগজপত্রাদি আনিতে আদেশ করিলেন। তিনি কাহারও দিকে না চাহিয়া নীরবে গম্ভীরভাবে কাগজ-পত্র পড়াশুনা ও মন্তব্যাদি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ভাবিলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইবেন। বিস্ময়বিমুগ্ধ ব্যক্তিগণ ভয়ে কেহই তাঁহার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন না। তার পর যখন ব্রাহ্মণভোজনের সময় সমাগত হইল, তখন বিনাবাক্যব্যয়ে দীনবন্ধুও গাত্রোত্থান করিয়া ভোজনার্থ যথাযথ আসনগ্রহণ করিলেন। সকলেই বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। গৃহস্বামী তখন সবিনয়ে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন, ইনি বঙ্গবিশ্রুত পরিহাস-রসিক ও সাহিত্যাচার্য্য দীনবন্ধু, তখন তিনি আনন্দের আতিশয্যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সমাগত ব্যক্তিরাও দীনবন্ধুর ব্যবহারে হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না।

দীনবন্ধু সম্বন্ধে এমন অনেক কৌতুককরী কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর জীবনী লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, "তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহ প্রকৃতঘটনামূলক। বহু জীবিত ব্যক্তির চরিত্র তাঁহার প্রণীত চরিত্রে অনুকৃত হইয়াছে। নীলদর্পণের অনেকগুলি ঘটনা প্রকৃত। 'নবীন তপস্বিনীর' বড় রাণী ও ছোট রাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত।

'সধবার একাদশীর' প্রায় সকল নায়ক-নায়িকাগুলিই জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি, তদ্বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা। 'জামাই বারিকের' দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল। 'জলধর' 'জগদম্বা' Merry wives of Windsor হইতে গৃহীত।" বাস্তবিক আমাদের চারি পার্শ্বে এত উপাদান ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে যে, সেগুলি সংগ্রহ করিয়া সহস্র সহস্র উপাদেয় নাটক, উপন্যাস ও গল্প রচিত হইতে পারে। বহুদেশদর্শন-জনিত অভিজ্ঞতার প্রভাবেই দীনবন্ধুর রচিত গ্রন্থগুলি জীয়ন্ত নরনারীর প্রতিকৃতি বলিয়া মনে হয়।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ১লা নবেম্বর তারিখে দীনবন্ধু বহুমূত্ররোগে অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। অন্তিমকালেও দীনবন্ধুর পরিহাস-রসিকতা লোপ পায় নাই। সে সময় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে গেলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "ফোড়া এবার আমার পায়ে ধরিয়াছে।" তাঁহার চরণে একটা বিস্ফোটক হইয়াছিল। মৃত্যুশয্যাতে শয়ন করিয়াও তিনি "কমলে কামিনী" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি তাঁহার মৃত্যু-কালে যন্ত্রস্থ ছিল। ইহাই তাঁহার বীণাপাণির চরণে শেষ অর্ঘ্য।

দীনবন্ধু নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির প্রণেতা :—(১) নীলদর্পণ, (২) সধবার একাদশী, (৩) নবীন তপস্বিনী, (৪) জামাই বারিক, (৫) কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ, (৬) যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ, (৭) পোড়া মহেশ্বর, (৮) লীলা-বতী, (৯) সুরধুনীকাব্য ১ম ও ২য় ভাগ, (১০) পদ্যসংগ্রহ, (১১) দ্বাদশ কবিতা, (১২) বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো, (১৩) কমলে কামিনী।

দীনবন্ধুর অন্তর্দ্ধানে বাঙ্গালা সাহিত্যিক জগতের একাংশে যে শূন্যতা

অনুভূত হইয়াছিল, তাহা এখনও পূর্ণ হইল না। পরিহাস-রসিকতার প্রস্রবণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই শুকাইয়া গিয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যে অত্যন্ত বিরল হাস্যরসের উৎসধারা দীনবন্ধুই বঙ্গ-সাহিত্যে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি। টমকাকার কুটীর যেমন বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, নীলদর্পণও প্রায় সেইরূপ বহু ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। দীনবন্ধুর এই একখানি গ্রন্থই বিশ্বসাহিত্য-মন্দিরে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার নাটক-রচনার শক্তি "নীলদর্পণে" পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই দৃষ্ট হয়। দেশের কুনীতি ও কুরুচির প্রতি তীব্র কশাঘাত তাঁহার রচিত অন্যান্য নাটকেও ভূরি পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। দীনবন্ধু পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল প্রবাহে ভাসিয়া যান নাই। জাতীয়তার প্রতি অনুরাগ, দেশের প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মসম্মানজ্ঞান তাঁহার বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি যে বাঙ্গালী, হিন্দু, তাহা তিনি ভুলেন নাই, স্বদেশবাসীকেও তাহা ভুলিবার অবকাশ দেন নাই। দীনবন্ধুর জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনা সার্থক হইয়াছিল। মাতৃভাষার সেবায় তিনি নিজে যেমন ধন্য হইয়াছিলেন, দেশবাসীকেও তেমনই ধন্য করিয়া গিয়াছেন। দীনবন্ধুর সুযোগ্য কৃতী সন্তান—চারুচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, ললিতচন্দ্র, জ্যোতিষচন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার রচিত অনেকগুলি ক্ষুদ্র কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। পিতার সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশ পুত্রে কিছু কিছু প্রকাশ পাইয়াছে। দীনবন্ধু বঙ্গমাতার যোগ্যসন্তান, মাতৃভাষা তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিতা। দীনবন্ধুর স্মৃতির পূজা করিয়া বাঙ্গালী ধন্য!

কালীপ্রসন্ন সিংহ।

কালীপ্রসন্ন কোন্ বৎসরে, কোন্ মাসে, কোন্ তারিখে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রামাণিক ইতিহাস নাই। তবে আলোচনার ফলে এই পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অতি সম্ভ্রান্ত উচ্চকূলে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ, স্যার টমাস্ রম্‌বোল্ড ও মিঃ মিডল্‌টনের দেওয়ানী কর্ম্ম করিতেন। এই কার্য্যে তিনি মুরশিদাবাদ ও পাটনায় থাকিয়া অপর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; উড়িষ্যায় বিস্তৃত জমীদারী হইয়াছিল। যোড়াসাঁকোর সিংহ-পরিবার কলিকাতার রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

কালীপ্রসন্নের পিতার নাম নন্দলাল। ইনি "সাতু সিংহ" নামে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। বাল্যকালে কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত এই তিনটি ভাষায় শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে বাগবাজারের রায় লোকনাথ বসু বাহাদুরের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সে সময়ে তিনি হিন্দুকলেজের ছাত্র। অল্পবয়সে কালীপ্রসন্নের বিবাহ হইল বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল এই মিলনবন্ধন স্থায়ী হয় নাই। বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই কালীপ্রসন্নের বালিকা পত্নীর মৃত্যু ঘটে। ইহার পর কালীপ্রসন্ন রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেবের দৌহিত্রী, চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন বিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করেন। বাল্য-কালে কালীপ্রসন্ন অত্যন্ত চঞ্চলপ্রকৃতি ছিলেন। যেখানে মারামারি, তামাসা ও গণ্ডগোল উপস্থিত হইত, কালীপ্রসন্ন ঝড়ের অগ্রে সেখানে উপস্থিত হইতেন। এই প্রকার চাঞ্চল্য বশতই কালীপ্রসন্ন বিদ্যামন্দিরে দীর্ঘকাল বাণীর সেবায় অবহিত হইতে পারেন নাই, পঠদশায় তাঁহার তাদৃশ উন্নতি ঘটিতে পারে নাই।

বিদ্যামন্দিরে কালীপ্রসন্ন তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার কোনও পরিচয় দিতে না পারিলেও, তিনি গৃহশিক্ষক কার্ক পেট্রিকের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজী সাহিত্যে প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যা-লয়ের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেও তিনি গৃহে বিজ্ঞ ও সংস্কৃতবিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিত রাখিয়া তাঁহার সাহায্যে বাঙ্গালা ও সংস্কৃতবিদ্যা অধ্যয়ন করেন।

সংস্কৃতভাষার চর্চ্চায় ও মাতৃভাষার আলোচনায় কালীপ্রসন্নের আন্তরিক অনুরাগ ছিল। শুধু তাহাই নহে, তিনি কায়মনোবাক্যে বাঙ্গালী থাকি-বার জন্য চেষ্টা করিতেন। তখন ইউরোপীয় সভ্যতার প্লাবনে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচার-ব্যবহার, বেশভূষা সবই ভাসিয়া যাইতেছিল; কালীপ্রসন্নের সতীর্থ ও পরিচিত, সমবয়স্ক আত্মীয়-বন্ধুগণের অধিকাংশই ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক ইংরাজী ভাষায় বিশ্রম্ভালাপে গর্ব্ব ও আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেন। মাতৃভাষায় কথোপকথন করাও লজ্জার বিষয় বলিয়া তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; কিন্তু স্বদেশবৎসল, মাতৃভূমির স্বেচ্ছাসেবক কালীপ্রসন্ন বিজাতীয় ব্যবহারের অনুকরণকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতেন। অন্যজাতীয় পরিচ্ছদে দেহ

আবৃত করা ও পরের ভাষায় ভাববিনিময় করা কার্য্যটাকে তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বলতার পরিচায়ক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

বাল্যকাল হইতেই মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ হেতু অল্পবয়সেই কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালায় প্রবন্ধ রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা রচনা অধুনা সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। তবে যে সকল রচনা সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কালীপ্রসন্ন অন্যের অনুকরণে কোনও প্রবন্ধ রচনা করিতেন না।

কালীপ্রসন্ন স্বীয় ভবনে বিদ্যোৎসাহিনী নাম্নী একটি সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ঐ সভার প্রথম অধিবেশন হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্যবৃন্দের চেষ্টায় ও কালীপ্রসন্নের উৎসাহ ও উদ্যোগে তাঁহারই বাটীতে "বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গালয়" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত রঙ্গালয়ে বেণী-সংহার নাটক অভিনীত হয়। বহু সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় এবং দেশীয় ভদ্রলোক সেই অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

অভিনয়কালে উক্ত নাটকখানি যে অভিনয়োপযোগী নহে, কালীপ্রসন্ন ইহা বুঝিয়াছিলেন। এজন্য তিনি স্বয়ং একখানি নাটক রচনায় অবহিত হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার রচিত "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটক প্রকাশিত হয়। তখন কালীপ্রসন্ন ষোড়শবর্ষীয় কিশোর। এইরূপ অল্পবয়সে এরূপ শ্রেণীর একখানি নাটক রচনা করা সাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" নামক পত্রে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র উক্ত নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে, নবেম্বর মাসে কালীপ্রসন্ন স্বয়ং পুরূরবার ভূমিকা অভিনয়

করেন। "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটক অভিনয়কালে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন "মালতীমাধব" নামক আর একখানি নাটক রচনা করেন। উহা ভবভূতির সুপ্রসিদ্ধ নাটক অবলম্বনেই লিখিত হইয়াছিল। এই নাটকখানিও সে সময়ে যথেষ্ট সমাদর ও প্রশংসা প্রাপ্ত হয়।

কালীপ্রসন্নের হৃদয় প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। মাতৃভূমির সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকামনা ও দেশবাসীর উন্নতির চেষ্টায় তিনি অনুপ্রাণিত ছিলেন। শুধু মাতৃভাষা বা নাট্যশাস্ত্রের উন্নতিসাধনই তাঁহার একমাত্র সাধনার বিষয় ছিল না, দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিজনক কার্য্যেই তাঁহার যোগ ছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, "মুখার্জ্জীস্ ম্যাগেজিন" নামক সাময়িক পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কালীপ্রসন্ন ইহা জানিতে পারিয়া মূল্যবান্ মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া উহা তাঁহাকে দান করেন। জনৈক মুসলমান বন্ধুর অনুরোধে "দূরবীন্" নামক উর্দ্দু ভাষায় প্রচারিত পত্রিকার স্বত্ব কিনিয়া উহার প্রচারের জন্যও তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন। এ সকল কার্য্য শুধু স্বদেশের মঙ্গলেচ্ছারই দ্যোতক।

এইরূপ মহদুদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই কালীপ্রসন্ন "হিন্দুপেট্রিয়টের" অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে দেন নাই। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর কালীপ্রসন্ন পাঁচ হাজার টাকা মূল্যে উক্ত পত্রিকার যাবতীয় স্বত্ব ক্রয় করিয়া লন। প্রথম কারণ, উক্ত দেশহিতকর সংবাদপত্র পুনরায় পরিচালন; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, পরলোকগত, জন্মভূমির সুযোগ্য সন্তান হরিশ্চন্দ্রের পরিবারবর্গকে

অর্থসাহায্য করা। কালীপ্রসন্ন স্বদেশপ্রেমিক হরিশ্চন্দ্রকে সর্ব্বান্তঃকরণে পূজা করিতেন। শুধু তাহাই নহে, হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে পাঁচ হাজার টাকাও তিনি দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গভাষায় একখানি পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া তিনি সাধারণের মধ্যে উহা বিতরণও করেন। উক্ত পুস্তিকার নাম "হিন্দু পেট্রিয়ট-সম্পাদক-কৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোনও বিশেষ চিহ্নস্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন।"

"হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার" জন্য কালীপ্রসন্ন তদানীন্তন সুখীয়া বাগান ষ্ট্রীটস্থিত দুই বিঘা-পরিমিত ভূমিদানেও প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইলেও "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার" ঔদাসীন্যে এই শুভ অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

"হিন্দু পেট্রিয়টের" স্বত্ব ক্রয় করিবার পর কালীপ্রসন্ন উহার পরিচালনভার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপর ন্যস্ত করেন। হরিশ্চন্দ্রের শৈশবসময়ের অভিন্নহৃদয় বন্ধু গিরিশচন্দ্র ঘোষ বন্ধু-বিয়োগের পরই হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদনভার স্বীয় স্কন্ধে লইয়াছিলেন; কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহারা উভয়েই যখন উহার সম্পাদন ও পরিচালনের ভার ত্যাগ করেন, তখন কালীপ্রসন্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উহা কৃষ্ণদাস পালের হস্তে অর্পণ করেন। স্বদেশ-প্রেমিক কালীপ্রসন্ন, হিন্দু পেট্রিয়টের মত স্বাধীনমতাবলম্বী সংবাদপত্রকে জমীদারসভার মুখপত্রে পরিণত করিতে সম্মত ছিলেন না; কিন্তু ঘটনা-ক্রমে উহা পরিণামে "ট্রষ্টসম্পত্তি বলিয়া রাজদ্বারে চিহ্নিত" হইয়াছিল।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে "নীলদর্পণের" মোকদ্দমা ও লং সাহেবের বিচার হয়। নীলকরগণের মানহানি করার অপরাধে অভিযুক্ত লং সাহেব আদালতের

বিচারে দোষী সাব্যস্ত হন। বিচারক তাঁহার প্রতি একমাস কারাবাস ও এক সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিবার আদেশ করেন। স্বদেশপ্রেমিক, উদার-প্রাণ কালীপ্রসন্ন সেই মুহূর্ত্তেই বিচারালয়ে এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন এবং আদালতে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, যদি লক্ষ টাকা জরিমানা দিলেও লং সাহেবের জেল মকুব হয়—তাহা দিতেও তিনি প্রস্তুত আছেন এবং সেজন্য লাখ টাকার নোট তিনি সঙ্গে আনিয়াছেন। এ দান যৎসামান্য, কিন্তু যে প্রবৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া কালীপ্রসন্ন এই কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা শুধু অসামান্য নহে, অতুলনীয়।

"নীলদর্পণ" প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়া গেলে, কালীপ্রসন্ন নিজব্যয়ে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

স্যার মর্ডেণ্ট ওয়েলস্ বিচারাসনে বসিয়া "নীলদর্পণের" মোকদ্দমা উপলক্ষে বাঙ্গালী জাতিকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ব্যবহারের প্রতিবাদের জন্য স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ভবনে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। কালীপ্রসন্ন সেই সভায় এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ইতঃপূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন আর কখনও বক্তৃতা করেন নাই। ইহাই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা। তৎপরে সভার মন্তব্য তদানীন্তন সেক্রেটারী অব ষ্টেট স্যার চার্লস উডের নিকট প্রেরিত হয়। এই ঘটনার পর হইতেই বিচারক স্যার মর্ডেণ্ট ওয়েলস্ সাহেবের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি পরে লোকরঞ্জক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন। দুই বৎসর পরে তিনি যখন স্বদেশযাত্রা করেন, তখন বাঙ্গালী তাঁহার বিদায়ে অভিনন্দনপত্র দিয়াছিল; তাহাতে কালীপ্রসন্নও

যোগ দিয়াছিলেন। স্বদেশভক্ত কালীপ্রসন্নে নীচতা, হীনতা ছিল না। তিনি পূর্ণমাত্রায় স্বদেশপ্রেমিক হইয়াও হৃদয়ে ভিন্ন জাতির প্রতি বিন্দুমাত্রও বিদ্বেষ পোষণ করিতেন না।

দেশের কল্যাণজনক যাবতীয় কার্য্যেই কালীপ্রসন্ন অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার ধনভাণ্ডারের দ্বার সর্ব্বদাই মুক্ত ছিল। যে কোনও শুভানুষ্ঠানে তিনি বিনাবিচারে অর্থদান করিতেন। কলিকাতায় তখনও "কলের জল" হয় নাই। কালীপ্রসন্ন কলিকাতাবাসীর মঙ্গলার্থে "পাঁচটি বারিপ্রস্রবণ" নির্ম্মাণের জন্য দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" পত্রিকার সহিত কালীপ্রসন্নের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। তিনি উক্ত পত্রের জনৈক লেখক ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল উহার সম্পাদকতা ত্যাগ করার পর কালীপ্রসন্ন স্বয়ং উহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন।

"পরিদর্শক" নামে একখানি বাঙ্গালা দৈনিক ১২৬৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। উহার পরিচালন ও সম্পাদনের ভারও ক্রমে কালীপ্রসন্নের স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছিল। তাঁহার আমলে "পরিদর্শকের" যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল।

কালীপ্রসন্নের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উহার দ্বিতীয় খণ্ড কিছুকাল পরেই বাঙ্গালী পাঠকসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্র) আলালী ভাষায় এই উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হয়। "হুতোমে" বর্ণিত বিষয় 'আলালী' ভাষায় লিখিলে বর্ণনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়াই উক্ত ভাষা অবলম্বিত হইয়াছিল। নহিলে কালীপ্রসন্ন সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা

ব্যবহারেরই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" বাঙ্গালা ভাষার একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। এমন হাস্যরসোদ্দীপক রচনা বঙ্গ-সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ। বহু ভণ্ড সমাজদ্রোহীর পৃষ্ঠে তীব্র কশাঘাতের ন্যায় "হুতোমের" বাক্যবাণ বর্ষিত হইয়াছিল। মাইকেল অমিত্রাক্ষর-চ্ছন্দে কাব্যরচনা করিবার পূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন "হুতোম প্যাঁচার নক্সার" উৎসর্গপত্রে ঐ ছন্দের প্রথম ব্যবহার করেন।

কালীপ্রসন্ন মাইকেলের কাব্যশক্তির ভক্ত ছিলেন। পাশ্চাত্য প্রাচীন কবিগণের সহিত তুলনা করিয়া তিনি মাইকেলকে হোমর, ভার্জ্জিল এবং মিল্‌টনের উপরে আসন দিয়াছিলেন। তদ্‌ব্যতীত মধুসূদনকে উৎসাহিত করিবার জন্য "বিদ্যোৎসাহিনী সভা" হইতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রতিনিধিস্বরূপ মধুসূদনকে একটি রৌপ্যনির্ম্মিত, সুদৃশ্য ও মূল্যবান্ পানপাত্রও উপহার প্রদান করা হয়। সেই সঙ্গে একখানি অভিনন্দন-পত্রও কালীপ্রসন্ন অমরকবি মাইকেলকে প্রদান করেন।

স্বাধীন মত ও তেজস্বিতার জন্য কালীপ্রসন্ন সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। রাজকর্ম্মচারীরাও এই পুরুষ-পুঙ্গবকে বিশেষ সম্মান করিতেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কালীপ্রসন্ন কলিকাতার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও জষ্টিস্ অব্ দি পিস্ নির্ব্বাচিত হইয়া সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারের পদেও তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কার্য্যেও কালীপ্রসন্ন বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কালীপ্রসন্ন সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হন। এই বিরাট্ ধর্ম্মগ্রন্থ বাঙ্গালায় অনূদিত করিয়া তিনি অমর হইয়া গিয়াছেন। কয়েকজন সংস্কৃতবিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতের

সহায়তায়, দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রমের পর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মহাভারতের অনুবাদ সমাপ্ত হয়। এই মহৎকার্য্যে কালীপ্রসন্ন প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। মহাভারতের অনুবাদকালে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত গ্রন্থ, শোভাবাজার রাজবাটীস্থ হস্তলিখিত সংস্কৃত পুস্তক এবং আশুতোষ দেব ও মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকাগারস্থিত হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহাভারতের ব্যাসকূটের সন্দেহের নিরসন করিবার জন্য তিনি পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যগ্রহণ করিয়াছিলেন।

জীবনের শেষাবস্থায় কালীপ্রসন্ন প্রায়ই প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন। "বঙ্গেশ-পরাজয়" নামক একখানি উপন্যাসও তিনি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু উহা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই কাল তাঁহাকে ইহলোক হইতে অকালে অপহরণ করে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই ৯ই শ্রাবণ বেলা ৩টার সময় ২৯ বৎসর মাত্র বয়সে কালীপ্রসন্ন ইহলোক হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করেন।

কালীপ্রসন্ন অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী পতির অনুজ্ঞানু-সারে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ব্যয়ে অকুণ্ঠিত ছিলেন বলিয়া শেষ-জীবনে কালীপ্রসন্নের অধিকাংশ জমীদারী হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতাস্থিত অনেকগুলি মূল্যবান্ সম্পত্তিও ঋণের দায়ে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের অযাচিত অনুগ্রহ বশতঃ প্রতারিত হইয়া কালীপ্রসন্ন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এজন্য শেষজীবনে তিনি কিছু অশান্তি ভোগ করেন। তাঁহাকে বালকের ন্যায় সরলচিত্ত দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছিলেন।

বিপুলবিত্তশালী জমীদারগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও শুধু ভোগবিলাসে জীবনযাপন না করিয়া কালীপ্রসন্ন মাতৃভাষার ও জন্মভূমির সেবায় সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদে ও হুতোম প্যাঁচার নক্সা রচনা করিয়া তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য ছিলেন বলিয়াই এক দিন তাঁহার সভায় নবরত্নের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। তাই কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি অমর কবির রচনামাধুর্য্যপাঠে বিশ্ববাসী এখন আনন্দ অনুভব করিতে পারিতেছে এবং যত দিন ভাষা ও সভ্যতা বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন আনন্দ পাইবে। বাঙ্গালায় কালীপ্রসন্নের মত সাহিত্যরসিক এবং সাহিত্যিক বিক্রমাদিত্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, বাঙ্গালী নবরত্নের সাক্ষাৎ না পাইলেও, বহু মনীষী লেখকের মধুর রচনার আস্বাদ পাইতেছেন। কালীপ্রসন্ন সমাজসংস্কারে উদারনীতিক ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি জাতীয়তা বিসর্জ্জনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বিদেশীয় পরিচ্ছদে তিনি কোনও দিন কোনও সভায় যোগদান করিতেন না; সাহেব সাজিবার দিকে তাঁহার বিন্দুমাত্র আগ্রহও ছিল না। কালীপ্রসন্নের স্বদেশপ্রেম, কালীপ্রসন্নের স্বজাতিপ্রীতি বাঙ্গালীর আদর্শ। করতালিলাভের আশায় তাঁহার দেশাত্মবোধ প্রবুদ্ধ হয় নাই, সংবাদপত্রে বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে বলিয়া তিনি কোনও দিন স্বজাতি-বাৎসল্যের পরিচয় দিতে যান নাই। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য! অকালে বাঙ্গালী তাঁহাকে হারাইল। তিনি গিয়াছেন, কালস্রোতে তাঁহার দেহ কোথায় মিশিয়া গিয়াছে; কিন্তু অনন্তকাল সমুদ্রের তরঙ্গরাশি কোনও দিন তাঁহার অটল কীর্ত্তিস্তম্ভকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

১২৩২ সালের ২রা ফাল্গুন ইংরাজী ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ্চ, রবিবার কলিকাতার ৩৭ নং হরীতকীবাগান লেনস্থিত ভবনে ভূদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ তর্কভূষণ, জননীর নাম ব্রহ্মময়ী। ভূদেব বাবুর পৈতৃক নিবাস খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত নতিবপুর গ্রাম। তাঁহার পিতামহ হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌম ভ্রাতৃবিরোধের আশঙ্কায় পৈতৃক সম্পত্তির সমুদয় অংশ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস উঠাইয়া লইয়া আসেন এবং হরীতকীবাগানে সামান্য প্রকার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া যজন-যাজন ও অধ্যাপনাদি দ্বারা কোনও প্রকারে সংসার প্রতিপালন করিতে থাকেন।

ভূদেব বাবুর পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি যেমন সুপণ্ডিত, তেমনই সদাচারপরায়ণ, নির্ভীক ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের মাহাত্ম্য, পাণ্ডিত্যের খ্যাতি, তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রশংসা তদানীন্তন শিক্ষিত-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আচারে, ব্যবহারে, নিষ্ঠায় ও পাণ্ডিত্যে প্রকৃতই তিনি ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। নীচতা, অনুদারতা তাঁহাতে আদৌ বিদ্যমান ছিল না। গার্হস্থ্যাশ্রমের যাবতীয় কর্ত্তব্যপালনে তৎপর হইয়াও তিনি লোভ, মোহ প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তিকে সংযত রাখিয়াছিলেন। ব্রহ্মণ্যদেব প্রকৃতই তাঁহাতে মূর্ত্তিমান্ হইয়াছিলেন।

ভূদেবের জননীও অপূর্ব্ব রূপবতী ও অশেষ গুণশালিনী ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যে মাতৃভাবের মধুর বিকাশ দেখিয়া ভূদেবের সতীর্থ, বাঙ্গালার মহাকবি মধুসূদন একদিন রাজরাজেশ্বরীর অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তির কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন। প্রকৃতই তাঁহাকে দেখিলে দর্শকের হৃদয় শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে পরিপূর্ণ হইত।

ভূদেবের পিতার অবস্থা ভাল ছিল না; তিনি কষ্টে সংসার প্রতিপালন করিতেন।

শৈশবে ভূদেবের শরীর অত্যন্ত রুগ্ন ছিল। প্রায়ই তিনি জ্বর ও উদরাময়ে ক্লেশ পাইতেন। হরীতকীবাগানের যে অংশে ভূদেব বাবু থাকিতেন, সেখানে নিম্নশ্রেণীর লোকই অধিকসংখ্যায় বাস করিত। তাহাদের পুত্রদের সহিত শৈশবে ভূদেব খেলা করিতেন। একবার তিনি ক্রীড়াসঙ্গীদিগের সংসর্গজাত শিক্ষার ফলে জননীকে "গুখেকোর বেটী" বলিয়া সম্বোধন করেন। এজন্য তাঁহার মাতৃদেবী পুত্রকে প্রহার করেন। তদবধি জননী আর পুত্রকে নীচসংসর্গে যাইতে দিতেন না।

তর্কভূষণ মহাশয়ের পরিবারে দেবদ্বিজে ভক্তিপ্রবণতা যথেষ্ট ছিল। বিশেষতঃ ভূদেবের জননী প্রত্যহ পতির পাদোদক পান না করিয়া অন্য কোনও ভোজ্য স্পর্শ করিতেন না। স্বামীকে তিনি দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন; স্বামীর কোনও ব্যবহার্য্য দ্রব্য অন্যকে ব্যবহার করিতে দিতেন না। একবার শিশু ভূদেব (তখন তাঁহার বয়স তিন কি চারি বৎসর হইবে) পিতার পাদুকার মধ্যে পা দিয়াছিলেন। পাছে মহাগুরুর ব্যবহৃত দ্রব্যে পুত্রের পাদস্পর্শ হওয়ায় গৃহের কাহারও

অকল্যাণ হয়, এজন্য ব্রহ্মময়ী দেবী স্বয়ং স্বামীর উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া পুত্রের মস্তকে সেই বিনামা রাখিয়া তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন। এ আদর্শ ভূদেব জীবনে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। আদর্শ পিতামাতা পাইয়াছিলেন বলিয়াই পরিণামে ভূদেব এত মহৎ হইতে পারিয়াছিলেন।

"হাতে খড়ি" হইবার পূর্ব্বে ভূদেব পিতার নিকট হইতে অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রভাতে তিনি সেই সমুদয় শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। পিতা পুত্রের ক্রীড়া-সঙ্গীও ছিলেন। প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি সন্নিহিত কোনও উদ্যানে যাইতেন এবং বৃক্ষ-লতাদির পরিচয় দিতেন। প্রকৃতপক্ষে পুত্রের শারীরিক ও মানসিক স্ফূর্ত্তি যাহাতে বৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে বিশ্বনাথের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আত্মনির্ভরতা শিখাইবার জন্য একবার বালক ভূদেবকে মাণিক-তলায় একটি উদ্যানে লইয়া গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "এখান হইতে তুমি একা বাড়ী ফিরিয়া যাও।"

পিতামহ সার্ব্বভৌম মহাশয় ভূদেবের হাতে খড়ি দেন। কিছুদিন গৃহে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পড়িবার পর নবম বৎসর বয়ঃক্রমকালে ভূদেব সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। তথায় অখণ্ড মনোযোগের সহিত তিনি লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতে থাকেন। কলেজের অধ্যাপকগণ ভূদেবকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত সকলেরই বন্ধুত্ব ছিল।

সংস্কৃত কলেজে সে সময়ে উলাষ্টন নামক একজন শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপক ইংরাজী শিখাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রিয়দর্শন ভূদেবকে দেখিয়া

উলাষ্টন সাহেব প্রীত ও মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে ইংরাজী শিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। সাহেবের শিষ্টব্যবহারে ভূদেব মোহিত হইয়া তাঁহার নিকট ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। উলাষ্টন সাহেব প্রয়োজনানুসারে ভূদেবকে পুস্তক ও কাগজ-কলম প্রভৃতি দিতেন। এক বৎসরের মধ্যে ভূদেব তিন সংখ্যা "ইনষ্ট্রক্টার" নামক পুস্তক শেষ করিয়া ফেলেন; কিন্তু তাঁহার ইংরাজী অধ্যয়নের সংবাদ বাড়ীর কেহই অবগত ছিলেন না। ভূদেব বই অথবা কাগজ-কলম বাড়ীতে লইয়া যাইতেন না; সাহেবের ঘরেই থাকিত।

প্রথমতঃ ভূদেব বিশেষ মনোযোগের সহিতই সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছিলেন; কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা যতই অগ্রসর হইয়া চলিল, সংস্কৃতের প্রতি আসক্তি তাঁহার ততই কমিয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার পিতা সে সময়ে তীর্থপর্য্যটনে যাওয়ায় ভূদেবের সংস্কৃতপাঠে অবহেলা কেহই লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। একদা তর্কভূষণ মহাশয়ের অধ্যাপক রামচরণ শিরোমণি মহাশয় হরীতকীবাগানে আসিয়া বালক ভূদেবের পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন; তিনি যখনই আসিতেন, ঐ প্রকার পরীক্ষা লইতেন এবং প্রায়ই তাহাতে সন্তোষলাভ করিতেন; কিন্তু এবার পরীক্ষার ফল দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। অনুশীলনের অভাবে ভূদেব ব্যাকরণ প্রায়ই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ভূদেবের পিতা তীর্থপর্য্যটনান্তে সেই দিন তখনই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি তদীয় গুরুদেবের নিকট ভূদেবের পাঠে অমনোযোগিতার কথা শুনিয়া ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইলেন। একমাত্র পুত্র পাঠে বিগতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ভূদেবকে গুরুতর প্রহার করেন।

পরদিবস প্রত্যূষে পুত্রকে সঙ্গে করিয়া বহির্ব্বাটীতে লইয়া গিয়া তর্কভূষণ নিজে তাহাকে পড়াইতে বসিলেন; কিন্তু ভূদেব কোনও মতেই পড়িতে চাহিলেন না। এ যাবৎ তিনি কোনও দিন পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই; কিন্তু এবার তিনি সংস্কৃত পড়িবেন না, এ কথা খুলিয়াই বলিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, সংস্কৃত শিখিলে মানুষ যখন এমন নিষ্ঠুর হয়, তখন উহা তিনি পড়িবেন না। পিতার নির্দ্দয় প্রহারের কথা তাঁহার মনে ছিল। তার পর ইংরাজী শিক্ষা করিবার তাঁহার আগ্রহ জন্মিয়াছে ও তিনি ইংরাজী পড়িতেছেন, এ কথা স্বীকার করিলে তর্কভূষণ মহাশয় পুত্রকে অবিলম্বে ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

সেই দিনই ইণ্ডিয়ান একাডেমী বিদ্যালয়ে ভূদেব প্রবিষ্ট হন। উলাষ্টন সাহেব এ কথা জানিতে পারিয়া হেদুয়া পুষ্করিণীর সন্নিহিত কোনও বাটীতে শ্রীমতী উইল্‌সন্-নাম্নী যে মিশনারী মহিলা বাস করিতেন, তাঁহার সহিত ভূদেবের পরিচয় করাইয়া দেন। বিবি উইল্‌সন্ ও উলাষ্টন সাহেব এই দুইটি বিচক্ষণ ইংরাজ নরনারীর সহায়তায় ভূদেবের ইংরাজী শিক্ষা দ্রুততর অগ্রসর হইতে লাগিল। এখানে এক বৎসর অধ্যয়নের পর কোনও শিক্ষকের নিকট হইতে অকারণে প্রহৃত হইয়া ভূদেব সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন।

লেখাপড়ায় ভূদেবের বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি নূতন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া মনোযোগ সহকারে পড়িতে লাগিলেন। একবার পরীক্ষায় প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াও ভূদেব উহা তদীয় খুল্লতাতের অপদার্থ শ্যালককে দিয়াছিলেন। সে উহা আপন নামে চালাইয়া দিয়াছিল।

ভূদেব আপনার যশঃকে অপরের জন্য প্রদান করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। পরবর্ত্তী জীবনে এই প্রবৃত্তি সমধিক স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল।

ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ভূদেবের উপনয়ন-সংস্কার ঘটে। ইহার পর হইতে তিনি নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন ; কোনও দিন তাহার ব্যতিক্রম ঘটিত না।

ক্রমে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিবার জন্য ভূদেবের বিশেষরূপ আগ্রহ জন্মে ; কিন্তু কলেজের বেতন মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া সংগ্রহ করা তর্কভূষণ মহাশয়ের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বিষয় ছিল। যাহা হউক, বিশ্বনাথ অন্যের সাহায্যে মাসিক পাঁচ টাকা বেতন যোগাড় করিয়া পুত্রকে হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তখন ভূদেবের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র। অখণ্ড মনোযোগের সহিত তিনি পড়িতে লাগিলেন। এই সময় মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। উভয়ে একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন।

এই সময়ে হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের অধিকাংশই দেশীয় আচার-পদ্ধতিকে অবহেলার চক্ষে দেখিয়া ইউরোপীয়দিগের আচার-ব্যবহার প্রভৃতির অনুকরণ করিতে থাকেন। অধিকাংশ ছাত্রই সে সময়ে মদ্যপান ও হিন্দুধর্ম্মবিগর্হিত খাদ্যাদি ভোজনে তৎপর হইয়া উঠিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, এইরূপ কার্য্য যে সৎসাহসের পরিচায়ক, তাহাই তাঁহারা মনে করিতেন এবং প্রকাশ্যভাবে উক্ত প্রকার অনুষ্ঠান করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। এই কূলপ্লাবী স্রোতের মধ্যে পড়িয়াও ভূদেব কুলপ্রথাগত সদাচারভ্রষ্ট হন নাই। তিনি ক্লাসে অধ্যয়নকালে কাহারও সহিত মিশিতেন না, কোনও বিষয়ের আলোচনাও করিতেন না ; শুধু

নিজের পড়াশুনা লইয়া থাকিতেন। কেতাবকীট বলিয়া তাঁহার নামও বাহির হইয়াছিল। কলেজে যতক্ষণ তিনি থাকিতেন, পিপাসা পাইলেও কোনও দিন কলেজের পানপাত্রে জলপান করিতেন না।

গৃহশিক্ষা ও পারিবারিক ব্যবস্থায় বিশেষত্ব ছিল বলিয়া ভূদেব এই ভীষণ বিপ্লবকালেও অচল অটল ছিলেন। বাড়ীতে নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদির বিধি ছিল, ভূদেবকে প্রত্যহ নিষ্ঠাসহকারে তাহা পালন করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত পল্লীর কোনও গৃহে পূজা-অর্চ্চনাদির প্রয়োজন হইলে মধ্যে মধ্যে ভূদেবকে সে কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতে হইত; কারণ, পৌরোহিত্য তাঁহার পিতার ও পিতৃব্যগণের ব্যবসায় ছিল।

অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ভূদেব বাবুর একখানি ইংরাজী অভিধানের বিশেষ প্রয়োজন হয়। তিনি নিমন্ত্রণ-বাটীতে ব্রাহ্মণভোজনের দক্ষিণাস্বরূপ ইতিপূর্ব্বে যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন (মোট দুই টাকা দশ আনা), তাহা লইয়া চীনাবাজারে মধুসূদন দে নামক জনৈক পুস্তক-বিক্রেতার দোকানে গমন করেন। সেখানে "জন্‌সনের" একখানি অভিধান ছিল, তাহার মূল্য ৪৲ টাকা। ভূদেব বলেন যে, উহা তাঁহার সঞ্চিত দুই টাকা দশ আনায় তিনি লইতে চাহেন। মধুসূদন দে সুন্দর-দর্শন বালকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরিচয়ে যখন মধুসূদন জানিতে পারিলেন যে, বালকটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পুত্র, তখন তিনি উক্ত পুস্তকখানি স্বল্পমূল্যেই বালকের তৃপ্তির জন্য বিক্রয় করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, তাঁহার দোকানে পুরাতন বই অনেক আছে, সুতরাং প্রয়োজনমত যখন ইচ্ছা ভূদেব চারি পাঁচখানি একত্রে লইয়া গিয়া পড়িতে পারিবেন; তজ্জন্য তাঁহাকে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হইবে না। ভূদেব,

মধুসূদন দের এই উদার প্রস্তাবে পরম আনন্দিত ও উপকৃত হইলেন। সেই সময় হইতে তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত এই দোকান হইতে অনেক পুস্তক লইয়া গিয়া পড়িয়াছিলেন এবং আবার ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। এ উপকার জীবনে কখনও তিনি বিস্মৃত হন নাই।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ভূদেব ডবল প্রমোসন লইয়া ক্লাশে উঠিলেন। তৎপর-বৎসর তিনি পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হন। এই সময় বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটস্থিত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যার সহিত ভূদেবের পরিণয় ঘটে। এই সময় ভূদেব স্বশ্রেণীস্থ ছাত্রবৃন্দের পাঠের নিমিত্ত ইংরাজী ভাষায় "প্রাইভেট অবজারভার" নামক একখানি হস্তলিখিত সংবাদপত্র বাহির করেন।

হিন্দুকলেজে ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ভূদেব অত্যন্ত স্বল্পাহার করিতেন। গুরুভোজনে অধিককাল পরিশ্রম করা সম্ভবপর নহে মনে করিয়াই ভূদেব লঘুপাক দ্রব্য স্বল্পপরিমাণে ভোজন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ভূদেবের ১৬ মাসের বেতন ৮০৲ টাকা বাকী পড়িয়া যায়। তেজস্বী তর্কভূষণ মহাশয় একটা বিশেষ বার্ষিক বৃত্তি ত্যাগ করার ফলেই ভূদেবের কলেজের বেতন বাকী পড়িয়াছিল। উক্ত টাকা তিনি কোন ক্রমে সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। একজন অধ্যাপক স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, অচিরে সমস্ত টাকা পরিশোধ না করিলে ভূদেবের নাম কলেজ হইতে তুলিয়া দেওয়া হইবে; তিনি আর তথায় অধ্যয়ন করিতে পাইবেন না।

এ সংবাদে ভূদেবের চক্ষুতে জল আসিয়াছিল। তিনি নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার সতীর্থ মধুসূদন তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া

কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সমস্ত কথা শুনিয়া মাইকেল মধুসূদন বলেন যে, তিনি নিজে ধনীর সন্তান, বহু অর্থই তিনি ব্যয়ের জন্য পান, সুতরাং ভূদেবের পড়ার খরচ তিনি চালাইয়া লইবেন। ভূদেব চিরদিনই স্বাবলম্বী; তিনি মধুসূদনের এ সাহায্য গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। নিজের চেষ্টালব্ধ অর্থের দ্বারা নিজের ব্যয়সঙ্কুলান করিবার বাসনাই তাঁহাতে বিশেষভাবে বলবতী ছিল। কলেজে আর কয়েক মাস তিনি যদি নিরুপদ্রবে অধ্যয়ন করিতে পান, তবে তিনি নিজের পথ নিজেই উন্মুক্ত করিয়া লইতে পারিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কলেজের কর্তৃপক্ষ এই মেধাবী ছাত্রের প্রতি অকরুণ হইলেন না; জুনিয়র পরীক্ষা প্রদানের কাল পর্য্যন্ত ভূদেবকে কলেজে থাকিতে দিলেন। ভূদেব পঞ্চম শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রগণকে অতিক্রম পূর্ব্বক বৃত্তি সহকারে একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। ভূদেব, মধুসূদন, গৌরহরি বসাক, শ্যামাচরণ সাহা ও বঙ্কুবিহারী দত্ত এই পাঁচটি ছাত্রই পঞ্চম হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে শুধু ভূদেবই বৃত্তিলাভ করেন।

বৃত্তিলাভের পর ভূদেবের পঠদ্দশার দুঃখ ঘুচিয়াছিল। এই সময় হইতে যত দিন তিনি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কোনও দিন তাঁহাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই।

ভূদেব যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই সময় স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষ মহাশয় উক্ত শ্রেণীর ছাত্রদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয় লইয়া যে দুই জন ছাত্র উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবে, সেই দুই জনকে দুইটি মেডেল পারিতোষিকস্বরূপ দিতে অঙ্গীকার করেন;—একটি

সোনার, দ্বিতীয়টি রৌপ্য-নির্ম্মিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর বহু ছাত্র বাঙ্গালীর প্রদত্ত পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিপরীক্ষা দিতে প্রথমতঃ সম্মত হয় নাই; কিন্তু শেষে ভূদেবের যুক্তি-তর্কে আকৃষ্ট হইয়া সকলেই সে পরীক্ষা প্রদান করে। রামগোপাল ঘোষ বাঙ্গালী, তাঁহার সম্মানে দেশের সম্মান। পরীক্ষার ফলে মাইকেল মধুসূদন প্রথম ও ভূদেব দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময় মাইকেল মধুসূদন খৃষ্টান হইয়া যান। ভূদেব এজন্য অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন। মধুসূদনকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এ সময়ে খৃষ্টানধর্ম্ম-প্রচারকগণ বিপুল উদ্যমে স্বধর্ম্মের প্রচার করিতেছিলেন। বাইবেল গ্রন্থ না পড়িলে বড় বড় ইংরাজী কবিদিগের রচনা পাঠের সুবিধা হয় না; হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ এজন্য উহা যত্ন সহকারে পাঠ করিতেন। ভূদেবও সহপাঠীদিগের সহিত বাইবেল উত্তমরূপেই পড়িয়াছিলেন।

উলাষ্টন সাহেব ও বিবি উইল্‌সনের সংস্রবে আসিয়া ভূদেব তাঁহাদের উদার ব্যবহারে প্রকৃতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অজ্ঞাতসারে তিনি মিশনরীদিগের আন্দোলনসঞ্জাত ব্যাপারের প্রতি প্রথমতঃ একটু আকৃষ্টও হন। নিজের ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার শুভ সুযোগ তখনও আইসে নাই; কাজেই মিশনারীদিগের প্রভাব অল্পমাত্রায় ভূদেবের উপরও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তবে ভূদেব নিজে তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; পিতামাতাও তাঁহার ব্যবহারে বৈলক্ষণ্য কিছু দেখিতে পান নাই। কাজেই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় সেই ভাবটি প্রচ্ছন্ন ছিল। বিশেষতঃ পিতাকে ভূদেব ঋষিতুল্য ব্যক্তি বলিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি

করিতেন, মাতাকে দেবী জ্ঞানে পূজা করিতেন। এ কারণ মিশনরীদিগের আন্দোলনসঞ্জাত বিষ তাঁহার দেহে সম্পূর্ণ পরিব্যাপ্ত হইতে পায় নাই।

হিন্দুর প্রতিমাপূজাকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ পৌত্তলিকতা বলিয়া উপহাস ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। সর্ব্বদা সে সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় যে সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা মিশনরীগণ করিতেন, ভূদেবের মনে তাহা অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইত না। প্রতিমা-পূজার সার্থকতা আছে কি না, হিন্দু যে পৌত্তলিক নহে, তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্যটুকু তখনও ভূদেব জানিতেন না; কাজেই তিনি মনে করিলেন যে, দেবপূজা কাজটা সঙ্গত নহে। যে দিন তাঁহার মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল, সে দিন গৃহে ফিরিয়া তিনি গৃহদেবতার আরতি করিলেন না। এই নিত্যকর্ম্মটির ভার তাঁহারই উপর অর্পিত ছিল। তর্কভূষণ মহাশয় অনেক রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া শুনিলেন যে, ঠাকুরের আরতি হয় নাই। তিনি কোনও কথা না বলিয়া স্বয়ং সে কার্য্য সম্পাদন করিলেন। পরদিবস ভূদেবকে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দিলেন যে, পৌত্তলিকতা বলিয়া তিনি ঠাকুরের আরতি করেন নাই। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পণ্ডিত তর্কভূষণ মহাশয় প্রকৃত ব্যাপারটি অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি পুত্রের আচরণে কোনও ক্ষোভ বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন না; শুধু বলিলেন, "বিশ্বাস না হয়, আরতি করিও না। ভক্তি ব্যতীত, অশুচি ও কপট মনে ঠাকুরঘরে যাইতে নাই। তুমি ভালই করিয়াছ।"

পরদিবস প্রাতঃকালে পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তর্কভূষণ মহাশয় গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। পুত্রকে কোন উপদেশ দিলেন না, তিরস্কারও করিলেন না। ভূদেব বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে পিতার

নিকট হয় ত লাঞ্ছিত হইতে হইবে ; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, পিতা তৎ-পরিবর্ত্তে শুধু বলিলেন, "তুমি আমার একমাত্র পুত্র, তোমার মনে এরূপ ভাব বেশী দিন থাকিবে না," তখন তাঁহার মনে একটা বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ ত বলেন না, "বিশ্বাস না হইলে করিও না।" তাঁহারা বরং জোর দিয়া বলেন, "বিশ্বাস করিতেই হইবে।"

পুত্রকে কিছুক্ষণ সঙ্গদানের জন্য তিনি প্রত্যহ প্রাতে গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভূদেব পিতার সঙ্গে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে আরম্ভ করিলেন। তার পর একদিন তর্কভূষণ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অখাদ্য খাইয়াছ?" ভূদেব দৃঢ়তাসহকারে বলিলেন, "যে খাদ্য আমি আপনার সাক্ষাতে খাইতে পারি না, তাহা কখনই আপনার অসাক্ষাতে খাইব না।" পুত্রের কথার উপর পিতার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল।

ক্রমে তর্কভূষণ ধীরে ধীরে হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্বগুলি পুত্রের নিকট কথায় কথায় বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করেন। দেব-দেবীর পূজা যে পৌত্তলিকতা নহে, তাহার নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে, শাস্ত্রীয় প্রমাণ-প্রয়োগ-সহকারে ক্রমশঃ তাহা পরিস্ফুট করিয়া দেওয়ায় ভূদেব বুঝিতে পারিলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম কত বড় উদার। ক্রমে তাঁহার মনের সংশয় সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত হইয়া গেল।

সনাতন ধর্ম্মের প্রতি পুত্রের মনের গতি ফিরিবামাত্র তর্কভূষণ মহাশয় ভূদেবের দীক্ষাকার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার জননী পুত্র ও পুত্রবধূকে মন্ত্রদান করেন। ভূদেববাবু অতঃপর নিয়মিতভাবে প্রত্যহ জপতপাদি কার্য্য শ্রদ্ধাসহকারে করিতে লাগিলেন।

যোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ভূদেব মাতৃহীন হন। এই সময় হইতে তিনি পিতার সেবার প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদান করেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ভূদেব বিশেষ প্রশংসার সহিত সিনিয়র পরীক্ষায় ৪০৲ টাকা মাসিক বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের পরীক্ষা শেষ করিয়া তিনি শিক্ষামন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হন।

পিতাকে সাংসারিক ব্যাপারে অর্থ-সাহায্য করিবার জন্য অতঃপর ভূদেব নানাস্থানে চাকরীর চেষ্টা করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোথাও তিনি সহসা চাকরী পাইলেন না। অবশেষে "হিন্দু চ্যারিটেবল ইনষ্টিটিউশন" নামে একটি হিন্দু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে কিছু দিন ভূদেব ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তৎপরে উক্ত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনবধানতাবশে উঠিয়া গেলে, ভূদেব, অন্যত্র চাকরীর চেষ্টা না করিয়া দেশীয় পদ্ধতিতে বিদ্যালয় খুলিয়া শিক্ষাদানের জন্য ব্যগ্র হইলেন। কয়েকজন উৎসাহী বন্ধুর সাহায্যে তিনি ফরাসী চন্দননগরে "চন্দননগর সেমিনারী" নাম দিয়া একটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই বিদ্যালয়ে তিনি টোলের পদ্ধতিতে বালকগণকে ইংরাজীও শিক্ষা দিতেন।

এইরূপে স্বাধীনভাবে এক বৎসর বিদ্যালয় পরিচালনের পর ভূদেব তদীয় দ্বিতীয়া ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে হরীতকীবাগানে ফিরিয়া আসেন। তর্কভূষণ মহাশয় কন্যার বিবাহে আড়াই শত টাকা ঋণ করিবার চেষ্টায় ছিলেন। ভূদেব বুঝিলেন যে, তিনি উপযুক্ত পুত্র হইয়াও এ পর্য্যন্ত পিতাকে সামান্যরূপও অর্থ-সাহায্য করিতে পারেন নাই। কথাপ্রসঙ্গে অন্তরাল হইতে পিতার ঋণ-গ্রহণের প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি অত্যন্ত বিচলিত হন। উপার্জ্জনক্ষম উপযুক্ত পুত্র, ভগিনীর

বিবাহোপলক্ষে পিতাকে অর্থসাহায্য করিবেন, তাহা না করিয়া তিনি জগতের উপকারার্থ সংসারে উদাসীন হইয়া অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা-দানকার্য্যে ব্যস্ত! আর পিতা ঋণগ্রহণের জন্য চারিদিকে ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছেন।

ভূদেব অবিলম্বে ধনী বন্ধু স্বরূপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে আড়াই শত টাকা ধার করিয়া আনিয়া পিতার হস্তে প্রদান করিলেন। পিতা ভাবিলেন, বিদ্যালয়ের লভ্যাংশ হইতেই পুত্র বুঝি টাকা আনিয়াছে। তিনি কোনও প্রশ্ন না করিয়া সে টাকা সাহ্লাদে গ্রহণ করিলেন। ভূদেব উক্ত ঋণ শোধ করিবার জন্য কাউয়াট্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি তখন শিক্ষাবিভাগের সম্পাদক। ভূদেবকে তিনি ভালবাসিতেন। তাঁহার চেষ্টায় ভূদেব ৫০৲ টাকা বেতনে মাদ্রাসা কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। ভূদেব মাসে মাসে বেতনের টাকার অর্দ্ধেক পিতাকে দিয়া বাকি অর্দ্ধেক টাকার দ্বারা ঋণ শোধ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর কার্য্যদক্ষতাগুণে ভূদেব কর্ত্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করায় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি হাওড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। তখন তাঁহার মাসিক বেতন হইল দেড়শত টাকা। এই বিদ্যালয়ে তিনি যেরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার উপর পরম পরিতুষ্ট হন। এই সময় সিভিলিয়ান্ প্রাট্ সাহেবের সহিত ভূদেবের পরিচয় ও বন্ধুত্ব জন্মে। প্রাট্ সাহেব পরিণামে তাঁহার একান্ত গুণমুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ভূদেব মাসিক ৩০০৲ শত টাকা বেতনে হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত

হন; এ কার্য্যে তিনি অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে অ্যাসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টারের পদে তিনি নিযুক্ত হন। তৎপরে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এডিশনাল ইন্‌স্পেক্টারের পদের সৃষ্টি হইলে, ভূদেব উক্তপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অত্যন্ত দক্ষতার সহিত যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শিক্ষাসম্বন্ধে অনুসন্ধান-কার্য্যের ভার ভূদেব পাইয়াছিলেন। এ কার্য্যে তিনি কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ-ভাবে সন্তুষ্ট করেন। তাঁহার মন্তব্যানুসারে গবর্ণমেণ্ট কার্য্যপদ্ধতিও অবলম্বন করিয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর স্যার এশ্‌লি ইডেন্‌ ভূদেবকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ভূদেব শিক্ষাবিভাগের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতনে ইনস্পেক্টারের কার্য্য করেন। কিছুদিনের জন্য অস্থায়িভাবে ভূদেব শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের কার্য্যও করিয়াছিলেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সরকার বাহাদুর ভূদেবের কার্য্যে প্রসন্ন হইয়া সি, আই, ই উপাধি দ্বারা তাঁহাকে ভূষিত করেন। বিহারপ্রদেশে আদালত সমূহে পূর্ব্বে পারসী অক্ষরে কার্য্যাদি সম্পন্ন হইত। ভূদেব বাবুর মন্তব্যানুসারে গবর্ণমেণ্ট সেই স্থলে নাগরী অক্ষর প্রচলিত করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভূদেব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ভূদেব সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ-পূর্ব্বক কাশীধামে গমন করেন। সেখানে তিনি বিশেষ যত্নসহকারে বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় তিনি একটি

বেদান্তচতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। বেদান্তচর্চ্চায় যাহাতে বাঙ্গালী অবহিত হয়, এ প্রচেষ্টা তাঁহার বিশেষভাবে ছিল।

ভূদেব "এড়ুকেশন গেজেটের" স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হইয়াছিলেন। এই সংবাদপত্র পরিচালনায় তিনি যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি এই সংবাদপত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পরিণামে সেই সকল প্রবন্ধ, "সামাজিক প্রবন্ধ", "পারিবারিক প্রবন্ধ" প্রভৃতি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ভূদেব পিতার নামে "বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী" প্রতিষ্ঠিত করিয়া উক্ত ভাণ্ডারে ২,৮০,০০০৲ টাকা দান করেন। এই বিরাট্ অনুষ্ঠান ব্যতীত জননীর নামে "ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়" নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে অক্লান্তকর্ম্মী বাঙ্গালীর অমূল্যরত্ন ভূদেব সত্তর বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

বঙ্গভাষায় ভূদেবের অনেকগুলি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক আছে। "প্রাকৃত বিজ্ঞান", "ক্ষেত্রতত্ত্ব", "ইংলণ্ডের ইতিহাস", "পুরাবৃত্তসার", "রোমের ইতিহাস", "শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব" ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত তিনি "পুষ্পাঞ্জলি" নামক একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসও রচনা করিয়াছিলেন। তৎপরে "আচার-প্রবন্ধ", "পারিবারিক প্রবন্ধ"; "সামাজিক প্রবন্ধ" নামক তিনখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে আর নাই।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্লাবনে যখন বাঙ্গালা দেশ পরিপ্লাবিত, বাঙ্গালার শিক্ষিত যুবকগণ যখন আচারে, ব্যবহারে পাশ্চাত্যকে

অনুকরণ করিতে ব্যাকুল, সেই যুগসন্ধিক্ষণে ভূদেব বাঙ্গালায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দৃঢ়চেতা, পিতৃভক্ত, স্বদেশের হিতচিকীর্ষু, সুপণ্ডিত ভূদেবও একদিন সেই প্লাবনে কূল ছাড়িবার উপক্রম করিয়াছিলেন; কিন্তু উপযুক্ত পিতার শিক্ষাগুণে, সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-সন্তান আপনার ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারের প্রতি উপেক্ষার ভাবকে সংযত করিয়া পরিণামে সনাতন ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হন। এমন সদাচারপরায়ণ, ধর্ম্মপ্রাণ, কর্ম্মবীরের আবির্ভাবে বাঙ্গালায় পাশ্চাত্য ভাবের প্রবাহ অনেকটা প্রশমিত হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের প্রভাবে বহুসংখ্যক শিক্ষিত বাঙ্গালী জাতীয় গৌরব, জাতীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলেন। উচ্চপদস্থ ইংরাজগণ পর্য্যন্ত এই ব্রাহ্মণ্যতেজোবিশিষ্ট শিক্ষিত বাঙ্গালীরত্নের সদ্গুণরাশির ও চরিত্রের প্রশংসা করিতেন। নীচতা, হীনতা, পরহিংসা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কোনও প্রকার নিকৃষ্ট বৃত্তি কোনও দিন ভূদেবের ছায়া স্পর্শ করিতে পারে নাই। আপনার ধর্ম্মে পরম বিশ্বাসী, জাতীয় আচার-ব্যবহারে নিষ্ঠাবান্ হইয়াও ভূদেব অপরের ধর্ম্মকে, অন্যের আচার-অনুষ্ঠানকে শ্রদ্ধা করিতেন। যে কোনও জাতি বা বর্ণের যে কোনও লোক তাঁহার গৃহে আসিলে, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ হইয়াও ভূদেব কোনও দিন ভ্রমেও তাহার অমর্য্যাদা করেন নাই; বরং অতিথি নারায়ণ হিসাবে যথোচিত সমাদরে আতিথ্যসৎকার করিতেন। হিন্দুধর্ম্মের উদার মতবাদের উপর তিনি আপনার জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। আচারপরায়ণ হইলে মানুষ অনেক সময় অন্যের মর্ম্মপীড়াদায়ক কাজ করিয়া থাকে, নিষ্ঠার আতিশয্য দেখাইতে গিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ, মনুষ্যত্বের বিরোধী কার্য্য করিয়া থাকে

বলিয়া যাঁহাদের ধারণা আছে, ভূদেবের জীবনের দৃষ্টান্তে তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভূদেবের কাহিনী হিন্দুর গর্ব্বের জিনিষ, বাঙ্গালীর নিষ্ঠার পবিত্র চিত্র। কথায় ও কার্য্যে এমন সামঞ্জস্য সাধারণতঃ কাহারও জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী চিরদিন এই নররত্নের স্মৃতি স্মরণ করিয়া পবিত্র ও ধন্য হইবে।

আবদুল লতিফ্।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে আবদুল লতিফ্ পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুরে কোনও বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ তুরস্কের বোগদাদ নামক সুপ্রসিদ্ধ নগরের অধিবাসী ছিলেন। ক্রমে অদৃষ্টপরীক্ষাব্যপদেশে পূর্ব্বপুরুষগণের কেহ সুজলা-সুফলা বঙ্গভূমিতে আগমন করেন; তার পর কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ফরিদপুরে বসবাস করিতে থাকেন। ক্রমে এই সম্ভ্রান্ত মুসলমান-পরিবার ফরিদপুরে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। আবদুল লতিফের পিতা কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতে ব্যবহারাজীবের কর্ম্ম করিতেন।

প্রথমতঃ পল্লী-পাঠশালায় পাঠ আরম্ভ করিবার পর আবদুল লতিফ্ কলিকাতা মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হন। অধ্যয়নে প্রগাঢ় অনুরাগহেতু তিনি মাদ্রাসার শ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ভূদেব বাবু যে সময় হিন্দু-কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র, সেই সময় আবদুল লতিফ্ও মাদ্রাসার প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। ভূদেব ও মধুসূদনের সহিত আবদুল লতিফের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। এক দিন এই তিনটি মেধাবী ছাত্র মিলিত হইয়া, উত্তরকালে কে কি হইতে চাহেন, তাহার আলোচনা করিয়াছিলেন। ভূদেব বাবু বলিয়াছিলেন যে, তিনি যেন দেশের কাজে অণুমাত্রও লাগিতে পারেন। মাইকেল মধুসূদন বলিয়াছিলেন, "আমি যেন বড় কবি হইতে পারি।" আর আবদুল লতিফ্ "উচ্চ রাজকর্ম্মচারী" হইবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এই তিনটি তরুণ ছাত্রের প্রথম-যৌবনের স্বপ্ন পূর্ণমাত্রায় সফল ও সার্থক হইয়াছিল, তাহা কে না বলিবে?

আব্দুল লতিফ্ ইংরাজী ও পারস্যভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া মাদ্রাসা হইতে সিনিয়র বৃত্তিসহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে উনবিংশ বর্ষ বয়সে ইনি বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন। তিনি এমন যোগ্যতাসহকারে কর্ত্তব্যপালন করিতে থাকেন যে, তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে তাঁহার গুণে বিশেষ প্রীতি-লাভ করিয়া তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন।

আব্দুল লতিফ্ রাজকার্য্যব্যপদেশে যখনই যে স্থানে বদ্‌লী হইয়া যাইতেন, সেখানেই বিশেষ যোগ্যতাসহকারে কর্ত্তব্যপালন করিতেন। অবশেষে তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাকে শিয়ালদহের ফৌজদারী আদালতের বিচারভার প্রদান করেন। কয়েকবার তিনি কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বহু জটিল মোকদ্দমার বিচারকালে আব্দুল লতিফ্ অসাধারণ প্রতি-ভার পরিচয় দিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে ধীশক্তিসম্পন্ন কাজীরা যে উপায়ে সত্যনির্দ্ধারণ করিতেন, আব্দুল লতিফ্‌ও সেইরূপ উপায়ে অনেক সময় জটিল মোকদ্দমার বিচার নিষ্পন্ন করিতেন। একবার কোনও গুরুতর অপরাধে চারি জন হিন্দু অভিযুক্ত হয়। তাহাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই ছিল না, অথচ আব্দুল লতিফের মনে দৃঢ় সন্দেহ জন্মে যে, উহারা অপরাধী। আসামীরা আত্মাপরাধ স্বীকার না করায়, আব্দুল লতিফ্ তাঁহার অধীনস্থ কোনও বিশ্বাসী মুসলমান পুলিশ-কর্ম্মচারীকে মড়া সাজাইয়া উক্ত চারি জন আসামীর দ্বারা রাত্রিকালে সেই শবদেহ সমাধিক্ষেত্র অভিমুখে প্রেরণ করেন। মুসলমানের মড়া বহিতে হইতেছে ভাবিয়া ক্ষোভ ও দুঃখের আতিশয্যে তাহারা আত্মাপরাধেরও আলোচনায়

প্রবৃত্ত হয়। শবরূপী পুলিশ-কর্ম্মচারী এইরূপে তাহাদের অপরাধের প্রমাণ পান। পরদিবস সেই পুলিশ-কর্ম্মচারীর এজেহারে উক্ত আসামীরা অবশেষে অপরাধ স্বীকার করে। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের বিচার-পদ্ধতি সম্বন্ধেও অনুরূপ একটি গল্প প্রচলিত আছে।

নানা স্থানে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিবার পর আব্দুল লতিফ্ ছোটলাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। উক্ত সভায় তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আয়কর সম্বন্ধে যে কমিশন বসিয়াছিল, আব্দুল লতিফ্ তাহার এক জন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সরকার বাহাদুর হুগলী ও কলিকাতার মাদ্রাসা কলেজ-পরিদর্শনের ভার আব্দুল লতিফের উপর অর্পণ করেন। আব্দুল লতিফ্ এই প্রীতিজনক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্যপালন করেন। তাঁহার কার্য্যে গবর্ণমেণ্টও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

আব্দুল লতিফের অধ্যয়নস্পৃহা বিশেষ বলবতী ছিল। তিনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে "মুসলমান লিটারেরি সোসাইটী" নামক সাহিত্য-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বয়ং উহার সম্পাদকের পদে কার্য্য করেন। মুসলমান ছাত্রগণ সাহিত্যচর্চ্চায় যাহাতে যশস্বী হইয়া উঠিতে পারে, এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আব্দুল লতিফ্ আমরণ এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন —তাঁহার সম্পাদকত্বে সমিতির যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল।

অন্য নানা প্রকার সভা-সমিতির সহিতও আব্দুল লতিফের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এসিয়াটিক সোসাইটী, ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটী প্রভৃতি সমিতির তিনি বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। মুসলমান-সমাজের উন্নতিকল্পে

আব্‌দুল লতিফ্ নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিবার জন্য আব্‌দুল লতিফের আগ্রহ ও নানা প্রকার অনুষ্ঠানের পরিচয় পাইয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বড় লাট লর্ড লরেন্স তাঁহাকে একটি স্বর্ণনির্ম্মিত পদক ও এক প্রস্থ "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা" নামক বিরাট্ অভিধানগ্রন্থ উপহার প্রদান করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে "নবাব" উপাধি প্রদান করা হয়। তৎপরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে আব্‌দুল লতিফ্ সি, আই, ই উপাধি লাভ করেন। পরিশেষে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে "নবাব বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন।

নবাব আব্‌দুল লতিফ্ বাহাদুর মিষ্টভাষী, নিরহঙ্কার ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন যাহাতে সুদৃঢ় হয়, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কোথাও কোনও বিবাদ উপস্থিত হইলে, তিনি মধ্যস্থতা করিয়া আত্মকলহ হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিতেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নবাব বাহাদুর পরলোকযাত্রা করেন।

আব্‌দুল লতিফের মৃত্যুতে দেশবাসী এক জন প্রকৃত হিতৈষীর বিয়োগবেদনা অনুভব করিয়াছিল। হিন্দুর উৎসবক্ষেত্রে তিনি স্বতঃ পরতঃ যোগদান করিতেন। সাম্প্রদায়িক অনুদারতা তাঁহাতে ছিল না। মুসলমান-সমাজের উন্নতির তিনি যেমন পক্ষপাতী ছিলেন, হিন্দুর ক্রমোন্নতিতেও তাঁহার সেইরূপ আনন্দ জন্মিত। এমন সামাজিক, এমন বন্ধুবৎসল, এমন স্বদেশহিতৈষী সুশিক্ষিত মুসলমান বাঙ্গালায় অতি অল্পসংখ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গবাসীর হৃদয়ে চিরকাল নবাব আব্‌দুল লতিফ্ বাহাদুরের স্মৃতি জাগরূক থাকিবে।

গঙ্গাধর কবিরাজ।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ২৫শে আষাঢ় (জুলাই) যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা নামক গ্রামে গঙ্গাধর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যজীবনের ইতিহাস যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী নামক কোনও পণ্ডিতের পাঠশালায় পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি বিদ্যারম্ভ করেন। পাঠশালায় পড়া সমাপ্ত হইলে তিনি নন্দকুমার সেনের নিকট ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন।

মুগ্ধবোধ অল্পকালমধ্যে আয়ত্ত করিয়া অধ্যয়নানুরাগী গঙ্গাধর, রামরত্ন চূড়ামণি নামক প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের নিকট কাব্য, অভিধান ও অলঙ্কারশাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্ত গমন করেন। চূড়ামণি মহাশয় যশোহরের বারুইখালি গ্রামে বাস করিতেন।

যথাসময়ে সেখানকার পাঠ সমাপ্ত করিয়া গঙ্গাধর বৈদ্যবেলঘরিয়া নামক স্থানে রামকান্ত সেন কবিরাজের গৃহে অবস্থান করিয়া চরক প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থ পাঠ করিতে থাকেন। এ সময় তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র বিংশতি বৎসর। এই অল্পবয়সে সংস্কৃত বিদ্যায় এবম্প্রকার অধিকার লাভ করা সামান্ত প্রতিভার পরিচায়ক নহে। ইতঃপূর্ব্বে তিনি মুগ্ধবোধের একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই টীকায় তিনি যে প্রকার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে অধ্যাপকগণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই যুবক কালে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিবে।

একবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে গঙ্গাধর বহুসংখ্যক প্রবীণ পণ্ডিতকে শাস্ত্র-সংক্রান্ত আলোচনায় পরাভূত করিয়াছিলেন। তখন হইতেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইতে থাকে। মুগ্ধবোধের টীকা প্রণয়নকালে তিনি বিশ হাজার শ্লোক রচনা করিয়া উহার ব্যাখ্যা করেন। চরকের "জল্পকল্পতরু" নামক একখানি টীকারও তিনি প্রণেতা। এই টীকাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। ৬০,০০০ শ্লোকে উক্ত টীকাগ্রন্থ সমাপ্ত হয়। "জল্পকল্পতরু" রচিত হইবার পরই তাঁহার যশ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইতে থাকে।

কবিরাজী শাস্ত্রমতে ব্যবসায় করিবার জন্য গঙ্গাধর মুর্শিদাবাদে গমন করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার চিকিৎসানৈপুণ্য লোকসমাজে প্রচারিত হয়। অনেকগুলি কঠিন, দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে দূর হইলে, তাঁহার নাম ও সুযশঃ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মুর্শিদাবাদের লোক এখনও গঙ্গাধর কবিরাজের নাম করিলে বলিয়া থাকে যে, তিনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি ছিলেন।

চরক ও মুগ্ধবোধের টীকা-প্রণয়ন ব্যতীত গঙ্গাধর তৈত্তিরীয় প্রভৃতি তিনখানি উপনিষদের ভাষ্য, "ঈশগীতা, শারীরিক সূত্রব্যাখ্যা," অগ্নি-পুরাণোক্ত আয়ুর্ব্বেদের ভাষ্য, "প্রাচ্যপ্রভা" নামক অলঙ্কার গ্রন্থ, ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা, সাংখ্য, ন্যায়, পাতঞ্জল প্রভৃতি বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। কাব্য-রচনার শক্তিও তাঁহাতে যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হইত। তাঁহার রচিত "দুর্গবধ কাব্য," "লোকালোকপুরুষীয়" কাব্য,"নির্ব্বিপ্রাদুর্ভাব" নামক আখ্যায়িকা,"হর্ষোদয়" নামক চিত্রকাব্য,

"চৈতন্যাষ্টক", "গোবর্দ্ধন-বর্ণন", "রাধাকৃষ্ণ-বর্ণন" প্রভৃতি নানাপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থ রচনায় তাঁহার কবিত্বশক্তির প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়।

বাঙ্গালাভাষাতেও গঙ্গাধরের অনুরাগ যথেষ্ট ছিল। "বহুবিবাহ-রাহিত্য", "বিধবাবিবাহ-প্রতিষেক" নামক গ্রন্থে তিনি সামাজিক বিষয়-সংক্রান্ত বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলিতে তাঁহার যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে যে শতাব্দীতে গঙ্গাধর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার ন্যায় সংস্কৃতশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত এতদ্দেশে আর কেহ ছিলেন না।

গঙ্গাধর চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্য্যেরও অনুশীলন করিতেন। অবসরকালে এই প্রকার সূক্ষ্ম শিল্পকলার অনুশীলনে তাঁহার বিশেষ আনন্দ জন্মিত। কথিত আছে, একবার তাঁহার বাড়ীতে পূজার সময় পটুয়ারা না আসায় তিনি স্বহস্তে দেবীপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে প্রতিমায় তাঁহার বিচিত্র শিল্পানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

বৈদ্যশাস্ত্রব্যবসায়ীর ও স্বজাতির উন্নতি এবং মঙ্গলানুষ্ঠানে গঙ্গাধরের সমধিক আগ্রহ ও যত্ন ছিল। তিনি নানাপ্রকারে বৈদ্যজাতির মঙ্গলানুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে গঙ্গাধর কবিরাজ ৮৭ বৎসর বয়সে ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন চিকিৎসকের অভাব ঘটিয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন প্রভৃতি মহাযশস্বী কবিরাজগণ গঙ্গাধরের শিষ্য ছিলেন।

বর্ত্তমান যুগে বৈদ্যগণ দ্বিজ বলিয়া আপনাদের যে অধিকারের দাবী করিতেছেন, তাহার সূত্রপাত গঙ্গাধরেরই রচিত একখানি গ্রন্থে প্রথম

ঘটিয়াছিল। সেই গ্রন্থে তিনি আপনার ব্রাহ্মণত্বের দাবীসূচক শ্লোক রচনা করেন।

গঙ্গাধরের ন্যায় অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী চিকিৎসক বঙ্গদেশে অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি উক্ত শাস্ত্র এমন ভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, দেখিবামাত্র রোগী বাঁচিবে কি মরিবে, তাহা বলিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার অনুমান কদাচিৎ ব্যর্থ হইত। সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। তত্তুল্য পণ্ডিত সে যুগে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় কেহ ছিলেন না। গঙ্গাধর নামটি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে সার্থক হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে এমন অমূল্যরত্ন আবার কবে আবির্ভূত হইবে, কে বলিতে পারে? যেমনটি যায়, তেমনটি আর হয় না, এই প্রবাদবাক্য বাঙ্গালার সৌরমণ্ডলের জ্যোতিষ্কনিচয়ের তিরোভাবের পর বাঙ্গালী স্পষ্টরূপেই দিন দিন অনুভব করিতেছে। কাল-সমুদ্রের উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিভালোকদীপ্ত প্রবাহধারা বাঙ্গালার উপকূলকে যেমন ভাবে বিধৌত করিয়াছিল, এমন প্রায় দেখা যায় না। বাঙ্গালা ইতিহাসের এই অধ্যায়টুকু অনুশীলন করিলে উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে।
